মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাছাই গল্প

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

সূচীপত্র

ভূমিকা	...	[ক]
নেকী	...	১
মহাসংগম	...	৩২
যাত্রা	...	৪৩
মাথার রহস্য	...	৫৩
রকমারি	...	৬৬
আশ্রয়	...	৬৯
খুকী	...	৮০
বন্যা	...	৯৮
বিষাক্ত প্রেম	...	১০৪
দোকানীর বৌ	...	১১১
বিপত্নীকের বৌ	...	১২৬
মানুষ হাসে কেন	...	১৩৮
গুণ্ডা	...	১৪৭
দিশেহারা হরিণী	...	১৫৪
যে বাঁচায়	...	১৬১
বিলাসসন	...	১৬৯
তোমরা সবাই ভালো	...	১৭৯
জন্মের ইতিহাস	...	১৮৮
নমুনা	...	২০১
রাঘব মালাকার	...	২০৯
প্যানিক	...	২১৬
পেট ব্যথা	...	২২৬
একান্নবর্তী	...	২৩৪
বাগদীপাড়া দিয়ে	...	২৪৩
স্থানে ও স্তানে	...	২৪৯
ধান	...	২৫৭
মেজাজ	...	২৬৫

প্রাণাধিক	...	২৭১
ফেরিওলা	...	২৮২
লেভেল ক্রসিং	...	২৯০
চুরি-চামারী	...	৩০১
মরব না সস্তায়	...	৩০৮
এপিঠ ওপিঠ	...	৩১৩
পাশ ফেল	...	৩১৯
স্বাধীনতা	...	৩২৬

ভূমিকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বাছাই ক'রে একটি সংকলন তৈরির দায়িত্ব আমার উপর পড়েছিল। সে দায়িত্ব সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু পালন করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম কাজটি খুব সহজ নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪৮ বছরের (১৯০৮-৫৬) জীবনে প্রথম গল্প 'অতসী-মামী' (১৯২৮) থেকে হিসেব ধরলে সাহিত্যচর্চার কাল ২৮ বছর। এর মধ্যে তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা ৩৫ ও গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা ১৬। ঐ ১৬টি গল্প-গ্রন্থে সংকলিত গল্পের পরিমাণ প্রায় ২০০টি। এর বাইরে অ-সংকলিত গল্প আনুমানিক আরো ৫০টি হবে। অর্থাৎ মোট গল্পের সংখ্যা প্রায় ২৫০।

বাছাই করতে গিয়ে দেখা গেল তাঁর গল্প-গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলিই অলভ্য। তাঁর মৃত্যুর পরে সংকলিত ২টি গল্প-সংকলন এখন পাওয়া যায়। আর আছে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থাবলী। আপাতত মোটামুটি ২০০ গল্পের মধ্যে থেকে বর্তমান সংকলনে ৩৫টি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

বাছাইয়ের সময় লেখকের প্রতিভার কোন্ দিকটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব সে নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছি। গল্পগুলি সে কারণে নতুন ক'রে পড়তে গিয়ে আর একবার মনে হল তিনি শুধু একজন 'আধুনিক' গল্পকার নন, তিনি আমাদের আগামী লেখককুলেরও পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তাঁর যে কোনো ৩৫টি গল্পকেই যে কোনো জায়গা থেকে নির্বাচন করা যায়। সেসব গল্পে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় একই সংগে ফুটে উঠবে এবং লেখক হিসেবে তাঁর মূল্য ও তাৎপর্য কিছুমাত্র ম্লান হবে না।

এই প্রসংগে আমার মনে হয়, একজন লেখকের শুধু বহুমানিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে সংকলন করলে লেখকের সম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরা হয় না। অনেক তথাকথিত কর্ম সার্থক কাহিনীতেও লেখকের প্রতিভার অসামান্য দীপ্তি প্রচ্ছন্ন থেকে যেতে পারে। তাকে আবিষ্কার করা ও তুলে ধরাও সংকলকের দায়িত্বের অন্তর্গত। জন-রুচির কাছে নীরব আত্মসমর্পণ নয়, তাকে কিছুটা নানা সঠিক ভাবনার পথে চালিত করাও এক গুরুতর দায়।

দুর্ভাগ্যবশত একাজে বাংলা সমালোচনাসাহিত্য এ যাবৎ খুব সহায়ক হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা ও তাৎপর্যের তুলনায় তাঁর মূল্যায়নের প্রয়াস পরিমাণগতভাবেও স্বল্প। খুব সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে ধরা-বাঁধা ছকের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে সনাতনী ও প্রগতিবাদী উভয় শিবিরে অনেকেই নিজ নিজ দায় চুকিয়ে রেখেছেন। আবার

সম্প্রতি কিছুকাল অ্যাকাডেমিক পাঠ্যসূচির সীমায় এসে পড়ায় তিনি 'ক্লাসিক' শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছেন—ফলে ক্রমশই আরো কোনো কোনো দুর্ভাগা সাহিত্যিকের মতো তিনিও অচিরে প্রশ্নপত্র ও আলমারির মধ্যে বন্দী হয়ে পড়বেন, এমন আশংকার কারণ আছে।

এই অবস্থায় ও প্রধানত একালের পূর্ব-সংস্কারমুক্ত নতুন পাঠক-পাঠিকার জন্য একটি গল্প-সংকলন প্রকাশ খুব জরুরি বলে আমাদের মনে হয়েছে। তবে যিনি বাছাই করছেন তাঁর ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ ও উদ্দেশ্য-আদর্শের সংগে স্বভাবতই অনেকে একমত না হতে পারেন। এ বিপদ এজাতীয় সব কাজেই অনিবার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসাহিত্যের সংগে যেসব পাঠকের কিছুটা পূর্ব-পরিচয় আছে তাঁদের ধারণা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বেশ-কিছু গল্প এই সংকলনে দেখতে না পেলে তাঁরা হতাশ হবেন। বাছাইয়ের আর এক জটিল সমস্যা হচ্ছে বাছাই কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে হবে কিনা। যেমন, গ্রামকেন্দ্রিক ও শহরকেন্দ্রিক কাহিনী ; কৃষক-মজুর, না মধ্যবিত্ত ; রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ গল্পগুলি ; নরনারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্ব ; নারীর সামাজিক অবস্থান ; ইত্যাদি যেকোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা গল্পগুলিকে একত্র করা হবে কিনা। তাছাড়াও আছে রোমান্টিক ও বাস্তবধর্মী গল্পের বিভাগ ; আছে রচনাকালের ধারাবাহিকতায় লেখকের চেতনার বিবর্তনের ইতিবৃত্ত সন্ধান। এমনি আরো কত মাত্রাবোধই বাছাইয়ের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গল্পগুলিকেও একটি মূল্যবান সংকলনে দাঁড় করানো যায়—যা আজকের প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী নব্য তরুণের প্রিয়তম বিষয়।

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বিভাগের মধ্যে ও এগুলির অতিরিক্ত, সব থেকে সহজ কাজটিই আমরা করেছি। আমরা বৈচিত্র্যের দিকটিই দেখাতে চেয়েছি। অর্থাৎ উপরের শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটি স্তরের গল্পই এখানে নির্বাচিত হয়েছে। হয়তো এগুলির বাইরেও কিছু কিছু স্ব-তন্ত্র গল্প এখানে স্থান পেয়েছে। যেমন, সংকলনের অন্তর্গত 'মহাসংগম' গল্পটিকে পাঠক কোন্ শ্রেণীতে ফেলবেন? আমাদের মতে এমন শক্তিশালী গল্প, যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়ায় লিখেছিলেন, গোটা দীর্ঘ জীবনে খুব বেশি সাহিত্যিক লিখতে পারেননি।

আর একটি দিকে সচেতনভাবে নজর রাখা হয়েছিল। লেখকের সব থেকে পরিচিত ও বহুপঠিত যে ১০।১৫টি গল্প তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতির জন্য সর্বাধিক দায়ী সেগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। কারণ, লেখক ও শিল্পীর কোনো সৃষ্টি একবার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি পেয়ে গেলে সেগুলি সারাজীবন তাঁদের সংগে এক ধরনের শত্রুতা ক'রে চলে এবং সেগুলিই বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের পরিণত, আরো সার্থক ও শক্তিশালী সৃষ্টিগুলিকে গ্রহণ করার পক্ষে। এমন কি, তাঁদের

সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টায় এগুলি জোরালোভাবে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। একজন মহান স্রষ্টার তুচ্ছ, সামান্য সৃষ্টির মধ্যেও যে অসাধারণ এক পূর্ণতা ও অনন্য সার্থকতা লুকিয়ে থাকতে পারে, একথা সাধারণভাবে আমাদের ভুল হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব থেকে পরিচিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পতুল-নাচের ইতিকথা'। এর বাইরে আরো বড় জোর দু-তিনখানি উপন্যাসের সঙ্গে অনেক পাঠক পরিচিত। কিন্তু তাঁর তথাকথিত গৌণ উপন্যাসের মধ্যে এমন চার-পাঁচটির নাম আমরা করতে পারি যেগুলির মধ্যে তাঁর প্রতিভার আরো বিচিত্র সফলতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু 'পদ্মানদী' ও 'পুতুলনাচের' বাইরে ক'জন এগোতে রাজি!

তাঁর বহুপঠিত ও বিখ্যাত গল্পের সংখ্যা ১০-এর মধ্যে। তার একটি এলোমেলো তালিকা এইরকম প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, হলুদপোড়া, কুষ্ঠরোগীর বৌ, সমুদ্রের স্বাদ, শিল্পী, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, হারানের নাতজামাই, ছোটবকুল-পুরের যাত্রী। মোটামুটি এই তালিকা নমুনা-সমীক্ষার সাহায্যে তৈরি করা গেছে। শিল্পী-র বদলে কেউ কেউ হয়তো অন্য তিন-চারটি নাম করেন, কিন্তু অবশিষ্ট ন'টি প্রায় পাকা হিসেব।

আমরা উপরোক্ত ১০টি গল্প আমাদের সংকলনে গ্রহণ করিনি। আরো নিশ্চয়ই অনেক প্রত্যাশিত গল্প নির্বাচিত হয়নি। যেসব গল্প নেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেক-টিই সচেতনভাবে বাছাই করা হয়েছে। লেখকের প্রতিভার সামর্থ্য ও আজকের দিনে এসব গল্পের প্রাসঙ্গিকতার কথা বিশেষভাবে ভাবা হয়েছে, যাতে লেখক হিসেবে তাঁকে বুঝতে আরো সুবিধা হয়। তাঁর ভাবনার বিবর্তন, রচনাকৌশলের রূপান্তর, তাঁর বাস্তবতার সন্ধান—এমন কি তাঁর সীমাবদ্ধতা ও 'ম্যানারিজম' ইত্যাদি সবসুদ্ধ।

'নেকী' গল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে প্রথম জীবনে সাহিত্যরচনার শুরুতে কিছুটা শরৎচন্দ্রীয় কাহিনী বিন্যাসে তাঁর হাত পাকাবার প্রয়াসের নিদর্শন হিসেবে। অথচ ঐ গল্পেও পরবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আবার যেমন, 'যাত্রা' নামের গল্পে তাঁর প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন। 'মহাসংগম' গল্পটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এর তুল্য গল্প বিশ্বসাহিত্যেও কদাচিৎ মিলবে।

উত্তরকালের 'ফেরিওলা' গল্পটি বাছাই করা হয়েছে এটা দেখাতে যে বাস্তবতার নিরিখকে একটা 'ফেবল্'-এর সীমায় নিয়ে গিয়ে পাঠকের মনে অভিপ্রেত বাণী-টিকে পৌঁছে দিতে লেখক কতখানি সফল হয়েছেন।

সংকলন করতে বসে সংকলিত গল্পগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে যাওয়া অরসিকের কাজ। সংকলকের বাগাড়ম্বরও নিরর্থক। গল্প কীভাবে পড়তে হয় বা সার্থক গল্পে কী খুঁজতে হয়, সে সম্পর্কে পথনির্দেশও এখানে অবান্তর।

তবে একটা কথা বলতেই হয়, তা হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের এই মুহূর্তের প্রাসঙ্গিকতা। কে যেন কবে কোথায় বলেছিলেন প্রথম জীবনে ফ্রয়েডের দ্বারা ও শেষজীবনে মার্কসের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। সম্ভবত ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর থেকেই এ কথাটি চালু হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাঁর রচনাবলী বিচার করতে বসে উভয় সংকটে ভুগেছেন অনেক সমালোচক। অনেক জরুরি কথাও তার ফলে উহ্য থেকে গেছে। যেমন, এটা কেমন ক'রে সম্ভব হল যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ প্রভাবিত হলেন না? শেষজীবনের অনেক তথাকথিত নিন্দিত গল্পে উদ্দেশ্যবাদ ও প্রচার-মূলক শৈলী যে তাঁর সচেতন ফর্মের পরীক্ষা, যার সূত্রপাত আগের জীবনেও ছিল—এ কথা কেউ ধরিয়ে দিলেন না। আরো নানা প্রশ্ন সামনে আছে।

কিন্তু কীসের ফর্ম? শুধু রচনাকৌশলের কথা নয় নিশ্চয়ই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, 'কমিটেড', লেখক। তাই তাঁর কর্ম-সন্ধান শোষিত, দরিদ্র, সংগ্রামরত মানুষের রূপকে সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়।

প্রথম জীবনের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষজীবনের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো যুক্তি ও পরম্পরাহীন অসংলগ্নতা নেই। যিনি 'অতসীমামী' লিখেছেন তিনিই 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' লিখতে পেরেছেন। মার্কসবাদই তাঁকে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন: "ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম—তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের!" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের তথাকথিত স্ববিরোধ ও সে বিষয়ে তাঁর নিজের সচেতনতা ও সংগ্রাম-ই তাঁকে একালের সব থেকে সৎ সাহিত্যিকে পরিণত করেছে।

যে সমাজ ও মানুষকে তিনি দেখেছেন ও সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন তার মৌলিক কোনো পরিবর্তন আজও ঘটেনি। তাই তাঁর আশা, হতাশা, আহ্বান, লড়াই, সাধারণ মানুষের ও সমাজের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি আজকের সমাজ-সচেতন লেখকদের উপর বর্তেছে। 'বাছাই গল্পের' গল্পগুলি থেকে পাঠক এসব কথা ধরতে পারবেন। বাছাই নিয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে, কিন্তু পাঠক যা পাচ্ছেন, তার তুলনা নেই। একথা বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি।

নেকী

পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহর।

শহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারিদিক ঘুরে এলে মনে হয় যেন এ শহর আর গ্রামের আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি।

বাজার আর অ্যাপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি শহর। আপ-টু-ডেট বাজার—কলকাতায় কোনো নতুন ফ্যান্সি জিনিস উঠলে একমাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারী দোকান-গুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটিমাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা, বাজারের বুক ভেদ ক'রে, আদালতের গা ঘেঁষে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারের কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরি, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাব-সংলগ্ন টেনিস-কোর্ট ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। শহর যেমন হয় আর কি।

বাকিটুকু কিন্তু গ্রামছাড়া কিছু নয়। বাড়ি-ঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেওয়া। কোনো কোনোটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান পুকুর ডোবা ঝোপঝাড় জঙ্গল বেতবন থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেঁজি এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্যন্ত সমস্তই আছে।

শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটা বরাবর স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ দখল ক'রে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জি।

বাড়িটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আমবাগান, তারই একদিকে ডোবা সংস্করণ একটি পুকুর। এই গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

ষোল-সতর বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারিদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপালার প্রাচীর। এত ঘন যে আট-দশ হাতের ভেতর এলেও বুঝতে পারা যায় না এখানে পুকুর আছে: আশেপাশে বাড়ি-ঘরও বেশি নেই—একান্ত নির্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মতো সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্ত চিত্তে অঙ্গমার্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল, বছর বাইশ-তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা, একটি আম গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্তভাবে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক'রে দিয়ে মেয়েটি সংযত হয়ে নিল। জড়-সড় হয়ে তেমনিভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, সরে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধা ক'রে জল থেকে উঠে এল। তারপর ধীরপদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কি দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোনো দিকে তার লক্ষ্য নেই!

রাগে গা জ্বলে গেল। তিক্তস্বরে মেয়েটি বললে, দেখুন—

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি বললে, এত দূরে থেকে দেখতে আপনার বোধহয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনো বাকি আছে।

আমায় বলছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কারুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার যদি এরকম প্রবৃত্তি—রাগে দুঃখে মেয়েটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বললে, আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলি নি। কিন্তু এ আপনার কোন্ দেশী ভদ্রতা? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়!

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বললে, এসব আপনি কি বলছেন? আমি—

ন্যাকামি! ছেলেটির মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হয়ে গেল। কটু কণ্ঠে বললে, অন্যায় বলেছি। দু'চোখ বড় বড় ক'রে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গরু মহিষও তো মাঝে মাঝে জল খেতে আসে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়ান।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

আমায় বিশ্বাস করুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি তা দেখি নি। আর এক-দিনের কথা বললেন, কিন্তু আমি কাল মোটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আশেপাশে যদি দু'একটা পাখি মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে-ছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায় বসল তাই দেখছিলাম, আপনাকে নয়।

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললে, এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।

পিছন ফিরে ঘাটের দিকে চলতে চলতে মেয়েটি বললে, ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকি নই।

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে গেল। সকাল বেলার উজ্জল আলো পর্যন্ত যেন এক সুন্দরী তরুণীর দেওয়া কুৎসিত অপবাদের ছাপে মলিন হয়ে উঠল।

ছেলেটি নিশ্বাস ফেলে সরে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হল না। আঁকা-বাঁকা সরু পথটি ধরে বাগান পার হয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সাদা বাড়িটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড় ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে ঘাটের একধারে বসে পড়ল!

মা বললেন, কি শিকার করলি রে অশোক?

অপবাদ।

অপবাদ?

হুঁ, বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক বললে, গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারি ঝগড়াটে হয় না মা?

কার সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?

অশোক বললে, আমায় করতে হয় নি। একাই করেছে। বাবু স্নান করছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুর পাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওঁৎ পেতে ছিল বোধহয়। বাপ্, থাকো তোমরা এখানে, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।

মা বললেন, কোন্ পুকুর? বাগানের ভেতরেরটা?

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তবে বোধহয় হৃদয় মোক্তারের ভাগ্নী। খুব সুন্দর দেখলি?

দেখলাম? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধহয় খেয়েই ফেলত।

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে ফেললেন, না রে, ও খুব ভাল মেয়ে। দোষের ভেতর একটু তেজী আর ঠোঁটকাটা।

অশোক বললে, হুঁ।

মা বললেন, মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভালো রে, কাজ দেয়। অন্যায় ও মোটে সহ্য করতে পারে না।

অশোক বললে, জানি। খুব ন্যায়বান ও। কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কি না আরেকদিন উঁকি মারছিলেন।

চিনতে পারে নি। নেকী তো প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।

নেকী? ওর নাম নেকী নাকি?

হাঁ, ছেলেবেলায় নাকে কাঁদত বলে ওর পিসী ওই নাম রেখেছিল। মা হেসে ফেললেন।

অশোক বললে, নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আর একটু হলে কেঁদে ফেলতাম।

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবে দুপুর বেলার প্রচন্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভাপ্সা গরমে যেন সিদ্ধ করে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে।

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ি নেই, কাছেই এক মুন্সেফের বাড়ি গেছেন। রোদ বৃষ্টিতে আর যা কিছু আট-কাক্ মেয়েদের বেড়ানোটা আটকায় না। ছোট ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আম-বাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্যালোকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের দিকে চেয়ে রইল।

দুপুর বেলা—কিন্তু চারদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে দিতে চায়।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো সামান্য একটু বাতাস বয়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা মৃদু শব্দ ক'রে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হয়ে দেখল খান দুই বই হাতে ক'রে নেকী উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ির আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড় ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে মাসীমা বলে ডাক দিয়ে নেকী অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটার দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমতো চমকে উঠল।

আপনি। ও হ্যাঁ। ঠিক।

অশোক, গম্ভীরভাবে বললে, মা বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, ওঘরের টেবিলের ওপর রেখে যান।

নেকীর যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলে আপনি অশোকবাবু—না?

হুঁ।

তাহলে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হল।

নেকীর মুখের দিকে চেয়ে অশোক বললে, আমার সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হল কিসে? আমি অশোকবাবু বলে?

মৃদু হেসে নেকী বললে, হ্যাঁ। মাসীমার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায় খেয়াল ছিল না। এখানকার কোনো ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছিলাম আপনাকে।

বেশ করেছিলেন।

আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।

অশোক কথা বললে না।

নেকী বললে, চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে আর সইতে পারে? আচ্ছা আমি হাত-জোড় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি, তাতে হবে তো?

হবে। কেউ বাড়ি নেই, বিকেলে এলে ভালো করতেন।

অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই তো?

অশোক নির্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বললে; সেই রকম মানেই তো দাঁড়ায়।

নেকীর মুখ ম্লান হয়ে গেল, কথা না খুঁজে পেয়ে বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

না, না, তাড়াব কেন? অতখানি অভদ্রতা করতে পারি আপনার সঙ্গে? আমার বলবার উদ্দেশ্য—অশোক থেমে গেল।

উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য মরুক। আসল কথা কি জানেন, আপনাকে আমি ভয় করি। হয়তো বলে বসবেন, একলা পেয়ে আপনাকে আমি অপমান করেছি।

বাকিও তো রাখলেন না কিছু।

এ অপমান নয়, অন্য রকম।

অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত! চারিদিকের নির্জনতা অন্য রকম অপমানের অর্থ-টাকে এমনি স্ফুটতর ক'রে তুলল যে, অপমানে নেকীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বই দুটি মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা থাকলে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই পরিচয় পেয়েছি। বলে ঝড়ের মতো চলে গেল।

মিথ্যা আপনাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই-বার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল, সে ভুল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান। সে না হয় নজর দিতে যায় নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না? বাঙালীর মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোনোরকমে ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে যায়। অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে ক'টি মেয়ে। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে ক'টি মেয়ে একান্ত নির্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর বলতে পারে, আপনি গরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই মেয়েটিকেই সে অপমান করেছে। তাও সে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন।

বিকালে দু'ভাইকে খাবার দিয়ে মা বললেন, তোর নেকীদি দুদিন এল না কেন

রে পুলক ?

পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, দাদা বকেছে। বলে আবার আমটা মুখে তুলল।

হুঁ।

আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের ? কি হয়েছিল ?

অশোক বললে, পরশু তুমি বাড়ি ছিলে না, দুপুর বেলা বই হাতে করে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ি নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল বলে চলে গেল।

সবটুকু দোষ অশোক নির্বিকারে নেকীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। এমনি ক'রে মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে। বেদনা দেওয়া সহজ,আঘাত ততোধিক। কিন্তু অমন একটা সহজ কাজ করেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী, তার হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান ক'রে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মতো ক্রমাগত বিঁধে চলে।

মা বললেন, কি ছেলেমানুষী যে তোরা করছিস অশোক। নেকী তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয় !

না। খুব ভালো মেয়ে।

রোদ পড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হল। আমবাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা সরু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভালো লাগে। মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া ক্ষেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলা-গুলি পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যায়। ক্ষেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসাবী সূর্যের তাপ চুরি ক'রে সঞ্চিত ক'রে রাখে, সূর্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকির্ণ করে। অশোক সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। চষা মাটির অস্পষ্ট সুবাস তার মনকে উদাস ক'রে দেয়। পুলকের হাত ধরে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনি ভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জগতের জীবনের রস যোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো।

মাঠের পরে বাড়ি থেকে মাইল খানেক তফাতে ছোট একটি নদী,এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জমে আছে, বাকিটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধব্‌ধবে বালি। এককালে স্রোতের নীচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীর মতো অপূর্ব নক্সা এঁকে দিয়েছে। কোথাও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথাও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গড়ে উঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয় আঁকলো কে ? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য নষ্ট হয়ে যায়। অশোক ব্যথিত হয়ে ওঠে অথচ ওই কারুকার্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়তো পড়ে না। তুচ্ছ বলে নয়, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা

আছে বলে।
অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আম বাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকী একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকী স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতেই তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।
অশোক এগিয়ে গেল। কিন্তু পুলক নেকীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আর যে আমাদের বাড়ি যাও না নেকীদি? দাদা আর কিছু বলবে না, মা বকে দিয়েছে।
অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, পুলক আয়, দেরি হয়ে গেছে।
নেকী পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কি বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকীর হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বললে, তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকীদির সঙ্গে সাঁতার কাটব।
বেড়াতে যাবি না?
পুলক ঘাড় নেড়ে বললে, রোজ তো বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এস না দাদা, তিনজনে সুইমিং রেস দেব, নেকীদির সঙ্গে পারবে না তুমি।
অশোক ধমক দিয়ে বললে, এই অবেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড় পুকুরে সাঁতার কাটব।
পুকুরের ছোট-বড়ত্বের জন্য পুলকের মাথাব্যথা ছিল না, নেকীদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকী তার হাত ধরে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।
অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এই অবেলায় ওকে যে পচা ডোবায় স্নান করার জন্য নাচালেন, অসুখ হলে দায়ী হবে কে?
মুখ না ফিরিয়ে নেকী জবাব দিল, আমি। ওর অভ্যাস আছে।
অভ্যাস আছে কি রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?
গেঁয়ো ভূত না হোক, শহুরে বাবু তো নয়। বলে নেকী পুলককে নিয়ে মোটা আম গাছটার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
শহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাকে শহুরে বাবু ঠাওরাল নাকি! নিতান্ত চটে যত দূরে সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হনহন ক'রে বাগান পার হয়ে অশোক মাঠে পড়ল।
মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবলে, কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হয়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় বসে থাকবার মতো সাহস তার হতো না।

ঈশান-কোণের জমাট বাঁধা কালো ছায়াটি যে রকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে ফেললে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হলও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক কালো, ভয়ানক গম্ভীর মূর্তির দিকে চাইল ততবারই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। নেকী তো নেকী, ঝড় শুরু হবার আগে কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছানোর চিন্তা ছাড়া অন্য সব কথা তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেল। এ সময় এক রকম নিত্যকার ব্যাপার হলেও ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কালবৈশাখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জন মাঠে সেই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনা করেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্র গর্জন কেমন শোনায় জানত। পেছন থেকে সেই রকম একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কাল-বৈশাখী তাড়া করে আসছে এবং তাকে ধরে ফেলতে মাত্র দু-তিন মিনিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচুনীচু মাঠের ভিতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। বাধ্য হয়ে দৌড়ান বন্ধ করে অশোক দ্রুত চলা শুরু করলে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক দেখলে আমবাগান তখনো পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।

আমবাগান? ঝড় তো ধরে ফেলবে ঠিক, তখন আমগাছের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অশোকের ইচ্ছা হল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভালো করে চিন্তা করে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জনটা খুব কাছে এবং বেশি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবার সাহস হল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান তো রাখে না। অন্য সময় ঘন্টাখানেক ধরে খুঁজে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যাবার ভালো রাস্তা আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হতো, কিন্তু এখন সারা রাত ধরে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না তা ঠিক। আমবাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা পাকা ঢের ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাপা দেয় কি আর করা যাবে।

পিছন থেকে মহা কলরব করতে করতে ঝড় এসে অশোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চলল।

ঠিক যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু করেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি ব্যাকুলি শুরু করে দিল।

ল্যাখখানেক ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদঘুটে রকমের ওয়ার-ড্যান্স আরম্ভ ক'রে দিল, সব ভেঙে চুরমার করে ঠান্ডা হবে। মেঘের সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই পতনশীল বারিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা শুরু করে দিল যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভালো করে অনুভব ক'রে অশোকের ইচ্ছে হতে লাগল সেই মাঠের ভেতরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ তো আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালবার অবিশ্রাম চেষ্টায় যে আওয়াজ হতে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ি, অশোকের পথ তার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বসানো জানলায় পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, অশোকবাবু দাঁড়ান, অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকী অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্নাঘরের জানলায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, গলা চিরে ডেকেছি, যে শব্দ। ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

না। মা ভাববেন।

অশোকের পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, বাগানের ভেতর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন চারটে গাছ পড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।

অশোক তবু দ্বিধা করল, কিন্তু মা যে পাগল হয়ে উঠবেন।

নেকী ব্যাকুল হয়ে বললে, সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছ চাপা পড়েন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। বলে হাত-জোড় করে বললে, অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি চলুন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকীর মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না, বললে, চলুন।

নেকী অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হয়ে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজার বাইরে থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে শিকল খুলে ফেললে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিভে গেল।

অশোককে হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকী বললে, দাঁড়ান, আলো জ্বালছি, ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বললে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

না।

সিগারেট খান না?

না।

খুব ভালো ছেলে তো। নাঃ, আপনার সঙ্গে তা হলে পারা গেল না দেখছি! রান্নাঘরেই যেতে হল, থাকুন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বলে নেকী বাইরে চলে গেল।

দেশলাই নিয়ে আলোটা জেবলে ফেলুন অশোকবাবু। একবার তো দু'জনেই খানিকটা করে জল ঢেলেছি, সর্বাঙ্গে যে রকম ধারা বইছে, এবারে ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী বয়ে যাবে।

নিকষ-কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকীর হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি রান্নাঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিকচিক করছিল। দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললে, একেবারে ভিজে গেছেন যে।

সেটা উভয় ; পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।

আলো জেবলে অশোক বললে, মেঝেটা সত্যিই ভেসেছে।

তা হোক মুছে নিলেই হবে। আলনা থেকে লালপেড়ে শাড়িটা দিন। বাক্স না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।

অশোক শাড়িটা এনে দিলে, বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল, শাড়ি নিয়ে নেকী সেখানে চলে গেল।

অশোকের জামা-কাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতিমধ্যে প্রায় সবটাই ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়ই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকীর প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দু'টি বড় বড় খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোনে গোটা কুড়ি-পঁচিশ হাঁড়ি কলসী, তাতে সংসারের চাল ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরনো রঙচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফর্সা, মলিন, আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ি সেমিজ যত্ন করে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুনি গোঁজা। আয়নার নীচে একটা টুল, তার কাছে হাতভাঙা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোনের সবটুকু দখল করে আছে। মাথা নীচু করে অশোক খাটের নীচে উঁকি মারল। ধুলোয় মলিন বড় বড় পিতলের হাঁড়ি কলসী ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কুলো ধুচুনি পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, ভূত দেখছিলেন না কি?

না বাঘ। অন্ততঃ একটা শেয়াল যে খাটের নীচে—

চোখ তুলে অর্ধপথে সে থেমে গেল। মন থেমে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে

গিয়েছিল। বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হযে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে চুল ভালো ক'রে মোছা হয় নি। এক গোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, আলো পড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা। তার অন্তরাল হতে সে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকী লাল হয়ে চোখ নত করলে। হঠাৎ—আচ্ছা তো আমি। ভিজে কাপড়ে দাঁড়িযে আছেন খেয়ালই নেই—বলে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। ধোপদুরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকের হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিযে বলল, কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি। বলে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, আসুন এবার।

নেকী এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছু কিছু ছাট আসছিল, ঘরে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নেকী দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে আপনি আপনি করছেন এমন বিশ্রী লাগছে। এতটুকু সাহস নেই যে 'তুমি' বলেন?

অশোক বললে, সাহস আছে কিনা পরিচয় পাবে। ওটা কি হল? বলে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকী বললে, এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? ছাট আসছিল, বন্ধ ক'রে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই কিছু।

কিন্তু—

সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাতে বসুন। আমার নাম নেকী, কিন্তু ন্যাকামি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আপনার সঙ্গে একা এক ঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাকলে বরং ঘরটা ভিজবে।

অশোক বসে বললে, তুমিও বোসো, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।

খাটের কোনায় বসে হাসিমুখে নেকী বলল, হুকুম করুন।

তুমি এখানে একা থাক?

নেকী হেসে উঠল—তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন নাকি? হাসি থামিয়ে বলল, থাকি তিনজনে, মামা, পিসীমা আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশু-দিন মফস্বলে গেছেন, পিসী বিকেলে কাদের বাড়ি গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ। আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারি ভয় হয় অশোকবাবু।

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, আমি চললাম।

নেকী বিস্মিত হয়ে বলল, কি হল আবার?

আমার মতো মূর্খ আর নেই। ছি ছি, একবারও খেয়াল হল না।
কি হল বলুন না ?
বুঝলে না ? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারি বিশ্রী হবে, আমি যাই।
নেকী বললে, ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কি ক'রে ?
না না তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড় ক্ষতি হবে, জান ?
নেকী দৃঢ় কণ্ঠে বললে, জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভালো দিনে কেউ আসে না, আর ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে।
অশোক বসল। বললে, তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে তো একরকম জানই না, কি বলে ডেকে আনলে ?
আপনাকে জানি না কে বললে ?
আমি বলছি। এসেছি পাঁচ দিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি। চেনবার সুযোগ পেলে কোথায় ? পুকুর পাড়ে বরং—
নেকী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। ওটা তার স্বভাব। বললে, পুকুরের ঘটনাটা ভোলেন নি দেখছি।
না ভুলি নি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বল কি ক'রে চিনলে আমায় ?
নেকী বললে, একজনকে চিনতে হলে তার সঙ্গে দু'চার বছর মিশবার দরকার হয় বলে মনে করেন নাকি আপনি ? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমন ভাবে ঝগড়া করতে পারে তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন ?
অশোক ঘাড় নেড়ে বললে, না।
তবে অন্য রকম ক'রে বলি। আমাদের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে অশোকবাবু : একবার দেখলেই আমরা মানুষকে চিনতে পারি। আর কি জানেন, মাসীমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।
নেকীর কথায় তার মার প্রতি এমনি একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেল যে, অশোক খুশি হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আচ্ছা নেকী, তোমার ভালো নামটা কি বল তো ?
নেকী নামটা পছন্দ হয় না ? ও নামটা আমায় একেবারে মানায় না, কি বলেন ? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।
লীলা ? বেশ নাম।
সত্যি বেশ ?
অশোক জবাব দিলে না, একটু হাসল।
হঠাৎ নেকী বললে, আপনার খিদে পেয়েছে ? আম খাবেন ?
অশোক ঘাড় নাড়ল।

আম খাবেন না ? তাহলে কি দিই। কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধহয় তাই খান তবে।
অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।
ঘাড় নাড়ছেন যে খালি ? ইচ্ছেটা কি ?
ইচ্ছে না খাওয়া। বাড়ি থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।
নেকী মুখ গোঁজ করে বললে, হুঁ।
রাগ হল ? আচ্ছা দাও খাব।
থাক্। খিদে না থাকলে খেতে নেই।
অশোক তৎক্ষণাৎ বললে, খিদে যেন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। কি দেবে দাও খেয়ে নি।
নেকী হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোনের কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।
অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।
নেকী বললে, খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ ক'রে থাকতে ভালো লাগে না।
কি বলব ?
যা খুশি।
যা খুশি নয়, অশোক নেকীর কথাই পাড়ল। একটু একটু করে নেকীর জীবনের যে ইতিহাস সে শুনল তাতে অবাক হয়ে গেল।
বড়লোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকীর মনে নেই। পিসীই তাকে মানুষ করেছে। কি সব কারণ ঘটেছিল নেকী জানে না, তার যখন ষোল বছর বয়স, ব্যবসা ফেল পড়ল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো ক'রে দিয়ে নেকীর বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর দুই আগেই পিসীকে নিয়ে এই মামার আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম অভ্যস্ত সৌখীন জীবন।
—নতুন জীবনের ভয় বাবার শোককে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোকবাবু। পাড়াগাঁ চক্ষে দেখি নি, পিসীর কাছে শুনে দু'চোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম, গাঁয়ের মেয়েরা কি ভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন ক'রে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজে, লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দু'বেলা পেট ভরায়, পিসীর কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আপিঙ গুলে খাওয়া সহজ।
অশোক বললে, তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল ?
নেকী বললে, এসে দেখলাম, ভয়ের কারণ নেই, ঘর নিকোবার দরকার হল না বাসনও মাজতে হল না। রান্নার ভারটাও পিসীমা নিলেন। সেদিক দিয়ে বিশেষ

কষ্ট হল না, কিন্তু কপাল মন্দ, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই কয়েকটা মোকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মামা অবশ্য বললেন, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে দিলাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আপিণ্ড খেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেই গোবর লেপা থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত সব কাজগুলি করে ফেললাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল না।

অশোক বললে, রান্নাটাও বোধহয় এখন করতে হয়?

হ্যাঁ। পিসীমার বাতের শরীর, পারেন না।

ঝড়ের বেগ কম পড়তেই নেকী বললে, আপনি এখন আসুন অশোকবাবু। একা ফেলে গেছে. পিসী হয়তো ঝড় ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পিসীর আসার কথাই ভাবছ, আমি যদি সবাইকে বলে দিই সন্ধেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?

নেকী হেসে বললে, ওইটুকু আপনি করতে পারেন না, এই দুঘণ্টার কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

মাকে কিন্তু বলতে হবে।

তাতো হবেই, মাসীমাকে বলবেন বৈকি! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশোক হেসে বললে, তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?

আমার দরকার হবে না, একাই আসতে পারব।

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বললে, বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বোসো, এটুকু খুব যেতে পারব।

আচ্ছা, আসুন তবে।

অশোক বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকী বললে, বাড়ি গিয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।

আচ্ছা, বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বললে, তোমার ভয় করবে না তো?

একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসী এলে ভারী মুস্কিলে ফেলবে।

অশোক উঠোনে নেমে গেল। নেকী চেঁচিয়ে বললে, আর একটা কথা অশোক-বাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি তো?

উঠোন থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বললে, সন্ধিপত্রের খসড়া ক'রে রেখো সই ক'রে দেব। বলে রান্নাঘরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকী সেইখানে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগ কমেছিল, কিন্তু বৃষ্টি সমানভাবেই পড়ছিল। ছাট লেগে নেকীর বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই রইল না।

পরদিন সকালে অশোকের জামা আর কাপড় হাতে ক'রে যেতেই অশোকের মা নেকীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। বললেন, বাগানের এক একটা গাছ পড়ার শব্দ শুনেছিলাম আর আমার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা। যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত।

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকীর মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা নত করল।

মা বললেন, বোস্, খাবার খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়ারটা বার ক'রে দিয়ে আসি। বলে চলে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বলল, মনিব্যাগটা ?

মনিব্যাগ ? মনিব্যাগ তো ছিল না।

ছিল না কি রকম ? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল ?

নেকী হেসে ফেললে, যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হয়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশি টাকা ছিল নাকি ?

না, গোটা পাঁচেক। দৌড়বার সময় মাঠে পড়েছিল বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয় নি। ভালোই হয়েছে, সারের কাজ দেবে।

তা দেবে, টাকার মতো সার আর নেই।

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকাল বেলা মা চা করেছিলেন, ঝরা ফুলের মতো পরিম্লান মূর্তি নিয়ে নেকী এসে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

মা বললেন, জ্বর ছেড়েছে ? উঠে এলি যে ?

জ্বর নেই। আমায় এক কাপ চা দিও মাসীমা।

এখনো খাসনি কিছু ?

নেকী ঘাড় নাড়লো।

তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কি চেহারাই হয়েছে মেয়ের।

স্টোভের ওপর কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকীর সামনে ধরলেন।

অশোক বললে, তিন চার বার ক'রে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না ?

নেকী বললে, প্রথম দিন থেকেই ও পুকুরে স্নান করাটা আপনার চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি।

কি মুস্কিল। এ মেয়েটা প্রথমদিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না।

মা কি কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ কান

বুজে উদরস্থ ক'রে ফেলল। চায়ের কাপ তুলে বললে, দুধ তো না, বিষ।

তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।

না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুণি একবাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।

ভালোই তো।

ভালো বৌক। চায়ের কাপটা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, মার আসবার আগেই পালাই তাহলে।

অশোক বললে, না বোসো, বলব না।

রাঁধতে হবে, পিসীমার অসুখ।

এই শরীরে রাঁধবে?

না রাঁধলে চলবে কেন? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছেন। এ যা, আসল কথা ভুলে গেছি। বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে আসবেন। বলে নেকী চলে গেল।

বিকালে প্রায় ছ'টার সময় পুলককে সঙ্গে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

কি সৌভাগ্য—কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্তীর বয়স নির্ণয় করা দঃসাধ্য। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সঙ্গত নয়। কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হয়ে তামাকের ধোঁয়ার বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্মপ্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হয়েই রইল।

বড় ঘরে বারান্দায় সেই ভাঙা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল। অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল করে উবু হয়ে বসে ডাকলেন নেকী!

নেকী ভেতর থেকে সাড়া দিল, আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।

দু'থালা বোঝাই আম দু'জনের সামনে ধরে দিতেই অশোক বললে,একি ব্যাপার! এত আম খাব কি করে?

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না কিছু না, যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হয়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মা ঠাকরুন নেকীকে স্নেহ করেন তাই, নইলে আমাদের মতো লোকের বাড়ি আপনাকে খেতে বলা—সাহসই হতো না।

নেকী মুচকে হেসে ভেতরে চলে গেল।

কী যে বলেন। বলে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিলে, বললে, খা পুলক উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকি নষ্ট হবে।

চক্রবর্তী মোক্তার মানুষ বকতে পারেন, আসর সরগরম করে রাখলেন।

অশোক কখন হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখনো বললে, নিশ্চয়। কখনো মৃদু

হেসে বললে তা' বইকি ! বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ ক'রে চক্রবর্তী কলি-কালের লোকের ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভ-পরায়ণতার কথা কীর্তন করলেন। বললেন আদালতে এত মামলা মোকদ্দমা কি জন্যে মশায় ? ওই লোভ। মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে দু'বিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। কেন রে বাবু ? পরের জিনিস নিয়ে টানাটানি কেন ? নিজের যা আছে তাই নেড়ে খা না।

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, তা বইকি !

এইবার চক্রবর্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজিলোক তাঁর পাঁচবিঘে জমি যে কি রকম ভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে দাবির মোকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা ক'রে চক্রবর্তী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন : শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলে।

থালা অর্ধেক খালি করে ঠেলে দিতেই চক্রবর্তী হাত-জোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হয়ে বললে, ওকি ? ওকি ? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বাপের বয়েসী ভদ্র-লোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন করে ফেলেছেন দেখে বেদনা অনুভব করলে।

জোড় হাতেই চক্রবর্তী নিবেদন করলেন, তবে দু'টি সন্দেশ মুখে দিন। বলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকলেন, নেকী ! নেকী !

নেকী নিঃশব্দে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুটো আম ফেলে দিলেই হবে ? একি হেঁজিপেঁজি লোক পেয়েছিস। বাপের তো টাকা ছিল। এটুকু শিক্ষাও হয় নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্যে এনেছি নাকি ? চারটে প্রশ্ন। নেকী নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, সন্দেশ নেই।

নেই ? কি হল ? পাখা গজিয়েছে ?

আছে দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

হাঁড়ি ভাঙল কেন ?

তাকের ওপর ছিল। বেড়ালে ফেলে দিয়েছে।

হুঁ। বলে চক্রবর্তী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অশোক হেসে বললে, বেড়াল ভালো কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হতো।

চক্রবর্তী সখেদে বললেন, যোল-সতের বছর বয়স হল, কোনো দিকে যদি নজর থাকে ? আপনার জন্য কত যত্ন ক'রে আনা ? হায় হায় ? আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ।

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটলো না সেজন্য চক্রবর্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কি অপূর্ব বিনয়।

চক্রবর্তী বলে চললেন, অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি আমার তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে। আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মোকদ্দমা আছে ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম, চট করে সাজানো মামলা ধরে ফেলবেন। কিন্তু তা কি থাকবে। দেবে হয়তো এক দরখাস্ত ঝেড়ে, কোন্ কাটখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়ব ঈশ্বরই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আসি চক্রবর্তী মশাই।

চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন, আসবেন? যা তো মা নেকী একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।

না না, আলো লাগবে না, এখানে তেমন অন্ধকার হয় নি এটুকু বেশ যেতে পারব।

চক্রবর্তী জিভ কেটে বললেন, আরে বাসরে। তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

অশোকের ইচ্ছা হল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই? রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন।

এরকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকী একটা আলো জেলে নিয়ে তার সঙ্গে চলল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

অশোক হেসে বললে, মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোট হলে চলবে না।

না, ছোট নয়।

নেকী একটা ঢোক গিললে। আলোটা এমন ভাবে ধরলে যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। বাবাকে একটু বলবেন?

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে অশোক তেমনি চমকে উঠল। অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য ঠেকত না। সরলভাবে নেকী যদি এই অনুরোধ জানাত অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত। নেকীর অজ্ঞানতার কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র। তাকে ভুলিয়ে আদর দিয়ে, নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, শত রকম ভাবে ঘনিষ্ঠতার আসনে বাঁধবার চেষ্টা করে এমনিভাবে এই নির্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোনো অর্থই হয় তো হয় না। টাকা নয়, কিন্তু আদর-যত্নও তো ঘুষের রূপ নিতে পারে। হয়তো এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্তী নিজের

মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে এ অনুরোধ করার আর কি মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?

নেকীর গলা কেঁপে গেল, আমরা বড় গরীব অশোকবাবু।

অন্য সময় এই কন্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয়তো করুণা হতো, এখন হল রাগ। বললে, গরীব ব'লে তোমাদের জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?

অন্যায় তো নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?

তিক্তস্বরে অশোক বলল, না, হয় না। হলেও, জমি তোমাদের কি অন্যের সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমাদের অনুরোধ যে আমাকে আর আমার বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই বলেই নিঃসংকোচে জানাতে পারলে।

নেকী কি বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—চলুন।

যাক্, তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকীর মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বললে, অতিরিক্ত সাধুতো ফলাবেন না অশোকবাবু।

অহেতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরলে, কারণ যাই হোক, এই রকম যুক্তিহীন কথাই মুখ দিয়ে বার হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝলে না, বললে, সাধুতা-অসাধুতার তফাৎ বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই একথার জবাব দিলাম না, আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ লীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মতো ব্যবহার করলে।

অন্তরে ওই কথাটাই বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ন কাঁটার মতো বিঁধছিল, অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনালো, যে অশোক নিজেই চমকে উঠল।

নেকীর হাত থেকে আলোটা পড়ে গিয়ে বারকয়েক দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে নিভে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধরে বললে, বাড়ি চল দাদা।

বাড়ি? চল্।

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল মন্দ কি। ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা তো জানাই ছিল। এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উঃ, কি রকম জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছিল। মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল।

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে। দু'টোর একটা চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না, বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই বলে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক হয়ে গেল, নেকীকে সে যেভাবে ভাবতে চায় নেকী সে ভাবে

ধরা দেয় না। মনে হয়, বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াশা রচনা ক'রে দিয়েছে, সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে নেকীকে সে নিষ্প্রভ দেখছে, কিন্তু কুয়াশার ওদিকে নেকী তেমনি উজ্জ্বল হয়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিস মেলে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা পড়ে গেল।

চক্রবর্তী। হৃদয় চক্রবর্তী। ঠিক।

অশোক ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ। নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্তীর খেলা এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তার নেই। মামা আদেশ করলে তার কথা নেকী কেমন করে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কারও কাছে গোপন নেই, তাকে কি করে এতখানি হীন বলে সে মনে করল? নেকীর তো বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়ি-দড়াগুলি এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলি হয়ে গেল ফুলের মালা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আমবাগানে চলে গেল। পুকুর ধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাত হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর বসে সরু সাঁকো পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একরাতে তার ওপর দিয়ে ঝড় হয়ে গেছে। চোখ লাল, চোখের কোলে কালি। কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্য—বুঝে কাল অশোকের খুশির সীমা থাকে নি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

অশোকের বুক টনটন করে উঠল। কাছে এসে বললে, লীলা, আমায় মাপ কর।

নেকীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বললে, আমি বুঝতে পারি নি লীলা। তোমার কোনো দোষ ছিল না।

ছিল না?

অশোক ভুল করলে, বললে, না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—

আপনার পায়ে পড়ি অশোকবাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মতো ব্যবহার করে, দয়া করে তাকে নীচেই থাকতে দিন। বলে নেকী অগ্রসর হল, পথ ছাড়ুন।

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নেকী ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হল।

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানি চিঠি পেলে। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, রাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে। অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে অশোক মিনিট পনের ভাবল, তারপর সুটকেস গোছাতে বসল। সেই-দিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বললেন, তোর তো আসবার দরকার ছিল না। আমরাই তো কলকাতা যাচ্ছিলাম, যাক, বেশ করেছিস।

অশোক মুখ নত করলে। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহলা তো তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কি?

তোর কি কোনো অসুখ হয়েছিল অশোক?

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, পুলকের স্কুল তো ছুটি হয় নি? ওকি এখানে থাকবে?

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মার চোখে জল এল। বললেন, থাকবে? থাকবার ছেলেই বটে। আর জানিস, নেকী আমাদের সঙ্গে যাবে।

অশোক চমকে উঠল।

মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে রে। তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হয়ে গেছে! মা একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

মার চেঞ্জে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য এবার আর অশোকের কাছে গোপন রইল না। নেকী আজ অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আমবাগান পার হয়ে আসবার তার ক্ষমতা ছিল না। মা পাল্কী নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়েছিল, পাল্কীর খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে নেকী ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত সয়ে রজনী-গন্ধার দল ভোরবেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে সেইরকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকীর পিসীর অসুখ, চক্রবর্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হল না। পিসী একটু ভালো হলেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন, অশোকের মাকে উদ্দেশ্য করে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, আমার আর কেউ নেই মা,

ওকে আপনি ফিরেয়ে আনবেন।

চক্রবর্তীর উপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হল এর চেয়ে ভালো লোক বোধহয় পৃথিবীতে নেই।

শহরের প্রান্তবাহী ছোট নদীটি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। স্টিমার ঘাট পর্যন্ত গাড়ি যায় না, নৌকায় যেতে হয়, স্টিমার ঘাট শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্টিমারে উঠে নেকী কেবিনে ঢুকতে রাজি হল না। রেলিঙের পাশে ডেক চেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকী একদৃষ্টে মেঘনাব জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। স্টিমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে। ওপরের তটরেখা অস্ফুট। দু'বছর আগে এই পথ দিয়েইসে একটা অতি পরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দূর দূর বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোন্ নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে। দেনা-পাওনা হয়তো মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতোই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়তো তার কেঁদেই উঠবে। কিন্তু যেতে বোধহয় হবেই।

অশোক শুষ্ক মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙেগর সুখ-দুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে সে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বললেন। তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারি মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকী হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ তো তোমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকীর কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বললে, আমায় মাপ করেছ লীলা?

নেকী তেমনি ভাবে হেসে বললে, মাপ করার কিছুই নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় ক'রে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধহয় নেই।

অশোকের চোখে জল এল, বললে, আমিই তোমায় শেষ করে দিলাম লীলা।

নেকী তাড়াতাড়ি বললে, না না, ও কথা বোলো না। হঠাৎ অশোকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, কতগুলি সাদা পাখি কেমন সার বেঁধে চলেছে দ্যাখো, বক তো নয়।

অশোক দেখলে। বললে, না, বুনো হাঁস।

হাঁস? ওমা! এ আবার কি রকম হাঁস! আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?

অশোক বুঝলে। একেবারে নেকীর পাশে সরে গেল। নেকীর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, ওদের তো বাড়ি-ঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়—তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সংকোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি? বাড়ি-ঘর না থাকা কিন্তু বেশ! না?

বাতাসে একরাশি রুক্ষ চুল নেকীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। অশোক সযত্নে চুলগুলি সরিয়ে দিলে। আরামে নেকীর চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের স্পর্শটুকু সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ ক'রে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বললে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই?

ঘুমোও।

নেকীর হাতখানি অশোকের হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেতচন্দনের ফোঁটার মতো গতিশীল বুনো হাঁসগুলির দিকে সে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হয়েই রইল।

অশোক মনে মনে বললে, তাই থাক। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক। উজ্জ্বলতর হোক। ওপারের তটরেখা আরও অস্ফুট হয়ে মিলিয়ে যাক।

মহাসংগম

পশুপতি থুরথুরে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে।

এই মাঘে তাহার বয়স সাতাশি পূর্ণ হইল। দু'টো একটা যুগ নয়, পশুপতি প্রাণপণ চেষ্টায় সাত যুগের বেশি পৃথিবীতে টিঁকিয়া আছে।

বিপুল সুদীর্ঘ জীবন।

কিন্তু তার সামনে যে মৃত্যু, সে আরও বিপুল, আরও সুদীর্ঘ! মৃত্যুকে কে ঠেকাইয়া রাখিবে? সাতাশি বছরের আয়ু নয়; সে বরং মৃত্যুকেই কাছে ডাকিতেছে বেশি। পৃথিবীতে যে যতদিন বেশি বাঁচিবে সে তত গিয়া পড়িবে মরণের কাছাকাছি। একদিন দেখা যাইবে তাহার দেহে তাহার মনে, তাহার ক্ষীণ স্পন্দিত প্রাণের জগতে মরণকে যেন অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনেই যেন হইয়াছে জীবনের মরণের মহাসংগম।

পশুপতি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চামড়া তাহার বিবর্ণ, লাল, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত। মাথায় কুড়ি বছরের পুরনো টাকটি পর্যন্ত তাহার ঢিলা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কানে সে ভালো শুনিতে পায় না। একটি অলৌকিক মর্মরিত জগতে সে বাস করে। বিরাট বায়ুস্তর হইতে কোটি মিশ্রিত শব্দ। অহরহ তাহার দুই কানে আঘাত করে, কাছে কলরব করে মানুষ পশু আর পাখি, সব মিলিয়া তার শুধু একটি অবিচ্ছিন্ন চাপা গুঞ্জন ধ্বনির অনুভূতি হয়। বাড়ির লোকে তাহার সংগে কথা বলে চেঁচাইয়া।

বাড়ির লোকে তাই তাহার সংগে কথা কয় কম। কত চেঁচাইবে!

চোখে এখনো সে অল্প অল্প দেখিতে পায়, কিন্তু চোখের পাতা দুটি সিসার মতো ভারি হইয়া সর্বদাই তাহার চোখদু'টিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিয়া রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রূ পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নাই। চোয়ালের দু'পাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দু'টি নিস্তেজ নীল শিরা তাহার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নিচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মতো বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনোমতে নিজের কোমরের লেভেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই-হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়; লাঠি না থাকিলে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভারকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।

উঁবু হইয়া বসিলে দুই হাঁটু মাথার কাছে ঠেলিয়া ওঠে।

পশুপতি থাকে চাঁদ পুতিয়ার শ্রীমন্ত সরকারের বাড়ি।

শ্রীমন্ত তাহার কেহ নয়। দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। পশুপতির একটি ছেলে ছিল। হয়তো এখনো আছে। কেহ তাহার খবর রাখে না। অনেক কাল আগে সে পলাইয়া গিয়াছিল সেই বর্মামুলুকে। মাঝখানে একবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই বিবাহাদি করিয়া সে সুখে বসবাস করিতেছে, তারপর আর কোনো খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমন্ত মোক্তার; মফঃস্বলে মোক্তারি করিয়াও অনেকে পাকা দালান তোলে কিন্তু শ্রীমন্ত এখনো সেটা পারিয়া ওঠে নাই। বাড়িটা তাহার বড় কিন্তু কাঁচা। সদরের ঘরটা শ্রীমন্তের মোক্তারি ব্যবসার জন্য লাগে। অন্দরের ঘরগুলি তাহার দখল করিয়া থাকে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। বাড়ির একেবারে পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের নিচু ভিটাতে একখানা ছোট ঘর আছে। মাঝখানে বেড়া দিয়া ঘরখানাকে দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তার একটা ভাগে কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বাস করে পশুপতি।

পাশের ভাগটাতে থাকে কুন্দ, তাহার দু'টি ছেলেকে লইয়া। ধরিলে কুন্দ হয়তো শ্রীমন্তের কেহ হয়, না ধরিলে সে পরের চেয়েও পর। কিন্তু শ্রীমন্ত বোধহয় সম্পর্কটা ধরিয়াই এই খোপটার ঘুঁটেগুলি সরাইয়া তাহাকে থাকিতে দিয়াছে। কারণ, পশুপতি তাঁহার পিতৃবন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি। পশুপতির পাশের খোপে যাকে-তাকে শ্রীমন্ত থাকিতে দিতে পারে না।

রাতটা পশুপতি তাহার ঘরে ছোট একটি চৌকিতে শুইয়া কাটায়। দিনের বেলা ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়াটির একপ্রান্তে দু'পরল চটের উপর পুরু করিয়া বিছানো একটা কাঁথায় বসিয়া থাকে। পাশে একটা ওয়াড়হীন তেলচিটা বালিশ দেওয়া আছে। বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কাত হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করে।

গ্রীষ্মকালে এখানে থাকে ছায়া। ঘরের ডাইনে সূর্য উঠিয়া বাঁদিকে অস্ত যায়, শীতকালে ঘরের আড়াল হইতে সূর্য সামনে সরিয়া আসে। বড় ঘরের চাল ডিঙাইয়া, রান্নাঘরের পাশে ঝাঁকালো আমগাছটার মাথার ওপর দিয়া সমস্ত শীতকালটা পশুপতির বসিবার স্থানটিতে রোদ আসিয়া পড়ে।

মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়াও সমস্ত রাতে পশুপতি শীতে হি হি করিয়া কাঁপে, দেহে তাঁহার উত্তাপ এত কম যে শীতে হাড়ের ভিতরে পর্যন্ত যেন একটা জ্বালা কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। সকালে তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যে যায় তাহাকেই সে জিজ্ঞাসা করে রোদ উঠলো গা? হ্যাঁগো দাওয়াতে রোদ এল, আঁ?

কাঁপানো জড়ানো গলায় সে সকলের কাছে রোদের, উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের

সুসংবাদটি শুনিতে চায়। কেহ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলে 'এই উঠল,' কেহ নিজের বিপুলতর প্রয়োজন কিছু না বলিয়াই চলিয়া যায়, কেহ নির্বিকার চিত্তে শোনায় হতাশার বাণী। 'রোদ কি এত সকালে ওঠে? ঢের দেরি এখন দাওয়ায় রোদ আসতে।'

কুন্দ কোন্ সকালে উনান ধরাইয়া ডাল চাপাইয়াছে। সে একসময় আসিয়া বলে, 'কি হাড় কাঁপানো জাড় গো বাবা এবছর! ছেলেপুলে মোলো। একটু আগুন দেব গো দাদামশায়?'

আগে রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় উনান হইতে এক মালসা আগুন কুন্দ পশুপতির কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু একবার মালসার আগুনে তাহার বিছানায় লাগিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ার পর হইতে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে। আগুন পোহাইতে গিয়া বুড়ো কি শেষে পুড়িয়া মরিবে! সকালে চারিদিকে অনেক লোক, সে ভয় নাই।

পশুপতি সাগ্রহে বলে, 'দে দিদি, একটুকু আগুন দেত'।

কুন্দ মালসায় একটু আগুন করিয়া পশুপতির কাছে রাখিয়া যায়।

রোদ উঠিলে কুন্দ অথবা তাহার ছেলে কেশব পশুপতিকে ধরিয়া দাওয়ায় লইয়া যায়। কুন্দর দু'বছরের ছোট ছেলেটির মতো সেও যেন অবোধ অসহায় শিশু। বার্ধক্যের গোড়াতেই পিছু চলিতে আরম্ভ করিয়া এখন সে যেন আবার তাহার সেই আদিম অথর্ব শৈশবে গিয়া পেঁছিয়াছে।

পশুপতি দাওয়ায় বসিয়া থাকে নির্বাক নিস্পন্দ জড়পিণ্ডের মতো। তাহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, হৃদয়ের অনুভূতি নাই। ঠাণ্ডায় সে ভেতরে বাহিরে জমিয়া গিয়াছে। চোখ বুজিয়া সূর্যদেবতার অন্ত্যজ ভক্তের মতো সে শুধু সবিনয়ে ব্যাকুল আগ্রহে সূর্যকিরণকে সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

সে বাঁচিতেছে। রাত্রে সে একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বাঁচিতেছে। দেহে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চিত হইলে সে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া তাকায়।

প্রভাতে আপন আপন ক্ষুধা তৃষ্ণা হিংসা ও ভালবাসা লইয়া শ্রীমন্তের বৃহৎ পরিবারটি জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খেলা ও কর্তব্য পালন চলিবে। পৃথিবীর মাটিতে, গাছের ডালে, আকাশে সর্বত্র বিচিত্র চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু পশুপতির স্থান এই সজাগ উদ্বিগ্ন ব্যস্ততার বাহিরে, দাওয়ার এই কাঁথাটির উপর। তাহার স্তিমিত নিষ্প্রভ জগতে আবছা মানুষগুলি চলাফেরা করে, কেহ কাছে আসিলে মনে হয় কুয়াশার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। মাঝে মাঝে কারও চিৎকার করিয়া বলা কথার দু'এক টুকরা কথা তাহার কাছে ভাসিয়া আসে— বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসে। পৃথিবীর মানুষের জীবনে, পৃথিবীর আলো শব্দ ও গন্ধে পশুপতির দাবি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

না থাক। পশুপতির বিশেষ কোনো ক্ষোভ নাই। সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয়

করিয়া রাখিবার উৎসাহও তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস, কতকগুলি নিয়ম এখানে তাহাকে পালন করিয়া চলিতে হয়, সে তাহা অনেকটা যন্ত্রের মতোই করিয়া যায়—প্রায় বিগড়াইয়া আনা যন্ত্রের মতো। জীবনের অসংখ্য বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, জীবনের প্রতি মমতাও বুঝি তাহার গিয়াছে কমিয়া, মানুষের প্রতিও। আপনার বয়সের দুর্বিষহ ভারটা বহিয়া সে বুঝি ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষেরা তাহাকে যে আশ্রয় দিয়াছে সেই উপকারী মানুষটিও তাহার পরিবারের, দৈনন্দিন সুখদুঃখের প্রতি তাহার আসিয়াছে উদাসীনতা।

তবু, ওব মধ্যেই শরীর একটু ভালো থাকিলে সে একটু কৌতূহল বোধ করে, মনে মনে কি যেন ভাবে। ইশারায় শ্রীমন্তকে সে ডাকিয়া বলে, খেঁদির জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে? হোক, ভালো করে খোঁজ-খবর কর বাবা, মেয়ে বড় লক্ষ্মী।

গভীর দায়িত্ববোধের উপযোগী মুখভঙ্গি করিয়া পশুপতি জবাবের প্রতীক্ষা করে। শ্রীমন্তের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুল তাহারও প্রায় অর্ধেক সাদা হইয়া আসিল। সে অবাক হইয়া বলে, খেঁদির পাত্র? সাতবছরে পড়ল না মেয়ে এখনি পাত্র কিসের?

কথাটা সে দু'বার বলিলে পশুপতি শুনিতে পায়। তাহার মাথার মধ্যে কেমন একটা গোল বাধিয়া যায়। সায় দিয়া বলে, তা বটে, খেঁদি এখানো ছোট বটে খুব।

নিঝুম হইয়া একটু ভাবিয়া সে আবার বলে, খেঁদি নয় গো, বলছি মুখীর কথা। বলছি মুখীর কথা তুমি শুনেছ খেঁদি। মুখীর কি হল—পাত্তরের?

যেমন-তেমন একটা জবাব দিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে বুঝায়। পশুপতির চোখ মিটমিট করে। ক্ষণে ক্ষণে মাথা নাড়িয়া সে শ্রীমন্তের অর্ধেক শোনা অর্ধেক না-শোনা কথায় সায় দিয়া যায়।

মুখীর বিবাহের তাহার চিন্তা ও উদ্বেগের যেন সীমা নাই।

কিন্তু পশুপতির হৃদয়যন্ত্রটি একেবারে বিকল ও অসাড় হইয়া যায় নাই। কুন্দর জন্য মার বুকে মমতা আছে।

হয়তো এই মমতার মর্ম কথাটি এই যে কুন্দর সেবা তাহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা দোষের কথা নয়। মানুষের ধর্মই এই, সাতাশি বছর বয়সেও মানুষকে এই ধর্মই পালন করিতে হয়। সেবা হোক, মমতা হোক, তোষামোদ হোক, অর্থ হোক, দুপক্ষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই সংসারে এসবের আদান প্রদান চলে।

শোয়ার আগে কুন্দ যখন পশুপতির খবর লইতে আসে, রাত্রি তখন অনেক। চারিদিকে নিস্তব্ধ। পশুপতি এক একদিন ফিসফিস করিয়া বলে, দরজা বন্ধ কর দিদি।

কুন্দ দরজা বন্ধ করিলে পশুপতি আরো বেশি ফিসফিস করিয়া বলে, দেখ তো

আছে কি নেই ? কুন্দ হাতের ডিবরি নামাইয়া চৌকির তলে উঁকি দেয়। টিনেব ছোট তোরঙ্গ চৌকির কোনের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া এখনো বাঁধা আছে, কেহ লইয়া যায় নাই।

পশুপতি শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করে। কুন্দ সিধা হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলে, আছে দাদামশাই যাবে কোথা ? পশুপতি নিশ্চিন্ত হইযা বলে, তোকে দিয়ে যাব দিদি, তোর কেউ নেই তোকেই দিয়ে যাব।

এটা স্তোকবাক্য নয়, টিনের তোরঙ্গটি পশুপতি সত্যসত্যই তাহাকে দিয়া যাইবার কামনা পোষণ করে। কুন্দও যে লোভ না করে এমন নয়। কিন্তু বাক্সে কি আছে পশুপতি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। তাহার ভাসা ভাসা জবাবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাক্সে গহনা আছে, টাকা আছে, অনেক লোভনীয় দামী জিনিস আছে। কুন্দ এতটা বিশ্বাস করে না। কিছু টাকা আছে। দু-একশো। বাক্সটা কুন্দ একদিন সন্তর্পণে নাড়িয়াও দেখিয়াছে। ভিতরে ঝম ঝম শব্দ হয়।

কুন্দর ছোট ছেলেটিকে পশুপতি ভালোবাসে।

সকালে দাওয়ায় দু'টি মুড়ি ছড়াইয়া কুন্দ ছেলেটাকে তাহার কাছে বসাইয়া দিয়া যায়। খোকার দিকে তাকাইয়া ফোকলা মুখে পশুপতি একটু হাসে। দুটি শুষ্ক শীর্ণ হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলে, আ আ—মনি আ—সোনা আ—বেশ একটু সুর করিয়াই যেন বলে। দু-আঙুলে একটি মুড়ি খুঁটিয়া মুখে তুলিতে গিয়া তাহার কাঁচ দাঁত কটি চিক-মিক করিয়া খোকাও হাসে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিবার সামর্থ্য পশুপতির নাই। হাত বাড়াইয়া ওকে সে ছুঁইতে পারে, ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে, ওর গায়ে মাথায় বুলাইতে পারে হাত। আর কিছু পারে না

খোকা টলিতে টলিতে হাঁটিতে পারে। একদিন সে পশুপতির পায়ের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা জানিত মার মতো পশুপতিও খুশি হইবে এবং যে ভাবেই ঝাঁপ দিবে দু'হাতে তাহাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোকাকে সামলানো দূরে থাক, পশুপতি নিজেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দু'জনেই সেদিন কাঁদিয়াছিল—জীবনের দুই প্রান্তের দুটি শিশু। খোকার কান্না বাড়ির লোকে শুনিয়াছিল আর পশুপতির কান্না দেখিয়াছিল। দন্তহীন মুখখানি হাঁ করিয়া অবলা প্রাণীর মতো সে কাঁদিয়াছিল। সামান্য ব্যথাও সে আজকাল সহিতে পারে না। দেহের কোথাও তুচ্ছ একটি আঘাত লাগিলে বহুক্ষণ অবধি তাহার সর্বাঙ্গ বেদনায় কন কন করিতে থাকে।

অথচ আঘাত মাঝে মাঝে লাগেই।

কুন্দর অনেক কাজ। সব সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। লাঠিতে ভর দিয়া পশুপতিকে উঠিতে হয়। তিনদি পায়ের সাহায্যে কষ্টে সে নিচু দাওয়া হইতে নিচে নামে, আরো কষ্টে দাওয়ায় উঠে। চৌকাট ডিঙাইয়া ঘরে যায় এবং

বাহিরে আসে। পড়িয়া যাওয়ার মতো ভয়ানক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু প্রায়ই পায়ে চোট লাগে, লাঠিটা মাথায় ঠুকিয়া যায় : চৌকির কোণে হাঁটুর কাছে ঠোক্কর লাগে। কোনোরকমে শ্বাস রোধ করিয়া ঘরের শয্যায় অথবা দাওয়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়ে পশুপতি অনুশ্বাসীয় হাহা শব্দে কাতরতা প্রকাশ করে ; তাহার স্তিমিত চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পাড়ে।

একদিন কুন্দর বড়ছেলে কেশব তাহাকে প্রাণান্তকর আঘাত দিয়াছিল। খোকার মতো সেও একরকম পশুপতির গায়ের উপরে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইচ্ছা করিয়া নয়।

কেশব ষোল সতের বয়সের দুরন্ত শয়তান ছেলে। স্কুলে যায় না, লেখাপড়া করে না, একটু একটু শ্রীমন্তের মুহুরীর কাজ শেখে, ফাইফরমাশ খাটে, খায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে কুন্দ ও পশুপতির কাছে পয়সা আদায় করে।

যত সে শয়তান ছেলে হোক, প্রাণ যে তাহার প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গাছে ওঠে, কাঠ চেলায়, মারামারি করে, আর প্রবল নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো সর্বদা তাহার চেয়ে অসহায় মানুষ ও পশুকে নির্যাতন করার সুযোগ খোঁজে।

তাহার এই অধীর চঞ্চল প্রাণাবেগের কাছেই পশুপতি বোধহয় আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ছেলেটাকে সে ভালোবাসে, ভয় করে, পূজা করে, এবং ঘৃণা করে। সামনে সজনে গাছের ডালে কবে এক অজানা পাখি বাসা করিয়া ছিল, ডিম ফুটিয়া বড় হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তবু গাছে উঠিয়া কেশবের তাহা নিজের চোখে দেখা চাই। সজনে গাছের ডাল ভারি বিশ্বাসঘাতক। কত মোটা ডাল কত সহজে ভাঙিয়া যায়—ভিতরে শাঁস নাই। কেশব ঢিপ করিয়া পড়িয়াছিল পশুপতির সামনে। সে আতঙ্ক পশুপতি বাকি জীবনে ভুলিবে না। আর গাছ হইতে পড়িয়া কেশবকে সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া যাইতে দেখিবার বিস্ময়। কেশব ঘরে ঢোকে উঠান হইতে একলাফে দাওয়া ডিঙাইয়া এবং এক এক সময় অকারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ার একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বোঁ করিয়া এক পাক ঘুরিয়া যায়। এবং তারপরে আরো অকারণে ওই উঠানের প্রান্তে শ্রীমন্তের উদাসীন ছেলে মেয়ে বৌদের দিকে আড়চোখে চাহিতে থাকে।

কিন্তু তাহার বাহাদুরিটা সম্যক বুঝিতে পারে শুধু পশুপতি। হৃদয়ের যতটুকু উষ্ণতা তাহার আজও জীবনের কামনা করে তাই দিয়া কেশবকে সে বোধহয় হিংসা করে। তাই ভালোও বাসে। শিহরণ আজ পশুপতির দুর্লভ নয় কিন্তু ছেলেটার কাণ্ডে তাহার যে শিহরণ জাগে তাহা অভিনব, তাহা মৌলিক। তাহার ভীরু দুর্বল বুক আতঙ্কে ঢিপ ঢিপ করে ব্যাকুল হইয়া কেশবকে মুখে এসব কাণ্ড করিতে বারণ করে। কিন্তু দু'চোখ প্রাণপণে কুঁচকাইয়া এই চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখিতেও ছাড়ে না।

শেষে বলে, শোন্ কাছে আয় দিকি ! আয় না দাদা, আয়, ! ওরে আয় না !

কেশবকে কাছে আনিয়া সে কি করিবে কি ? কিছু না। শুধু বসাইয়া রাখিবে। নিজে তো দিবারাত্রি বসিয়াই আছে, এই উত্তাল প্রাণ-শক্তিকেও সে একটু কাছে বসাইয়া রাখিবে। হয়তো প্রাণপণে দেখিবে ও দুই হাতে স্পর্শ করিবে। কিন্তু সেটা বাহুল্য। জীবনের এই অসংযমকে নিজের কাছে সংযত করিয়া রাখাই তাহার আসল কামনা।

একদিন দুরন্তপনার মধ্যে অতবড় ছেলে পশুপতির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তেমন ভাবে পড়িলে পশুপতি বাঁচিত কিনা সন্দেহ, মাটিতে প্রথমে একটা হাত ফেলিয়া কেশব নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল; তবু তাহার হাঁটুর আঘাতে পশুপতির বাঁকা কোমর যেন ভাঙিয়া গেল। দু'দিন তাহার উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

কেশব প্রায়ই নানা কারণে শাস্তি পায়। সেদিন তাহার শাস্তিটাও হইল ভীষণ। শ্রীমন্তের হাতের শেষ থাপ্পড়টাতে সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

এবং শুধু কেশবের উপর নয়, কুন্দকেও অনেক কথার মার সহ্য করিতে হইল। ছেলেকে যদি সে শাসন না করে এ বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না, এমন আশঙ্কা-জনক কথাটাও যেন শোনা গেল।

কোমরের ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও ওর মধ্যেই পশুপতির কি রকম একটি ব্যথিত আনন্দ হইয়াছিল। বাড়িতে যে হৈ-চৈ বাধিয়াছিল, দু'তিন জনে তাকে যে পাখা করিয়াছিল, কেশব যে চেঁচাইয়া কাঁদিয়াছিল। এসব দিয়া যেন এই সত্যটাই যাচাই হইয়া গিয়াছে যে জগতে আজও তাহার মূল্য আছে। তাহাকে দুবার 'আহা' শুনাইয়া কেশবকে একটু বকিয়া এ ব্যাপার তো সকলে শেষ করিয়া দিতে পারিত। তার বদলে একেবারে সমারোহ বাধিয়া গিয়াছিল।

কয়েক বছর ধরিয়া পশুপতির মনে একটা কষ্ট ছিল। তার মনে হইত, এতকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া বুঝি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মরণকে এভাবে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষের কাছে সে বুঝি অপরাধ করিতেছে। কবে সে মরিবে তারই প্রতীক্ষায় কারো আর ধৈর্য নাই; ব্যাপারটা চুকিয়া গেলে সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ছেলের বর্মা পালানোর আগে বৃদ্ধ বয়সে যে পরিমাণ আরাম ও সুখ পশুপতি কল্পনা করিত তাহার কিছুই সে পায় নাই। চারিদিক হইতে আসিয়াছে শুধু অবহেলা, অনাদর। সকলে তাকে যেন ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। দিনের পর দিন যত সে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে তাহার প্রয়োজন হইয়াছে যত বেশি, মানুষ তাহার তত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের সুখদুঃখে পশুপতি আর ভাগ বসাইবার কামনা রাখে না জীবনের সমারোহে তাহার বরং বিতৃষ্ণাই আসিয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে রাগ করিবে, তাহার অপরিহার্য সেবা ও যত্ন সে পাইবে না, জীবনের শেষ দিনগুলি কষ্ট ও অসুবিধায় থাকিবে এটা সহ্য করা একটু কঠিন। ছ'মাসের জন্য কেহ

বিদেশ যাওয়ার আয়োজন করিলে মানুষের কাছে হঠাৎ তাহার নাম বাড়িয়া যায়। সে চিরকালের জন্য বিদেশের চেয়েও সুন্দর বিদেশে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, অথচ মানুষের কাছে তাহার দাম গেল কমিয়া।

কোমরে ঘা খাইয়া সকলকে ব্যস্ত করিতে পারিয়া পশুপতির এই দুঃখটা কমিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মৃত্যুর সঙ্গে তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে মানুষ অবহেলা করে নাই, মর্যাদা দিয়াছে। জগতে সে নিরাশ্রয়, তাহার ছেলে থাকিয়াও নাই। তাহার দেহ পঙ্গু, মন কুয়াশায় আধ অন্ধকার। তবু পথে পথে তাহাকে যে আজ ভিক্ষা করিতে হয় না। একটি ঘেরা আশ্রয় ও দু'টি অন্ন যে তাহার জুটিতেছে, সে শুধু তাহার বয়সের জন্যে। মরিতে তাহার বেশিদিন বাকি নাই বলিয়া। বেশি কিছু হয়তো মানুষ দেয় নাই, কিন্তু যতদিন সে না মরে ততদিন তাহার বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছে সকলেই।

এই জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া আসিয়াছে বলিয়াই পরের বাড়ি থাকিয়া পরান্ন ভোজনে লজ্জা নাই।

সেদিনের ব্যাপার পশুপতিকে এই সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তাহার পর হইতে কুন্দ ও কেশব একটু বদলাইয়া গিয়াছে। কুন্দ করিয়াছে রাগ আর কেশব পাইয়াছে ভয়।

কুন্দ মুখে কিছু বলে নাই, রাগ নাই, রাগ দেখাইয়াছে কাজে। তাহার কাছে যে পরিমাণ সেবা পশুপতি না চাহিয়াই পাইত এখন আর সেরকম পায় না। পশুপতির টিনের তোরঙ্গটি চৌকির পায়ার সঙ্গে আজও বাঁধা আছে। তাছাড়া বুড়ো অসহায় মানুষকে একেবারে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কুন্দর ছিল না। সে সাহসও ছিল না। সাহস না থাকার কারণ এই, পশুপতিকে শ্রীমন্ত ও তাহার পরিবার যতই ভুলিয়া থাক কুন্দ যে তাহার সেবা করে এটা তাহারা জানিত এবং এই ব্যবস্থাই সকলে মানিয়া লইয়াছিল। রান্না করার মতো এও কুন্দর একটা কর্তব্য।

তবে ইচ্ছা করিলে আইন বাঁচাইয়া রাজার আইনও ভাঙা যায়। কুন্দও তেমনিভাবে নিজেকে বাঁচাইয়া পশুপতিকে মারিতেছিল। শেষের দিকে শীত আরো তীক্ষ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধটিকে এক মালসা আগুন দেওয়ার সময় কুন্দ করিয়া উঠিতে পারে না। কোনোদিন রোদ উঠিয়া পড়িলেও পশুপতিকে সেখানে পৌছাইয়া দিতে না আসে কুন্দ না আসে কেশব, সারারাত শীতে জমিয়া গিয়া নিজে নিজে বাহিরে যাওয়ার শক্তিও পশুপতি তখন খুঁজিয়া পায় না। কোনোদিন দেখা যায় তার ছেঁড়া কাঁথা রাত্রে কেহ তুলিয়া রাখে নাই, বাড়ির লোম-ওঠা বুড়া কুকুরটা তার উপরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পশুপতির ভিজানো সাগু মাঝে মাঝে থাকিয়া যায়, তার মাছের ঝোলে মসলা বেশি হয়, তার বলক-তোলা বরাদ্দ দুধটুকু অর্ধেকের বেশি সে পায় না। রাত্রে সরাসরি কুন্দ নিজের ঘরে গিয়া দরজা দেয়।

পশুপতি মাকের বেড়া ভেদ করিয়া ডাকে, ও কুন্দ ? ও দিদি, শুলি নাকি ? শোন দিদি একবার।

কুন্দ ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব হাঁকিয়া বলে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশুপতি খানিক চুপ করিয়া থাকে। তারপর আবার বলে, এই তো শুলো। একবারটি ডাক না কেশব ? ডাক দাদা, ডাক তোর মাকে।

কুন্দ আবার ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব বলে, মার জ্বর গো দাদামশায়, ডাকতে মানা ক'রে শুয়েছে।

পশুপতি তারপর চুপ করিয়া যায়। বড় শীতল পৃথিবী, বড় প্রাণহীন। হয়তো আজ রাত্রে সেও হয়তো শীতল হইয়া যাবে। এমন তো কত লোকে যায়, বিছানায় শুইয়া শীতার্ত আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় পশুপতির ছেলে বর্মা পালাইয়াছে, সাতান্ন বছর বয়সের সময় মরিয়াছে তার বৌ, আজ ত্রিশবছর ধরিয়া এমন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পশুপতি আরো নিঃসঙ্গ আরো গাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

ওঘরে ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিলে কোন্ জাগ্রত মাতার আদরে হঠাৎ তাহার কান্না থামিয়া যায় পশুপতির বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু কুন্দকে আর সে ডাকে না। বরফের মতো শীতল নির্বোধ পা দু'টি হইতে দেহের দিকে জমজমাট মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রগমনে বাধা পড়ায় কষ্টে লেপ কাঁথা সরাইয়া লাঠি খুঁজিয়া যে চৌকির নিচে নামে। উবু হইয়া বসিয়া লাঠিটা পাঠাইয়া দেয় চৌকির তলে সেইখানে, যেখানে তার টিনের তোরঙ্গটি আছে। লাঠি দিয়া নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া তোরঙ্গটির অস্তিত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চৌকিতে ওঠে।

তখন ঈশ্বরকে পশুপতির মনে পড়ে। পৃথিবীর আর কারো ঈশ্বরের সঙ্গে পশুপতির ঈশ্বরের মিল নাই। অনাদি অনন্ত কোনো কিছুকে মনে আনিবার চেষ্টা করিলে মাথা বোধহয় ফাটিয়া যাইবে, সাধারণ মানুষ সীমাহীনকে যে অনুভূতি দিয়া যতটুকু উপলব্ধি করে ততটুকু জোরালো অনুভূতিও পশুপতির নাই। তাহার ভাবিবার শক্তি ক্ষীণ, অনুভূতি দুর্বল। তাহার ঈশ্বর একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে খানিকটা আলো মাত্র।

যে আলোকে একদিন সে দু'চোখ দিয়া পৃথিবীকে ঢের বেশি উজ্জ্বল, ঢের বেশি ব্যাপক ভাবে দেখিতে পাইত। পশুপতির ঈশ্বর আলোর একটু স্মৃতি মাত্র।

কিন্তু তাহা দিয়াই যে তাহার চিরন্তন ভবিষ্যের স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারে। স্বর্গের কামনাও তাহার এতখানি নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

এ শীতটাও কোনোরকমে কাটিয়া যায়। বসন্তের আবির্ভাবে পশুপতির দেহে মনে জীবনের ক্ষীণতম জোয়ারটিও আসে না বটে, কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ক্ষীণ জীবনীটুকুর অপচয় বন্ধ হইয়া যায়। কুন্দর অবহেলা সহিতে না পারিয়া তাহাকে

শীতের শেষে পশুপতি কয়েকটা টাকা দিয়াছে। কেশবও গোপনে একটি টাকা আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। কুন্দর রাগ অবশ্য এমনিই কমিয়া আসিতেছিল, টাকাটা হাতে পাওয়ায় তাড়াতাড়ি কমিয়া গিয়াছে। পশুপতি ডাকিলে এখন সে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। পশুপতির সাগু নরম হয়, মাছের ঝোলে মসলা কম থাকে, দুধ কমে না। কেশব দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া পাক খায়, তার কাছে বসে, দু'টো একটা কাজও করিয়া দেয়।

শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বিবাহের দিন বিকালবেলা কেশবকে দিয়া টিনের তোরঙ্গটিব দড়ির বাঁধন খোলাইয়া সেটি পশু-পতি চৌকির তলা হইতে বাহিরে আনায়। কেশবকে ঘরের বাহিব করিয়া দিযা দরজা বন্ধ করে।

বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিযা কেশব কিন্তু ভিতরের ব্যাপারে সব দেখিতে পায়। একটা রিপু করা ফর্সা শার্ট ও একটি কুচনো পাতলা কাপড় বাহির করিয়া পশুপতি তোরঙ্গ বন্ধ করে এবং দরজা খোলে।

কেশবকে ডাকিয়া বলে, যেমন ছিল তেমনি আবার পায়ার সাথে বাঁধ দি'নি দাদা, বুঝি কেমন বাহাদুর।

তোরঙ্গটি বাঁধিয়া চৌকির তলা হইতে বাহির হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করে, জামা-কাপড় কি হবে দাদা মহাশয় ?

পশুপতি ফোকলা হাসি হাসে।

দেখিস কি হয়। দেখিস।

সন্ধ্যার সময় জামা-কাপড় পরিয়া সে বাবু সাজে। আটবছবেব পুরনো চটি জোড়াটি কিন্তু তার চেয়েও নানা দিকে এত বেশি বাঁকিয়া দুমড়াইয়া গিয়াছে যে কোনোমতেই পায়ে দেওয়া যায় না। না যাক্। এই বয়সে এত বেশি বাবু পশুপতির না সাজিলেও চলিবে।

ঘরের বাহিরে গিয়া কেশবকে দিয়া দরজায় সে পিতলের তালাটি লাগায় এবং কেশবকে নির্ভর করিয়া হাজির হয় একেবারে বিবাহের আসরে। সকলের মাঝখানে বসিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস পায় না। একদিকে বেড়া ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

বিবাহ-বাড়ির আলোয় পশুপতির নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আজ একটু আলো হইয়াছে। এতগুলি মানুষের দেহের উত্তাপ সে যেন অল্প অল্প অনুভব করিতে পারিতেছে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আজ পশুপতির একটু সজাগ মনে হয়। জীবনের ঘোলাটে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিও যেন খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গে পশুপতির আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার ডাইনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে শুধু তামাক টানিতেছেন তাহার বুকে খোঁচা দিয়া সবিনয়ে

জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যায় : মহাশয়ের নাম ?

তারপর একটু হাসিয়া : আমার নাম আজ্ঞে, পশুপতি ঘোষ দস্তিদার। এখানেই ইস্কুলে মাস্টারি করি, ভর্নাকুলার মাস্টার আজ্ঞে আমি। মেয়ের বাপ আমার বন্ধুপুত্রও বটে ছাত্রও বটে—বড় মানে আমাকে, বড় খাতির করে।

বসিয়া বসিয়া পশুপতি ঝিমায়। তার চোখ ঢুলিয়া ঢুলিয়া আসে। একসঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে থাকিবার সাধ্য তাহার নাই বলিয়া, যখন সে অতীতের কথা ভাবে তখন এই বিবাহ-সভা তাহার কাছে মুছিয়া যায়, চারিদিকে আলো ও গণ্ডগোলে সে যখন এখানে ফিরিয়া আসে তখন অতীতকে তাহার মনে থাকে না। তাই চোখে পূর্ণ দৃষ্টি, দুকানে তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি ও মুখে সুস্পষ্ট ভাষা লইয়া একদিন এমনি সভায় সে যে অভিনয় করিত তার এতটুকু নকলও করিতে পারে না।

তারপর একসময় সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেহ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকায়, কেহ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে।

যতি

বৈশাখের সপ্তমী তিথিতেই এ বাড়িতে আজ বিজয়া আসিয়াছে।
চারিদিকে বিচ্ছেদ-বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইয়াছে কারণটা সম্ভবত এই যে সকলেই অল্পাধিক শান্ত।
অথচ উৎসবের জের এখনো মেটে নাই।
বাড়ি এখনো আত্মীয়-স্বজনে ভরিয়া আছে, ছেলেমেয়েদের কলরব কালকের চেয়ে আজ কোনো অংশেই কম নয়। অকেজো লোকের অকারণ চলাফেরা, কাজের লোকের অসহিষ্ণু ব্যস্ততা, খাওয়া, খাওয়ানো, মাছ কোটা, তরকারি কোটা, হলুদ বাটা ও রান্নার সমারোহ সবই পুরোদমে চলিতেছে। উঠানের কোণে নিম আর আম গাছের মেশানো ছায়ায় পাতা চৌকিতে বয়স্ক প্রতিবেশীদের হুঁকা টানার বিরাম নাই। তা, ইহা স্বভাবিক বই কি। এতগুলি মানুষের মধ্যে ধরিতে গেলে কয়েকজনেরই বা বুকের ভিতরটা আজ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, চোখের আড়ালে অশ্রু জমিয়াছে? দৈনন্দিন জীবনটা নিরুৎসব সকলেরই, সে জীবন পিছনে ফেলিয়া উৎসবের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে যাহারা, দাবি তাহাদের আনন্দ আর বৈচিত্র্য, বরকনে বিদায় ব্যাপারটা তাহাদের কাছে বিদায়-উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নয়, মা, ও মেয়ের কান্নাকাটি তাহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র।
তবু বেশ বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত বাড়িটাই কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে; আজ সবই, কেমন যেন বেমানান হইয়া আছে।
খানিক আগে কুড়াইয়া পাওয়া মালকোষকে ঠিকমত আয়ত্ত করিতে না পারিয়া শানাই এখন এই বেলা এগারোটার সময়, সহসা পুরবী ধরিয়া ফেলিয়াছে; অনাবশ্যক দীর্ঘ টানগুলির মধ্যে পুরবীর কিছু কম থাকিলেও বিলাপ আছে প্রচুর। সদর দরজার দুইপাশে কলাগাছ দু' পাতা এলাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, একটি মঙ্গল কলসের আম্রপল্লব কাল বোধহয় ছাগলই অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন পর্যন্ত তাহা বদলাইয়া দেওয়া হয় নাই। আর হইবেও না। আর আধঘণ্টা পরে বাড়ির দুয়ারে মঙ্গল কলসেরই বা কি প্রয়োজন তাহাতে অক্ষত আম্রপল্লব না থাকিলেই বা কি আসিয়া যাইবে!
ক্ষেন্তিই বিশেষ বন্ধু। ছেলে কোলে সকাল হইতে সে ইন্দুর কাছে থাকিয়াছে, নানা গল্প করিয়াছে, আশ্বাস, উপদেশ, সান্ত্বনা, নিজের প্রথম স্বামীগৃহে

যাওয়ার বিশদ বর্ণনা, বলিতে কিছুই বাকি রাখে নাই। তবু যেন কথা ফুরাইতেছিল না।
না ফুরাইবার কথা।
নেপথ্যে ভবিষ্যতের ব্যথা জমিয়াছে। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে?
এক সময় দু'জনে বাপের বাড়ি আসিতে পারে তবেই তো। ক্ষেন্তির ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর দিন তিনেক, তারপর বছর খানেকের মতো নিশ্চিন্ত।
নিজের কথায় সূত্র ধরিয়া ক্ষেন্তি বলিয়া চলিল—
'নিজেকে দু'ভাগ করে ফেলতে হবে ভাই, একভাগ শাশুড়ি ননদ দেওর এদের জন্য, আর একভাগ বরের জন্য। যদি দেখিস শাশুড়ি ননদ একটু বেশি বেশি শত্তুর ভাবছে,প্রথম প্রথম বরের ভাগটা ছোট ক'রে ওদের ভাগটা বড় ক'রে ফেলবি। তোর বরকে ভালোই মনে হল, অল্পেই তুষ্ট থাকবে।'
ইন্দু সলজ্জে একটু হাসিল। ভালো, না ছাই! কী লজ্জাতেই ফেলিয়াছিল কাল? আড়িপাতার ব্যাপার জানে না কোন্ দেশের মানুষ ও?
ক্ষেন্তি বলিল, 'হাসিস্ কি লো? ও-বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্যন্ত যখন মন যুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি। এবার অবশ্য তেমন ভাবনা নেই, যে ক'টা দিন থাকিস বয়েস আর রূপের সমালোচনা শুনে আর যা যা করতে বলে ক'রে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবি। ঠ্যালা বুঝবি পরের বার। কেউ আপন করবার চেষ্টাটুকুও করবে না—এক বর ছাড়া, তা বরও যে খুব বেশি চেষ্টা করবে মনেও করিস্ না—নিজে নিজে তোকে সকলের আপন হতে হবে। বাব্বা, সে এক তপস্যা। লোক যদি ওরা মোটামুটি ভালো হয় তা হলে বছর খানেকের তপস্যাতেই একরকম ঠিক হয়ে আসে, পান থেকে খসা চুনটুকু নিয়ে আর কেলেঙ্কারি কাণ্ড বেধে যায় না, গরম মেজাজী কেউ থাকলেই চিত্তির। একটা ঝ্যাকড়া যদি বাধে, আর কি, রইল তা চিরস্থায়ী হয়ে, দোষ সে তোমারই হোক আর যারই হোক! আমার মেজ ননদ? কি রাগ বাবা, তাওয়ার মতো তেতেই আছে। আমাকে গাল না দিয়ে আজও কী সে জল খায়?' খায় না। শাশুড়ি মাগী লোক মন্দ নয় তাই রক্ষা, নইলে গিয়াছিলাম আর কি। মেজ ননদের সঙ্গে কবে কি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া খুঁটিনাটি বাধিয়াছিল, ক্ষেন্তি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাখিল করিল; শেষে বলিল, 'তা শোন, পরের বার যখন যাবি একটা কথা মনে রাখিস যে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যত মুখবুজে খাটবি সবাই তত ভাল বলবে, আর রাত জেগে বরের সঙ্গে যত গুজগাজ্ ফিস্ফাস করতে পারবি বর তত খুশি থাকবে।' বলিয়া ক্ষেন্তি হাসিল।
ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, 'শেষেরটাতেই ভয় ভাই। যে ঘুমকাতুরে আমি জানিস তো।'
'ঘুম আর চোখে থাকবে না লো, থাকবে না, বরঞ্চ মনে হবে, পোড়া বিধাতার কি

বিবেচনা মরে যাই, এত ছোট করছে রাত, তার উপর আবার ঘুমের ব্যবস্থা !'

ঘটনার ঘটনায় ইন্দুর মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, সখীর পরিহাসে সে অল্প একটু হাসিল বটে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করিল আরও কম। হরেন (ইন্দুর বরের নাম ; মানুষটার চেয়ে নামটির সঙ্গে ইন্দুর পরিচয় বেশি দিনের ; নাম ও নামীকে সে এখনও একত্রে জড়াইয়া ভাবে) অনেকক্ষণ খাইতে বসিয়াছে, নতুন জামাইয়ের খাইতে সময় লাগে কিন্তু সে আর কতক্ষণ, হরেনের খাওয়া হইলেই যাত্রা।

অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে সেই তালশিমুলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা, সেখানে যাইতে হইলে তের মাইল পাল্কিতে গিয়া স্টিমার ধরিতে হয় ; রাত দশটায় সে স্টিমার কোন্‌ স্টিমার-ঘাটে নামাইয়া দেয় কে জানে, তারপর রাত বারোটা অবধি পাড়ি জমাইতে হয় নৌকায়। মালপাড়ি হইতে তালশিমুলী অনেকদূর—এতই দূরে যে ব্যবধানটা ইন্দুর মনে দিকহীন রাইঘোষাণীর মাঠের মতো ধু ধু করিতে থাকে—বৈশাখের খররৌদ্রে যে মাঠের তৃণগুলি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, এখন যাহার দিকে তাকাইলে আগুনের হল্‌কায় দু'চোখ টন টন করিবে।

রাইঘোষাণীর মাঠ ঘেঁষিয়া স্টিমার-ঘাটের পথটা অনেক দূর অবধি সিধা চলিয়া গিয়াছে, তারপর ডাইনে বাঁকিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে সাতগাঁয়ে। ওই গ্রামে স্বরূপ চক্রবর্তীর বাড়ি। স্বরূপ চক্রবর্তীর ছেলের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ হইতেছিল, কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে। ওখানে বিবাহ হইলে এক দিক দিয়া ভালোই হইত ইন্দুর। যখন তখন সে বাপের বাড়ি আসিতে পারিত, সোমবারে বিষ্যুদ্‌বারে বাবা আর দাদা মালসিপুকুরের হাটে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে পারিত, স্বরূপ চক্রবর্তীর বাড়ির পিছনের ধানক্ষেতটা পার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে তালপাতার গাছপালা তাহার চোখে পড়িত ; সবচেয়ে উঁচু তাল গাছটার নিচেই তাহাদের এই বাড়ি। ছেলে কালো তো কি হইয়াছে ? বরের রঙ ধুইয়া কি সে জল খাইত ?

তা ছাড়া, স্বরূপ চক্রবর্তী আর তাহার ছেলে দুজনেই তাকে বউ করিবার জন্য কি রকম ব্যগ্র হইয়াছিল ? চক্রবর্তী-গিন্নিকেও সে দেখিয়াছে, ভারি শান্ত অমায়িক মানুষ। ওখানে বিবাহ হইলে শ্বশুরবাড়ির আদর জুটিবে কি অনাদর জুটিবে, এই নিয়া ইন্দুকে আর এমন দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহাকে বউ পাইলে উঁহারা বর্তিয়া যাইত।

তবে কিশোর মহাদেবের মতো এমন বরটি তাহার জুটিত না, এই যা আপসোসের কথা।

মার অবসর কম, খুব ভোরে আধঘণ্টাখানেক মেয়েকে বুঝাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তারপর মাঝে মাঝে নানা ছলে মেয়ের ম্লান মুখখানি দেখিয়া যাওয়ার বেশি সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন আর তিনি থাকিতে

পারিলেন না। নূতন জামাইকে আদর করিয়া খাওয়াইবার লোক আবশ্যকের অতিরিক্তই ছিল, তথাপি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'যা তো ক্ষেন্তি, জামায়ের খাওয়াটা একটু দেখ তো গিয়ে।'

'সে কি মাসীমা? জামাই একা খাচ্ছে না কি?' ছেলেকে কাঁখে তুলিয়া ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মা বলিলেন, 'পাতের কাছে বস্‌লি আর উঠে এলি, কিছুই তো খেলি না ইন্দু? একটু দুধ এনে দি' চুমুক দিয়ে খেয়ে ফ্যাল্ মা, খিদেয় নইলে যে সারা হয়ে যাবি?'

মার গলার স্বর এমন করুণ শোনাইল যে দুধ খাইতে ইন্দু একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না, বলিল, 'এখন না মা, পরে খাব'খন।

'পরে আর কখন খাবি মা; পর কি আর আছে? জামায়ের খাওয়া হলে সবাই তোকে আবার ছেঁকে ধরবে, তখন কি আর খেতে পারবি? এখুনি খেয়ে নে?'

'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা।'

মার চোখ সজল হইয়া উঠিল।—'তা কি আমি বুঝি না মা, তবু খেতে হবে। রাস্তায় তুই খিদেয় কষ্ট পাচ্ছিস্ ভেবে আমি এখানে কি করে থাক্‌ব বল দেখি? একটু দুধ তুই খা ইন্দু, লক্ষ্মী মা আমার।'

একটু মানে এক বাটি এবং বাটিটাও নেহাৎ ছোট নয়। দুধের পরিমাণ দেখিয়া ইন্দু ভয় পাইল। মার মুখ চাহিয়া সবখানি দুধ কোনমতে যে গেলা যায় না এমন নয়, কিন্তু রাস্তায় বমি হওয়ার আশংকা আছে। তবু খাইতে হইল তাহাকে সবটাই। সে যেন অবাধ্য শিশু এমনিভাবে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তোষামোদ করিয়া বকিয়া মা তাহাকে সবটুকু দুধ খাওয়াইলেন, ভিজা হাত মুখে বুলাইয়া নিজের আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিলেন, চুপিচুপি বলিলেন, 'এক কাজ করবি ইন্দু? খানিকটা সন্দেশ দলা করে কলাপাতায় মুড়ে দিচ্ছি, সঙ্গে নিবি? রাস্তায় যদি খিদে পায়—'

মাগো, মেয়েকে যে তিনি এত ভালবাসেন আগে তাহা কে জানিত। দুদিন আগেও ইহাকে কারণে অকারণে কত মুখঝাম্‌টা দিয়েছেন, কত লাঞ্ছনা করিয়াছেন। সে সব কথা ভাবিলেও আজ চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়। দেখিতে দেখিতে মেয়ের দেহ দীঘল হইয়া উঠিল, দুধ না, ভালো মাছটুকু না; তবু যেন কলাগাছের মতো হু হু করিয়া বাড়িয়া চলে, অথচ বর জোটে না। মেয়ের দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা হিম হইয়া যাইত। এক বছর ধরিয়া পেটের মেয়ে যেন শত্রুরও বাড়া ছিল। এমন রাজরানীর মতো আজ ইহাকে মানাইয়াছে, এমন গড়ন, এমন মাজা রঙ্, এমন লাবণ্য—কিছুই কি তখন চোখে পড়িত ছাই! মনে হইত, এমন কুরূপা মেয়ে ভূ-ভারতে আর জন্মায় নাই।

চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া মা ইন্দুর লজ্জিত মুখখানি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া

দেখিয়া ভাবিলেন, বড় অন্যায় হইয়াছিল, বিনা দোষে মুখ বুজিয়া কত দুঃখই এ মেয়ে তাঁহার সহিয়াছে। বিন্দুর বেলা সাবধান থাকিবেন, আর অমন করিয়া যখন তখন বকিবেন না, যা তা খোঁটা দিবেন না।

আশ্চর্য এই, মেয়ে যে প্রায় আধাআধি সর্বনাশ করিয়া চলিল এ কথা মার মনেও পড়িল না। তেরো বিঘা ধানের জমি একেবারেই গিয়াছে, স্বামী-পুত্র লইয়া মাথা গুঁজিবার এই ঠাঁইটুকু এগারোশো টাকায় বাঁধা পড়িয়াছে। কত মাস কত বছর ধরিয়া স্বামীর অল্প আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া এ বাড়ি মুক্ত হইবে কে জানে। কেমন করিয়া সংসার চলিবে, পাঁচ ছয় বছর পরেই বিন্দুর বিবাহ দিতে হইবে, তখন কি উপায় হইবে এসব ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যাওয়ার কথা, মা কিন্তু এখন ও-সব কিছুই ভাবিতে ছিলেন না। ভাবিবার সময় অনেক জুটিবে, মেয়ে যে আজ তাঁহার মহা সমারোহে পর হইয়া যাইতেছে।

ইন্দু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল।

'হ্যাঁ মা, খোকার ঘুম ভাঙে নি?'

'জানিনে। ওর দিকে তাকাবারও সময় পেয়েছি কি সকাল থেকে? সময় মতো ওষুধও আজ বোধহয় খাওয়ানো হয় নি।'

ইন্দু বলিল, 'আমি খাইয়াছি ওষুদ। বিকালে ডাক্তারবাবুকে একবার আনিও মা। দেখে আসি খোকাকে একবার—'

ওদিকের ছোট ঘরটিতে পাঁচ ছয় বছরের একটি ছেলে শুইয়াছিল, সাত আটদিন ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া ছেলেটি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাত মাইল দূরের গ্রাম হইতে ডাক্তারকে বার দুই আনা হইয়াছিল, জ্বরটা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু দুই চারদিনের মধ্যে কমিয়া যাইবে বলিয়া খুব জোরালো আশ্বাস ও ঝাঁঝালো ওষুধ দিয়াছেন। খোকা জাগিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, সে সন্দেশ খাইবে।

মা বুঝাইয়া বলিলেন, 'আজ দিদি চলে যাবে, আজকেই তুই সন্দেশ খাবি, খোকা? দিদিকে তুই ভালো বাসিসনে বুঝি? তুই কাঁদিস্ তো ইন্দু—খুব কাঁদিস্ পাল্কিতে উঠে।'

খোকা সভয়ে কান্না থামাইয়া বলিল, 'আমি দিদির সঙ্গে যাবো।'

'যাস্। আগে তবে বার্লি না খেলে দিদি সঙ্গে নেবে না।—নিবি ইন্দু?'

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিল, 'না।'

মা বার্লি আনিতে গেলেন।

এ ঘরখানা খুবই ছোট, পুরোনো চাঁচের বেড়া, বিবর্ণ টিনের চাল। এক-কোণে এক বোঝা পাকাটি ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল, কখন কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, বাঁশের তৈরি চৌকির তলে সারি সারি গুড়ের হাঁড়ি সাজানো। দরজার বাহিরেই বাড়ির কিষাণ গরুর জন্য বিচালি কাটে, ঘরের মধ্যে খড়ের টুকরো আসিয়া পড়িয়াছে।

এ ঘরেই খোকা জন্মিয়াছিল। ইন্দুর সহসা সে কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার আকস্মিক ও অপরিমিত আশংকার মধ্যে যুক্তির সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিল। মনে হইল, বিবাহের গোলমালে রোগা ছেলেটাকে যে এ ঘরে সরাইয়া আনা হইয়াছে তাহাতে বোধহয় নিয়তির হাত ছিল, ফলটা হয়ত ইহার শুভ হইবে না।

মনে মনে ইন্দু ভয় পাইল। কয়েক সেকেন্ডের কল্পনায় সে যেন ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছে। কুলুঙ্গিতে তিন চারিটা ওষুধের শিশি, চোখ তুলিয়া ইন্দু সেগুলি ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল, উপরের তাকে খোকার ময়লা রবারের বলটা কে যেন তুলিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের ঠিক উপরেই খোকার ছেলেখেলা!

'তোর বলটা তাকে কে তুলে রাখলে রে খোকা?'

'গদাইদা রেখেছে।' খেলিতে খেলিতে খোকার হাত যখন ব্যথা হইয়া গেল, গদাইদা তখন বলটা তুলিয়া রাখিল।—'শুয়ে শুয়ে বল খেলা বিচ্ছিরি, না দিদি?'

হ্যাঁ। আচ্ছা খোকা, বল খেলতে তুই ভালোবাসিস?'

বল খেলিতে ভালোবাসে না! বাসেই তো!

'দাঁড়া তবে, আসবার সময় পোড়াবাড়ি ঘাটের সেই মনোহারি দোকান থেকে তোর জন্যে দুটো বল কিনে আনব, তেমন বল তুই কখনো দেখিস নি খোকা, তোর এটা তো ছোট, সেগুলি এর ঠিক দুনো হবে—দেখিস। আর শাদা যেন ধপ্-ধপ্ করছে। ভালো হয়ে একসঙ্গে তিনটি বল নিয়ে মজা ক'রে খেল্‌বি, কেমন?'

একটু উৎসুক উদগ্রীব সুরেই ইন্দু কথাগুলি বলিল, বলের বর্ণনা শুনিয়া খোকার লুব্ধতা চরমে উঠিয়া যাইবে এ রকম একটা আশা যেন তাহার আছে। তাহার ফিরিয়া আসা অবধি বলের লোভে খোকা অশুভকে ঠেকাইয়া রাখিবে এমন যুক্তিহীন কথাও ইন্দু আজ এই একান্ত অসময়ে সম্ভব মনে না করিয়া পারিল না।

ঘরের পিছনেই ছিটাল, গোটা দুই কন্টকাকীর্ণ বাবলা গাছের গোড়া হইতে ডোবার পাড়টা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ডোবায় এখন জল নাই, শুধু আগাছা আর কাদার একটু তলানি। একটা চাপা বাষ্পীয় দুর্গন্ধ ওখান হইতে উঠিয়া আসিতেছিল, কি যেন পচিয়া গিয়াছিল এখন রোদের তেজে শুকাইয়া উঠিতেছে। ইন্দুর মনে পড়িল বছর তিনেক আগে মার যখন কঠিন অসুখ হইয়াছিল তখন খোকাকে কাছে লইয়া শুইয়া প্রথম কয়েক রাত্রি যে গন্ধে তাহার ঘুম আসে নাই, এই দুর্গন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ। আজ দুপুরে সেই ক'টি রাতদুপুরে নিরুপায় ক্রোধ ও বিরক্তি যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এতক্ষণে ইন্দুর ভালো করিয়া কান্না আসিল, উচ্ছল উচ্ছ্বসিত কান্না; চাপিবার চেষ্টা করিয়াও সে চাপিতে পারিল না, খোকাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। চোখে-চাপা-দেওয়া আঁচল তাহার চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে কাঁদিল না, অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া থামিয়া গেল। মনে হইল, একটু ঘুমাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। খোকার পাশে শুইয়া খোকার শীর্ণ তপ্ত দেহটি বুকে জড়াইয়া খানিকক্ষণের জন্য চোখ বুজিবার লোভ ইন্দুকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বরের খাওয়া বোধহয় এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে, আঁচাইয়া পান মুখে দিতে তাহার যতটুকু সময় লাগিবে ঠিক ততটুকু সময় ইন্দু তাহার ছোট ভাইটির বিছানায় একটু শুইতে চায় আজ।

বিদায় সত্যই সমারোহের ব্যাপার।

কয়েকটি অনুষ্ঠান আছে। সুন্দর কয়েকটি মেয়েলি আচার যথাবিহিত পালন করিতে হয়। প্রণামের ঘটাও কম নয়। উচ্চারিত অনুচ্চারিত আশীর্বচন লিপিবদ্ধ করিলে একখানি চটি বই হয়।

প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যগুলি (পরস্পরের প্রতি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কিন্তু বরকনে এবং অন্যান্য অনেকেরই সুশ্রাব্য স্বরে) চটি বইয়ে কুলায় না।

ইহাদের মধ্যে বয়স্করা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারেন তিনটি ছেলেমেয়ে কোলে লইয়াও শ্বশুরবাড়ি আসতে তাঁহারা কত কাঁদিয়াছিলেন, যাহারা ছোট শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় খুব একচোট কাঁদিবার ভরসা তাহারা রাখে। ইন্দু যে কাঁদিল না, ইহাদের সকলের কাছেই তাই তাহা অসহ্য ঠেকিল। শব্দ করিয়া কাঁদুক ঘন ঘন চোখওঁকি মুছিতে পারে না মেয়েটা ?

'দেখলে রাঙামাসী ? মেয়ে ধাড়ি ক'রে বিয়ে দেবার ফলটা একবার দেখলে ? বর পেয়ে বর্তেছেন ! একফোঁটা জল নেই গা মেয়ের চোখে ?'

প্রতিবাদ করে ক্ষেন্তি।

'রাঙামাসী আবার কি দেখবে কালোপিসি ? ওর চোখ দুটোর দিকে তুমিই চেয়ে দ্যাখো। সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ যে ওর জবাফুল হয়ে আছে এ তো কানাও দেখতে পায়।'

কালো পিসি মুখ কালো করিয়া বলেন, 'কি জানি বাছা, কেঁদে না রাত জেগে চোখ জবাফুল হয়েছে—আজকালকার মেয়ে তোরাই ও-সব ভালো বুঝিস।'

মুখ মুছিবার ছলে হরেন হাসি গোপন করে।

অথচ যে চোখ দুটির জবাফুল হওয়া নিয়ে এই কৌতুক তাহা ঘোমটার আড়ালে গোপন হইয়াই থাকে, সে চোখে জল না কাজল ঘোমটা না তুলিলে তাহা আর নজরে পড়ে না। তা এই পুরানো মুখে ঘোমটাই এখানে দ্রষ্টব্য, ঘোমটা তুলিবার কৌতূহল ইহাদের কম। স্বামী গৃহে পা দিবামাত্র সেখানকার অবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে যে কৌতূহলের প্রাচুর্য ইন্দুর মুখখানিতে মুহুর্মুহু সিঁদুর ছড়াইয়া দিতে থাকিবে।

রওনা হওয়ার সময় হইয়া আসে, কিন্তু বিদায় দিয়াও বিদায় দেওয়া হয় না, বরকর্তা তাগিদ দিতে দিতে উষ্ণ হইয়া ওঠেন, চারিদিক হইতে 'এই হ'ল, এই

হ'ল, রব উঠিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করে, কনের বাবা ঠেঙানো জন্তুর মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ক্রমাগত হাত কচলান, ওদিকে দিদির সঙ্গে যাওয়ার বায়না নিয়া খোকার কান্না আর থামে না।

ইন্দুর ইচ্ছা হয় এই অসহ্য অত্যাচারের হাত এড়াইতে ছুটিয়া পাল্কিতে উঠিয়া পড়ে। বেদনার এ বিরাট ভূমিকা কেন? থাকিবার যখন উপায় নাই তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। উঠানে দাঁড়াইয়া না থাকা না যাওয়ার যন্ত্রণাটা এমন সমারোহের সহিত ভোগ না করিলে কি নয়?

দাঁড়াইয়া থাকিতে ইন্দুর কষ্ট হয়। সর্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে।

অঙ্গন-লগ্ন ছায়াটিই ইন্দু দেখিতে পাইতেছে, তাহাও ঘোমটার ভিতর দিয়া কয়েক হাত পরিধির মধ্যে অংশটুকু, কিন্তু মাথার উপরে যে প্রকান্ড আমগাছটি চাঁদোয়ার মতো নিজেকে ডালপালায় ছড়াইয়া দিয়াছে তার সর্বাঙ্গ ছাইয়া মুকুলের সমারোহ সে স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারে। আষাঢ়ের শেষাশেষি এ গাছের ফল পাকিবে—খাইয়া শেষ করা যায় না এত ফল। কে জানে সে তখন থাকিবে কোথায়?

খোকা কাঁদিতেছিল, খুব আস্তে কাঁদিতেছে, পায়ের নিচের ঘন ছায়া কেমন গাঢ় নীল হইয়া উঠিল৷ ঘোমটার প্রান্ত হইতে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা উঠান পর্যন্ত নামিয়া যাইতেছে—তবু খোকা কাঁদিতেছে, অনেক দূরে, তালশিমুলীর চেয়ে অনেক দূরে ঝিঁঝির ডাকের মতো কেমন ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া খোকা কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে ইন্দুর মাথার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ঝম্ ঝম্ শব্দ আরম্ভ হইল এবং মুহূর্তে সমস্ত উঠানটা বার কয়েক দুলিয়া শব্দহীন অন্ধকারে তলাইয়া গেল।

দুই হাত বাড়াইয়া উঠানটা ধরিতে গিয়া সে উঠানেই টলিয়া পড়িয়া গেল।

হরেনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিল না। আস্তে আস্তে উঠানে নামাইয়া দিয়া বাকি কর্তব্যের ভার অন্য সকলের উপর ছাড়িয়া দিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিকে ভারি চেঁচামেচি আরম্ভ হইল। কি হইল এবং যা হইল তা কেমন করিয়া হইল জানিতে চাহিয়া, জল ও পাখার দাবি জানাইয়া সকলে বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল, ভূলুণ্ঠিতা কন্যার মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া মা বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মেয়েরা একবাক্যে হা-হুতাশ করিল।

তারপর জল আসিল, পাখা আসিল, ইন্দুর সিঁথির আলগা সিঁদুর জলে ধুইয়া গেল, তাহার রাঙা চেলিতে উঠানের কাদা লাগিল এবং প্রায় চার মিনিট সময় সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলিয়া তাকাইল। চারিদিকে চাহিয়া সে বলপ্রয়োগে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মা'র দৃঢ় আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না।

মা বললেন, 'শুয়ে থাক্ মা, শুয়ে থাক্—ও শ্রীহরি ও মধুসূদন, একি বিপদ ঘটালে !'

যাত্রা আধঘণ্টা খানিক পিছাইয়া গেল।

ইন্দুর আকস্মিক মূর্ছার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা হইল প্রচুর। উপবাস, দুর্বলতা, মনোকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য, 'ঢং লো ঢং, ঢং করে মেয়ে মূর্ছো গেলেন, আর বুঝি না,' এই অনুমান কয়টিই প্রাধান্য পাইল বেশি। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, দুর্বলতা নয়, এমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ের আবার দুর্বলতা কিসের, গরমটাই আসল কারণ। সহজ গরমটা পড়িয়াছে আজ ? বসিয়া থাকিতে থাকিতেই লোকের ভির্মি লাগিবার উপক্রম হয়।

ছেলের বাবা কিন্তু গরমের অপরাধটা মানিয়া লইয়া মেয়ের বাবাকে অত সহজে রেহাই দিলেন না। বলিলেন, 'একি কান্ড মশাই ? ফাঁকি দিয়ে একটা মৃগী রোগীকে ঘাড়ে চাপালেন ?'

ইন্দুর বাবা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে মৃগী রোগী নয়, জীবনে আর কখনো ওর ফিট হয় নি। আর গরমে—'

'গরম! কিসের গরম ! গরম বলিয়াই ফিট হইবে না কি ?—বলি, গরম লাগল কি একা আপনার মেয়ের ? কই, এই তো এতগুলি মানুষ আছে এখানে, কারো তো ফিট হল না বেয়াই মশাই ?'

পাত্রপক্ষের জনৈক মাতব্বর যোগ দিলেন, 'বেহায়া মশায় বলুন দাদা। বাবা, এ যে দিনে ডাকাতি !'

এ সমস্তের আর জবাব কি, ক্রুদ্ধ বৈবাহিকের সামনে বিপাকে-পড়া নৌকার মতো ইন্দুর বাবা টল্‌টল্ করিতে লাগিলেন, তাঁর বংশ মৃগীরোগীর বংশ নয়, শুধু এই অস্বীকৃতির হালে কোনো মতে সামলান গেল না। রফা হইল তিনশো টাকায় বরের বাবা পাষন্ড নন, মূর্ছার ব্যারাম আছে বলিয়াই পুত্রবধূকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, চিকিৎসা করিয়া বউকে তিনি আরাম করিবেন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেয়ের বাবা যৎকিঞ্চিত আগাম দিবেন ইহা কিছুমাত্র অসংগত নয়।

তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সংগতি ? মুখর জনতার মধ্যে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দুর বাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, মেয়ের শুভবিবাহে শুভ যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়।

উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়ার সময় চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম করিয়া রাখার জন্য ভাগ্য ডাক্তারকে তিনশো টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারিল না। জানাইয়া যাহারা দিত মেয়েকে একপ্রকার কোলে করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত মা তাহাদের সংযত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম-বেদনার ব্যূহ ভেদ করিয়া আর কেহ ইন্দুর নাগাল পায় নাই।

পাল্কির মধ্যে হরেনের সান্নিধ্যে মূর্ছার জন্য ইন্দু তাই কেবল লজ্জাতেই মরিয়া যাইতেছিল—বাধ্য হইয়া একটু একটু চেনা বরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইবার মধুর লজ্জা।

পাল্কি তখন আটজন বেহারার কাঁধে রাইঘোষাণীর মাঠ ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। অন্য পাল্কি চারখানা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, হরেন পাল্কির দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, 'ঘামে সেদ্ধ হওয়ার চেয়ে এ গরম বাতাসও ভালো। কি বল ?'

ইন্দু কিছুই বলিল না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

বাধা দিয়া হরেন বলিল, 'না না, শুয়ে থাক।'

ইন্দু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

একদিকে তরুলতাহীন প্রান্তর, অন্যদিকে গ্রাম ও ক্ষেতখামার, ইহারই মধ্য দিয়া অসময়ের যাত্রী দু'টি এমনি ভাবে সর্বপ্রথম পরস্পরের সুখ-সুবিধার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। পাল্কি বেহারাদের পায়ে পায়ে যে ধুলো উঠিল, রাইঘোষাণীর মাঠের বাতাস তাহা কোন্‌দিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

খানিক পরে পাল্কি সাতগাঁয়ে প্রবেশ করিল।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল এ গাঁয়ের নাম জান, ইন্দু ? আসবার সময় শুনেছিলাম, ভুলে গেছি ?

পাল্কির কোণে জড়সড় ইন্দু জবাব দিল, 'সাতগাঁ।'

গ্রামটিকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য হরেন পাল্কির বাহিরে মুখ বাড়াইল। দেখিল, একটা ময়রার দোকানের পরে পথের ধারে প্রকান্ড একটা বকুল গাছের তলে একটি কালো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একখানা বই। বকুল গাছের ছায়ায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে পাল্কির শব্দ শুনিয়া কৌতূহলবশে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরেন এইরূপ অনুমান করিল।

তারপর আরও কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পাল্কি স্টীমার-ঘাটে পৌঁছিল। স্টিমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিভিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমার আমায় খুব মনের মিল হবে; হবে না ?

যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত।

মাথার রহস্য

শেষ বয়েসে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

বেচারী গরীব মানুষ। সারাজীবন সামান্য মাহিনায় চাকরি করিয়া অতিকষ্টে ছেলেদের মানুষ করিয়াছে, ধার-কর্জ করিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া মেয়ে দু'টির বিবাহ দিয়াছে, জীবনে একটিবারের জন্যও কোনোদিন দুই হাজার টাকা নিজের বলিয়া দাবি করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পেন্সন নেওয়ার পর মাসে মাসে সাঁইত্রিশ টাকা পেন্সন আর জীবনবীমার ঐ দুই হাজার ছাড়া পতিতপাবনের আর কিছুই ছিল না। টাকা তো নয়, গায়ের রক্তের চেয়েও বেশি। কলকাতা শহরের ভোজবাজিতে এক মিনিটের মধ্যে সেই টাকাটা যে কোথায় উড়িয়া গেল।

ব্যাপারটা যে কি হইয়াছিল বাড়ির লোক ঠিক জানে না। নন্দীগ্রামে পতিতপাবনের বাড়ি। পাওনা টাকাটা আদায় করিয়া ব্যাংকে জমা দিয়া আসিবার জন্য সে কলিকাতায় গিয়াছিল। তিন দিন পরে সে গম্ভীরমুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। জীবন যুদ্ধে হাসিখুসী ভাবটা পতিতপাবনের অনেকদিন উবিয়া গিয়াছে, তবু সাধারণত সে এরকম খাপছাড়া গাম্ভীর্যের ধার ধারে না। চোখের চাউনিও যেন একটু কেমন-কেমন।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেলে?

পেয়েছি।

কোন্ ব্যাংকে জমা দিলে? সরকারী ব্যাংকে তো?

পতিতপাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল, ব্যাংকে জমা দেব কেন? আমি কি সে রকম হাবা না কি? পুঁতে রেখেছি।

পুঁতে রেখেছ! কোথায় পুঁতে রেখেছ?

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? যেখানে হোক রেখেছি।

তারপর ধীরে ধীরে মোটামুটি ব্যাপারটা বোঝা গেল। টাকাটা পতিতপাবন যথারীতি আদায় করিয়াছিলেন, তারপর কি যেন হইয়াছে। টাকাটা হয় কোথাও পড়িয়া গিয়াছে, নয় কেউ পকেট মারিয়াছে, নয় ভাঁওতা দিয়া বাগাইয়া লইয়াছে, নয় অন্যভাবে গিয়াছে চুরি।

বাড়ি ফিরিবার পর দিন পতিতপাবনের মাথাটা কিছুক্ষণের জন্য একটু সাফ

হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে তার কথাবার্তা হইতে এই পর্যন্ত অনুমান করা গিয়াছে।

বড় ছেলে মাধব যা করার ছিল করিয়া দেখিল। বাপকে জেরা করিল ঘন্টার পর ঘন্টা, যে টিনের স্যুটকেশ সঙ্গে লইয়া পতিতপাবন কলিকাতা গিয়াছিল তন্ন-তন্ন করিয়া সেটি খোঁজাখুঁজি করিল, কলিকাতা গিয়া এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিল, তারপর বাড়ি ফিরিয়া বিষন্ন মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও টাকা গেছে মা।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিল। কি অদেষ্ট করেই জন্মেছিলাম আমি। টাকাকে টাকা গেল, এদিকে আবার কি সর্বনাশ হল দ্যাখ! হ্যা রে, মাধু, টাকার শোকে মানুষ কি সত্যি পাগল হয়ে যায়? আস্তে আস্তে কমে যাবে তো?

মাধব মুখ খিঁচাইয়া বলিল, যাবে না? ওতো বাবার ঢং। টাকাগুলো বিসর্জন দিয়ে এসে কি আর করেন, মাথাখারাপ হওয়ার ভান করছেন।

অন্নপূর্ণা আরও বেশি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোরও মাথা খারাপ হয়েছে মাধু, নইলে ওঁর নামে তুই অমন কথা বলিস? ঢং করবার মানুষ উনি?

মাধব মুখ ভার করিয়া বলিল, আমি এবার কাগজ বার করব কি দিয়ে। কত বললাম, বাবা আমি সঙ্গে যাই, অতগুলো টাকা একা তুমি সামলাতে পারবে না, তখন সে কথা কানে তোলা হল না। এবার? এবার কি করব? আমি কাগজের জন্য কার কাছে গিয়ে হাত পাতব?

এদিকে এমন সর্বনাশ হয়ে গেল, আর কাগজের ভাবনাটাই তোর কাছে বড় হল মাধু?

হবে না? জান, এ সময় আমার মনের মতো একটা মাসিক কাগজ বার করতে পারলে এক বছরে বড়লোক হয়ে যেতাম? এবার অন্য লোকে মেরে নেবে।

দু'হাজারের মধ্যে পাঁচশো টাকা মাধবকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই শোকেই তাকে বিশেষ রকম কাবু হইয়া পড়িতে দেখা গেল। আর, স্বামীর রকম-সকম দেখিয়া অন্নপূর্ণার যত বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, অবিবাহিতা কন্যা পুঁটকির দিকে চাহিয়া তত উথলিয়া উঠিতে লাগিল টাকার শোক।

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করে, কাঁদছ কেন?

অন্নপূর্ণা বলে, ওগো আমাদের পুঁটকির বিয়ে দেব কি করে?

পতিতপাবন আশ্চর্য হইয়া বলে, পুঁটকির বিয়ে? সেদিন না পুঁটকির বিয়ে দিলাম? আবার বিয়ে কিসের?

মাধবের বৌ শাশুড়ির দেখাদেখি এতক্ষণে যে চোখ মুছিতেছিল, এবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মুখে আঁচল চাপা দেয়। বেকারের বৌ, কিন্তু সংসারে ভাবনা-চিন্তা না থাকায় আর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু না থাকায় সংসারে হাসিকান্নার স্রোতেই গা এলাইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তবে একটা আশ্চর্যের

বিষয় এই, পরের দেখাদেখি সে কাঁদে বটে, হাসির কথায় হাসে কিন্তু নিজে নিজেই।

পতিতপাবন হাঁকিতে আরম্ভ করে, পুঁচকি। পুঁচকি।

পিছন হইতে সামনে আসিয়া পুঁচকি বলে, কি বাবা?

তুই কেমন মেয়েরে পুঁচকি? দু'বছর আগে অত খরচপত্র ক'রে তোর বিয়ে দিলাম, আবার তোর বিয়ে কিসের? ইয়ার্কি পেয়েছিস্‌ নাকি?

ঠাহর করিয়া দেখিয়া পতিতপাবন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

সিঁদুর দিস্‌নে তুই? কেন দিস্‌নি হারামজাদি? আর একবার আমার দফা নিকেশ করবার মতলব করেছ, না? একবারে সাধ মেটে নি।

মেজছেলে যাদব অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চোখের ইশারা করিতে হতভম্ব পুঁচকি পলাইয়া যায়। পতিতপাবন নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে যে, সে আর পারিয়া উঠিল না, এত কষ্টে যদি বা হাজার দুই টাকা জোগাড় করিয়াছে, সকলের নজর ওই টাকাটার উপরে ওটা যতক্ষণ না শেষ করিতে পারিতেছে, কারও আর স্বস্তি নাই।

যাদব বলে, তোমার টাকা কোথায় পোঁতা আছে আমরা কেউ তো তা জানিও না, বাবা?

জানবার জন্যে মতলব তো বাগাচ্ছ হাজার রকমের।

তাই বা কেন বাগাব? টাকা দিয়ে আমাদের কি দরকার? তোমার টাকা যেখানে আছে সেখানে থাক।

মাথার ভিতরে যার গোল বাধিয়া গিয়াছে, কে তাকে বুঝাইবে? এ বাড়িতে সকলের চেয়ে মাথা পরিষ্কার যাদবের; সংসারে মানুষের কাণ্ডকারখানাগুলি সে যেমন বুঝিতে পারে বুঝাইতেও পারে তেমনি। জোরাল একটি ব্যক্তিত্ব থাকাব জন্য তার কথাগুলি লোকে বুঝিতেও চায়। কিন্তু বাপকে বুঝাইতে গিয়া সেও হার মানিয়া যায়। তার বিকৃত মাথাটা কিছুতেই ছেলের ভালো মাথাটার এ ভাব স্বীকার করিতে চায় না। এক একটা সূত্র ধরিয়া এক এক দিকে নিজের বিকৃত কল্পনার রথটি চালাইতে থাকে।

তার সমস্ত বিকারের ভিত্তি ঐ দু'হাজার টাকা।—

কোন্‌ চুলোয় গিয়াছে সে টাকা ভগবান জানেন, দিবারাত্রি তার মনের মধ্যে ঐ টাকার চিন্তা পাক খাইয়া বেড়ায়। কখনও নিজের মনে ভাবে, কখনো ভাবনাগুলি শোনাইয়া বেড়ায় দশজনকে। অন্য লোকে নিজেদের মধ্যে যখন-যে বিষয়েই আলোচনা করুক পতিতপাবন সে আলোচনায় যোগ দিলে দু'হাজার টাকার কথা টানিয়া আনে—যে টাকাটা সে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, আর যে টাকাটার দিকে পৃথিবী-সুদ্ধ সকলের লোভ, আর যে টাকাটা দিয়া একদিন এই করিবে, ঐ করিবে, তাই করিবে।

টাকাটা যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে, আর এমন কেহ যদি পাইয়া থাকে যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া দু'হাজার টাকার লোভও সামলাতেই পারে, এই আশায় কয়েকটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কেমন করিয়া একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িয়া যাওয়ায় পতিতপাবন চটিয়াই লাল। মাধবকে ডাকিয়া বলিল, কে দিয়াছে বিজ্ঞাপন, তুই ?

হ্যাঁ। ভাবলাম, যদি কেউ কুড়িয়ে পেয়ে থাকে—

কুড়িয়ে পেয়ে থাকে। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি রে, এ্যাঁ ? বলছি পুঁতে রেখেছি, কুড়িয়ে পাবে কি ক'রে ?

পুঁতে রেখেছ তো বুঝলাম—

বুঝলাম, কি বুঝলাম ? বল পাজি বুঝলাম মানে কি, তোকে বলতে হবে।

পুঁতে যদি রেখে থাক, দেখাও দিকি কোথায় পুঁতে রেখেছ ? একবারটি শুধু দেখাও, তারপর তোমার যেখানে খুশি রেখে দিও টুঁ শব্দটি করব না। খালি মুখে বললেই তো হবে না পুঁতে রেখেছি।

রাগে পতিতপাবনের মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া গেল। সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তুই শয়তানের একশেষ মাধু, বজ্জাতের একশেষ। ভেবেছিস্ এমনি ফিকির করে টাকার খোঁজটা জেনে নিবি ? বটে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দে মাধু ভালো চাস তো, আর শোন্ বলি তোকে, খবরদার আমার টাকার কথা তুই মুখে আনবি না। আমার টাকা, আমি যা খুশি করব, তোর কি ?

যাদবও ভাবিয়া চিন্তিয়া টাকার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে বাড়ির লোককে বারণ করিয়া দিল। মিছামিছি পতিতপাবনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া লাভ কি ? ক্ষতি যা হাওয়ার তা হইয়াছে, আর তা ফিরিবে না। টাকাটা যে কোথাও পোঁতা আছে, এ ভুল ভাঙিয়া গেলে বরং পতিতপাবনের মাথা আরও বিগড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তার এই ভুল ধারণাতে সায় দিয়া চলাই সকলের উচিত, হয়ত ধীরে ধীরে একদিন সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

অন্য ছুতোয় অন্য পরিচয়ে বাড়িতে আসিয়া একজন ডাক্তার একদিন পতিতপাবনের ব্যাপারখানা দেখিয়া গেছেন। বলিলেন যে হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামী আসে, সেটা সাধারণত স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ। যাদব বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না। সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়া ছিল তিনদিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ? বড় আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া, বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয়, কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।

ডাক্তারির পর একটু কবিরাজি চিকিৎসা হইল। কখনো একটু ভালো মনে হইল পতিতপাবনকে, কখনও মনে হইল পাগলামী যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, বিশেষ কিছু উন্নতি কোনো চিকিৎসাতেই দেখা গেল না। বাড়ির সকলের মন খারাপ রহিল এবং উপদেশ ও পরামর্শ দিবার মস্ত একটা বিষয়বস্তু জুটিয়া গেল পাড়ার লোকের। পূজা, মানত ও মাদুলির মধ্যে পূজা আর মানতগুলিই দেখা গেল সম্ভব, পতিতপাবনকে মাদুলি ধারণ করানোর কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কে তাকে বলিবে যে, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, এই মাদুলিটা ধারণ কর, সারিয়া যাইবে।

ভয়ানক কিছু করিবার ঝোঁকও পতিতপাবনের আসে না, কতকগুলি বিষয়ে মাথাটাও সে মোটামুটি ঠিক রাখিয়া চলে—এই যা একটা ভরসার কথা। অন্য পাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিতে হইলেই হইয়াছিল। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে নিয়ম মতো পেন্সনটাও লইয়া আসে, সময় মতো স্নানাহার করে, সংসারের স্বাভাবিক গতিতে এমন কোনো বাধা জন্মায় না, যে জন্য সকলকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। রাত্রে যদি না ঘুমায়, অন্য কারো ঘুমের যে ব্যাঘাত করে না, বিড়বিড় যখম যা বকে, এত আস্তে জড়াইধা কথাগুলি বলে যে সাধ করিয়া কান পাতিয়া না শুনিলে কাবোর শুনিবার দরকার হয় না। দাড়িগোঁফে পতিতপাবনের মুখখানা এরকম ঢাকিয়া গিয়াছে, তার চোখের দিকে চাহিলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কেমন একটা জটিল দুর্বোধ্য রহস্য তাহার দু'টি চোখে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন জ্যোতির মতো ঘনাইয়া আসিয়াছে, শিশুর চোখে যেন ফুটিয়া আছে শ্মশানচারী কাপালিকের দৃষ্টি।

পাগলামী পাগলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পতিতপাবনের পাগলামী এমন বেমানান মনে হয়। এ অস্বাভাবিকতা যেন তার পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক, অনুচিত কিছু।

যাদব বলে, বাবা ভালো হয়ে যাবে, মা।

আমার যেমন অদেষ্ট!

সত্যি ভালো হয়ে যাবে। কোনো রকমে আমি যদি দুই হাজার টাকা যোগাড় করতে পারতাম!

মাধব একটা পঞ্চাশ টাকার চাকরি যোগাড় করিতে পারিল বটে, যাদবের পক্ষে দু'হাজার টাকা যোগাড় করার কোনো ভরসাই দেখা গেল না। মাধবের চাকরি হওয়ায় ভাবিয়া চিন্তিয়া যাদব আর পড়া ছাড়িল না, কলিকাতায় এক কাকার অমত সত্ত্বেও তার বাসায় উঠিয়া কলেজের কাটা নামটা জোড়া লাগাইয়া ভয়ংকর পড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

পড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেলেও টাকা হয় না যাদব তা জানে, কিন্তু কি আর করা যায়, আর কোনো পথের সন্ধান তো সে রাখে না। কাকার বাড়ি ফাইফরমাশ খাটিতে বলিলে যাদব খাটে না, গালাগালি দিলে শোনে না, খাইতে না ডাকিলে

নিজে পাত পাড়িয়া বসিয়া খায় আর সপ্তাহে দু'সের ওজন কমানোর মতো পড়ে। এমন অসাধারণ ভালো একটি ছেলে বাড়িতে থাকিলে যদি বাড়ির পাঠ-বিমুখ আড্ডাধারী ছেলে দু'টির কিছু ভালো হয়, এই আশায় কাকার বাড়ির সকলে শেষে যাদবের অপরাধগুলি ক্ষমা করিয়া ফেলে। এমন কি, কাকীমা এক-দিন মুখখানা হাসিহাসি করিয়া পর্যন্ত বলে, আচ্ছা তুই পড়, তোকে আর বাজারে যেতে হবে না।

ধরা-বাঁধা একটা নিয়মই আছে যে, পাড়তে পাড়তে যে যত রোগা হইতে পারিবে, সে তত ভালোভাবে পাশ করিবে। সুতরাং যাদবের পরীক্ষার ফলটা হয় চমৎকার।

গ্র্যাজুয়েটত্ব অর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইয়া যাদব পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উঠিয়াছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভালো মেয়ে যদি পাওয়া যায় তো ভালোই, যদি না পাওয়া যায় তাতেও ক্ষতি নাই—আর সমস্ত গণ্ডায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাওয়া চাই, আর চাই নগদ টাকা থোক দু'হাজার।

এক হাজার নশো নিরানব্বই হইলেও চলিবে না, পুরোপুরি দু'হাজার।

যাদবের ভাবসাব দেখিলেও যেন কেমন কেমন লাগে। যেমন চেহারা ছিল, স্বভাব ছিল, সে রকম চেহারাও নাই, স্বভাবও নাই। আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। শান্তশিষ্ট ধীর প্রকৃতির ছেলেটার মধ্যে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছে বোঝা যায়, জীবনটা যার কাছে এতদিন ছিল সহজ ও সাধারণ, হঠাৎ তার যেন জীবন সম্বন্ধে গুরুতর একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছে, সহজ বুদ্ধি-বিবেচনার মধ্যে মাথা তুলিয়াছে জোরালো ভাবপ্রবণতা।

মাধব বলে, তুই বড় বেহায়া, যদু! নিজের বিয়ের সম্বন্ধে এমন ক'রে—

যাদব বলে, তুমি বোঝ না, দাদা। বিয়ের জন্য বিয়ে করছি না কি আমি? টাকার জন্যে।

টাকার জন্য বিবাহ করিলে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে যতদূর খুশি নির্লজ্জ হওয়া যায় এই রকম একটা ধারণা যাদবের মনে আছে। সে তাই মহোৎসাহে নিজের বিবাহের কথা আলোচনা করে, দেনা-পাওনার ফর্দ দাখিল করে। ফর্দ দেখিলেই বোঝা যায়, হাজার চারের কমে মেয়ের বাপের আর রেহাই নাই।

তা হোক! বাড়ি-ঘর না থাক, বাড়ির অবস্থা ভালো না হোক, ছেলের বাপের মাথার ব্যারাম থাক, পরীক্ষা পাশ করিতে তো ছেলে অসাধারণ পটু। ঘটক একে-বারে পাঁচ হাজার টাকার এক বলি আনিয়া হাজির করে। ভদ্রলোক নগদ দিতে রাজি থাকেন তিন হাজার, ঘটকের তিনশো বাদ দিলে যাহা হইতে বাকি থাকিবে দু হাজার সাতশো।

যাদব বলে, ঠিক, এই তো চাই।

ছেলের বিবাহেও যে টাকা খরচ হয় এটা এতদিন তার খেয়াল হয় নাই কেন ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। এই বেশ হইয়াছে। সাতশো টাকা যা বেশি পাওয়া

গেল সেই টাকার মধ্যেই বৌভাত ইত্যাদির খরচ মিটিয়া যাইবে, হাতে থাকিবে পুরোপুরি দু'হাজার। কেবল দু' হাজার নগদ নিলে যে কাজের জন্য এত কাণ্ড করা সে কাজটাই যে তার হইত না, দু' হাজারের কত খরচ হইয়া যাইত কে জানে!

যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। বৌ অবশ্য সুবিধার হইল না, সবদিকে সুবিধা হয়ও না। রঙ্ একটু কালো বৌ-এর, দেহ একটু স্থূলে, মুখখানা একটু চ্যাপ্টা, আর বাঁ চোখটা এত ছোট যে, এ চোখে তার দৃষ্টি নাই। নামটা পর্যন্ত ভালো নয় বৌ-এর। কালিদাসী।

যাদব আগেই মেয়ে দেখিয়াছিল, তবু বিবাহের রাত্রে চোখে পলক ফেলিতে তার যেন একটু কষ্ট হইতে লাগিল। উপবাস আর অনিদ্রায় যে রকম হয় তার চেয়ে অন্য-রকম কষ্ট।

—তোমার ঘুম পেয়েছে ?

বৌ মাথা নাড়িল।

—তোমার গালে কাটা দাগটা কিসের ?

—ফোঁড়া হয়েছিল।

বোঝা গেল, মেয়ে দেখার সময় মনে হয়েছিল বৌ-এর গলা তার চেয়েও কর্কশ। অতিরিক্ত লজ্জার ভেজালটা উপিয়া গেলে ও গলার স্বর কেমন শোনাইবে কে জানে!

একটা নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া নিশ্বাসটা যাদব চাপিয়া গেল, কিন্তু প্রকাণ্ড হাই-টাকে কোনোমতে দমন করা গেল না।

বৌভাতের হাঙ্গামা চুকিয়া যাওয়ার পরদিন সকালবেলা পতিতপাবন বাড়ির সামনে দাওয়ায় বসিয়া গম্ভীর মুখে তামাক টানিতেছিল। বাড়িতে বিবাহের গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পর হইতে সে চুপচাপ হইয়া আসিয়াছিল, কেমন এক-প্রকার বিস্মিত দৃষ্টিতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলের চলাফেরা হৈ চৈ লক্ষ করিয়া দেখিতেছিল। কাল সারাদিন সে যেখানে ভোজ রান্না হইতেছিল, সেই-খানে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যার পর হইতে বারান্দার এককোণে একটা টুলে ঠায় বসিয়া থাকিয়াছে অনেক রাত অবধি। বাড়ির লোক অথবা নিমন্ত্রিতেরা কেহ কথা কহিলে কথার জবাবও দেয় নাই।

আজ সকালে অনেক দেরিতে উঠিয়া নীরবে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা-জল-খাবার খাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে। চা সে কোনোদিন খায় না, আজ চাহিয়া খাইয়াছে। সকলে একটু অবাক হইয়া ভাবিয়াছে যে, না জানি এ আবার তার কোন্ নূতন ধরনের পাগলামীর পরিচয়!

তামাক টানিতে টানিতে সে কি ভাবিতেছিল সে-ই জানে, পুঁচকি আসিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল, বাবা! বাবা! শিগগির এস, দেখে যাও কি কাণ্ড

হয়েছে।

—কি হয়েছে রে পঁুচোক ?

হঁুকা রাখিয়া ব্যস্তভাবে পতিতপাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। পঁুচোকর সঙ্গে উঠানে আসিয়া দেখতে পাইল, উঠানের এককোণে যাদব শাবল দিয়া মাটি খঁুড়িতেছে, আর চারিদিকে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সকলে তাই চাহিদা দেখিতেছে, কাছে গিয়া পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছেরে, যদু ?

যাদব বলিল, বাবা, তোমার সেই দু'হাজার টাকা খঁুজে পেয়েছি। বাঁশ পঁুতবে বলে কানাই এখানে গর্ত খঁুড়ছিল, হঠাৎ কিসে যেন শাবল লেগে শব্দ হল, টং—

বলিতে বলিতে গর্তের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া যাদব একটা বড় কাঁসার ঘটি বাহির করিয়া আনিল। ঘটির মুখ শিলমোহর করা।

এর মধ্যে তোমার সেই দু'হাজার টাকা রেখেছিল তো ?

পতিতপাবন খানিকটা হতভম্বের মতো বলিল, আমার সেই দু'হাজার টাকা ?

এর মুখের দিকে তাকায় পতিতপাবন, ওর মুখের দিকে তাকায়, ভ্রূ কঁুচকাইয়া কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করে।

আমার সে টাকা এখানে কোত্থেকে আসবে ? সে টাকা তো ব্যাংকে জমা দেবার সময় চুরি গিয়েছে ?

সকলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পতিতপাবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যাদব শুষ্ক-মুখে বলিল, তুমি যে বল টাকা পঁুতে রেখেছ ?

পতিতপাবনের কঁুচকানো ভ্রূ আরও বেশি কঁুচকাইয়া গেল। সে চিন্তিতভাবে বলিল, বলি না কি ? আমারও ঐ রকম একটা কথা মনে হচ্ছিল। মাথাটা আমার যেন একটু কেমন কেমন লাগছিল ক'দিন থেকে, আমার অসুখ-বিসুখ কিছু করেছিল না কি রে ?

যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে সোজা দেখা যায়, নূতন বৌ মস্ত দেহখানি লইয়া কৌতূহলভরে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মোটা মোটা আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া উঠানের ব্যাপারটা চাহিয়া দেখিতেছে।

যাদবের চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে দু'চোখ তার হইয়া উঠিল জবাফুলের মতো টকটকে লাল। বাপের মুখের দিকে কটকট করিয়া তাকাইয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া সে বলিল, অসুখ ? তোমার মতো লোকের অসুখ হয় ? সব তোমার ঢং।

অন্য ছুতায় অন্য পরিচয়ে বাড়িতে আনিয়া সেই ডাক্তার একদিন যাদবের ব্যাপার-খানা দেখিয়া গেলেন। বলিলেন যে, হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামী আসে সেটা সাধারণত স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। এমনো অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ। পতিতপাবন

বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না? সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া অজ্ঞান হইয়া ছিল তিন দিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ? বড় আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া, বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয় কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।

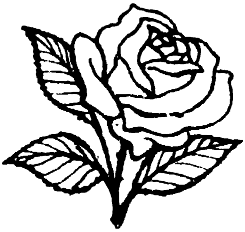

রকমারি

বাড়িতে পা দিতেই গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠ কানে আসিল। বেড়াইয়া ফিরিতেছিলাম, মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল। ভাবিলাম, প্রফুল্লতাটুকু বুঝি চৌকাঠের বাহিরেই রাখিয়া যাইতে হয়।

ভিতরে আর ঢুকিলাম না। বৈঠকখানা ঘরটা অন্ধকার, ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিলাম। সুইচটা টিপিয়া দিতে গিয়া হাত গুটাইয়া নিলাম। আলো জ্বালিলেই খবর পৌঁছিবে। গৃহিণীর মুখের অন্ধকারের চেয়ে বাহিরের ঘরের অন্ধকারটা নিরাপদ মনে হইল।

জামাটা খুলিয়া চেয়ারের উপর ফেলিয়া রাখিয়া চৌকির উপর বিছানো ফরাসে গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম।

পরিচিত কণ্ঠস্বর গ্রামে গ্রামে চড়িতে লাগিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, ততোধিক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ; কাহাকে লক্ষ করিয়া যে প্রয়োগ হইতেছে বুঝিতে দেরি হইল না! সামানাসামনি কি রকম বিঁধিতেছিল ভগবানই জানেন, এতদূরে আসিয়া কিন্তু সব্যসাচীর অব্যর্থ সন্ধানের দুর্ভাগ্য লক্ষ্যের মতো আমাকে বিঁধিতে লাগিল! একটা মোটা গলা সক্রোধে গর্জিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, পরক্ষণে থামিয়া যাইতেছিল। প্রলয় গণিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে সুর নামিতে লাগিল। নামিতে নামিতে শেষে একেবারেই থামিয়া গেল। বুঝিলাম, অপর জন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে।

পরক্ষণে পুরাতন ভৃত্য ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আমায় দেখিতে না পাইয়া খুব কাছেই বসিয়া পড়িল। বুঝিলাম কাঁদিতেছে। বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়। আমারই এক এক সময় কাঁদিতে ইচ্ছা করে ও তো চাকর।

প্রশ্ন করিলাম, 'কি হয়েছে রে, হরে?'

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, এক হাত দূরে আমার সাড়া পাইয়া হরিচরণ সেই রকম চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দেখতে পাইনি বাবু—'

বলিলাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাতে আর কি হয়েছে। তোকে বকছিলেন কেন রে?'

হরিচরণ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই—আজ সকালে গৃহিণী তাহাকে শয়ন গৃহের দেওয়াল ঝাড়িতে আদেশ করেন। বাজার হইতে ফিরিয়া কাজটা করিবে ভাবিয়া সে বাজারে চলিয়া যায়। তারপর আলুপটলের

হিসাবের গোলমালে কথাটা বেমালুম তার মন হইতে সরিয়া পড়ে। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ ঘরের কোণে মাকড়সার জাল নজরে পড়ায় গৃহিণীর মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া যায় এবং হরিচরণের উপর তৎক্ষণাৎ দেওয়াল ঝাড়িবার আদেশ জারি হয়। সে যত বলে, কাল করব মা, গৃহিণী ততই উষ্ণ হইতে থাকেন। অগত্যা হরিচরণ সেই ভর সন্ধেবেলা দেওয়াল ঝাড়িতে আরম্ভ করে। হঠাৎ নিতান্তই তার কপাল দোষ, ঝাড়নে লাগিয়া একখানা ছবি পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। সেই হইতে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। গৃহিণীর নাকি অভিমত—কাজ করিতে বলায় রাগে সে ইচ্ছা করিয়া ভাঙিয়াছে; নহিলে, সে কি চোখের মাথা খাইয়াছে যে অতবড় একটা জিনিস দেখিতে পায় না?

'আমি কি ইচ্ছা করে ভেঙেছি বাবু? মা তো বুঝলেন না, কেবল বকুনি দিতে লাগলেন। এত কথা সয়ে থাকতে পারব না, কাল সকালে আমায় মাইনে দিয়ে বিদায় দেবেন।' —বলিয়া উপসংহার করিল।

দরজার কাছে চড়া গলা শোনা গেল, 'কার কাছে মনের কান্না কাঁদছিস রে হরে?'

কাঠ হইয়া গেলাম। চাকরকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি দুঃখের কাহিনী অর্থাৎ গৃহিণীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিতেছি ইহার চেয়ে বড় অপরাধ আমাদের দাম্পত্য পেনাল কোডে লেখে না।

ঘরে ঢুকিয়া খপ করিয়া সুইচটা টিপিয়া দিলেন। আমার দিকে বারেক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'বেড়িয়ে এসে চাকরের মুখে আমার নিন্দেটা বড় মুখ-রোচক লাগছে, না?' বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হাসিটা ভয়ানক? শুধু রাগ ঠান্ডা হয়, কিন্তু হাসির আড়ালে রাগটা বড় বেয়াড়া, কিছুতেই মানিতে চাহে না।

হরিচরণ কথা কহিল না। তার ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া সটান শয়ন করিল। উঠিলাম, বসিয়া লাভ নাই। চেয়ারের উপর হইতে জামাটা টানিতেই একটা চায়ের কাপ জামার তল হইতে পড়িয়া তিন টুকরা বড় এবং বহু ক্ষুদ্র টুকরাতে বিভক্ত হইয়া গেল। জামায় তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলাকার দাগ। বরাদ্দ দুই কাপের উপর তৃষ্ণা পাওয়ায় দোকান হইতে এক কাপ চা আনাইয়া চুপি চুপি এখানে বসিয়া খাইয়াছিলাম। কাপটা আমিই চেয়ারের উপরেই নামাইয়া রাখিয়াছিলাম। অপকর্মের অতবড় নীরব সাক্ষীটাকে সরাইয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি ঘটে ছিল না। হায় রে, সেই কি না আমায় ফাঁসাইল। জামার এ অবস্থা দেখিলে—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলিয়া একটা কথা আছে না?

আলমারি খুলিয়া মোটা মোটা আইনের বইয়ের পিছনে জামাটা লুকাইলাম, ভাবিলাম কাল সকালে ডাইং ক্লিনিং-এ পাঠাইয়া দিব। উপরে গিয়া শয়ন গৃহে ঢুকিতেই নজরে পড়িল খাটের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া তিনি আমার একুশ টাকা দামের ফাউন্টেন পেনটি লইয়া একটি কাগজে খস খস করিয়া কি লিখিতে-

ছেন। পায়ের শব্দে নজর তুলিলেন। বলিলেন,'খালি গায়ে? জামা কি হল? বিলিয়ে দিয়ে এলে নাকি?' ব্যস, ডাইং ক্লিনিং খতম। নিজের উপর চটিয়া গেলাম। অন্য একটা জামা গায়ে দিয়া এ ঘরে ঢুকিলেই হইত। এই কার্তিকের শেষে স্বামীর খালি গা দেখিয়া কোন্ সুগৃহিণীর না জামার কথাটা মনে জাগে। ওকালতী করিয়া বাহিরের লোকের আন্দাজ মতো মাসে তেরো চোদ্দ শ', নিজের হিসাব-মত সাত আটশো টাকা রোজগার করি, আর এইটুকু বুদ্ধি মাথায় আসিল না? ধিক। বলিলাম, 'বাইরের ঘরে ফেলে এসেছি, নিয়ে আসছি।' বলিয়া তাড়াতাড়ি পা বাড়াইলাম। আলমারির বইয়ের পিছনের গোপনতাটুকু গোপন করাই শ্রেয়ঃ।

গৃহিণী বলিলেন, 'থাক্, থাক্ তুমি বসো। ঝিকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি ঐ ফ্যালানের শার্টটা গায়ে দাও।'

কপাল। বাহিরের ঘরের সেই জাতীয় সাংঘাতিক হাসি হাসিয়া পূর্বে বরাবর একটা গোটা রাত কথা বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন। আর যেদিন জামায় চায়ের দাগ লাগিল এবং একটা হাস্যকর যায়গায় সেটা লুকাইয়া রাখিলাম সেই দিনই তিনি এমন সদয় হইয়া পড়িলেন। ঝিকে ডাকিলেন এবং জামা আনিতে পাঠাইলেন। একটু সরিয়া বসিয়া নিজের পাশে খাটের উপরকার জায়গাটা দেখাইয়া বলিলেন, 'এইখানে বসো, একটা কাজ আছে। আগে শার্টটা গায়ে দিয়ে নাও। বেশ ঠান্ডা পড়েছে আজ, তোমার আবার যে সর্দির ধাত।'

ওঃ। কাজ আছে তাই। প্রয়োজেনর খাতিরে অমন হাসিটাকে নিরর্থক হইতে দিবার উদারতা গৃহিণীর ছিল।

জামাটা গায়ে দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। বলিলেন, মৃণালিনীকে চেন তো?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'চিনি।'

'কে বলতো?'

'বঙ্কিমবাবুর মানস কন্যা, এবং...'

'এবং তোমার প্রণয়িনী।'—

আমি বলিলাম, 'থুঃ ওয়াক্!'

গৃহিণী বলিলেন, 'তাই নাকি। বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম। ঠাট্টা এখন থাক, কাজের কথা শোনো। এ তোমার সে মৃণালিনী নয়, আমার সই। ধীরেনবাবুর স্ত্রী গো। মনে নেই?'

মনে ছিল কিন্তু বলিলাম, 'উঁহু, মনে তো পড়ছে না।'

তিনি বলিলেন, 'থাক্ থাক্ অত সাধু বনতে হাব না। যার গান শুনে ধীরেনবাবুর সঙ্গে স্ত্রী বদল করতে চেয়েছিলে তার কথা তিন মাসেই ভুলেছ বটে।'

সর্বনাশ? ধীরেনের কানে কানে বলা সেই পরিহাসটুকুও শুনিতে বাকি নাই। বলিলেন, 'এখন শোনো। সই ভারি একটা মজা করেছে। আমার কাছে একটা

চিঠি লিখেছে, ইংরেজিতে। একটা ভালো রকম জবাব লিখেছি, কারেক্ট করে দাও দেখি। বুদ্ধি তোমার যদিও কম, এম-এ বি-এলটা তো পাশ করেছ, পারা উচিত। ভুল থাকলে কিন্তু ধীরেনবাবু হাসবেন!'

বলিলাম 'মজুরি?'

'অগ্রিম চাই?'

'নিশ্চয়ই। যদি ফাঁকি দাও!'

কণ্ঠস্বর যে কণ্ঠেই বাস করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নইলে, ওষ্ঠে বাস করিলে গৃহিণীর এই পঁচিশ বৎসর বয়সের অধর সুধাই ঝাল লাগিত এবং ওষ্ঠ জ্বলিত।

বাহির হইতে ঝি বলিল, 'বাইরের ঘরে বাবুর জামা ত পেলুম না মা।' গৃহিণী আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, 'সদর দরজা বন্ধ ছিল দেখে এসেছিস?'

ঝি বলিল, 'নজর করিনি মা।'

'ইনজর করিসনি! ঘরে গেলি, একটা জামা খুঁজলি, আর তোর নজরে পড়লো না সদর দরজা খোলা কি বন্ধ! চোখ চেয়ে কাজ করিস? না, কাজ করবার সময় স্বপ্ন দেখিস? অবাক করলি বাছা! যা দেখে আয়।'

ঝি চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সদর দরজা খোলাই ছিল।

'বেশ! সেদিন এত টাকা খরচা ক'রে এমন সুন্দর সাদা ভায়েলার পাঞ্জাবিটা করিয়ে দিলুম, যাবেই তো।'

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, 'আমি একবার দেখে আসি।' বলিয়া নিচে নামিয়া গেলাম। আইনের কেতাবের পিছন হইতে জামাটা টানিতেই, খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই বোধহয়, কোথায় একটা পেরেক লুকাইয়া ছিল, জামা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। উহা লইয়াই উপরে গেলাম।

ঝি আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী বলিলেন, 'জামা যে পেলিনে, এটা কি?'

'দেখতে পাইনি মা।'

'তা দেখতে পাবি কেন! এমন ব্যাগাব ঠ্যালা কাজ করিস কেন বলতো? এটা কি ছুঁচ না আলপিন যে কোথায় লুকিয়ে ছিল খুঁজে পাসনি?'

ঝি চুপ করিয়া রহিল।

গৃহিণী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, ঝির দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন, 'তুই কাঁপছিস কেন রে?'

'শরীরটা ভালো লাগছে না মা।'

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আগাইয়া গিয়া তার কপালে হাত দিলেন। বলিলেন, 'ইস তাইতো! বেশ জ্বর হয়েছে যে! আচ্ছা তুই কি রকম মানুষ বলতো ঝি? জ্বর গায়ে কে তোকে কাজ করতে বলেছে? সন্ধেবেলা অতগুলো বাসন মাজলি তুই কোন্ আক্কেলে শুনি? একটা বাড়াবাড়ি অসুখ বাধিয়ে আমার দশটা টাকা খরচ

করবার মতলব, না ? যা যা শুয়ে পড়গে যা। অবাক্ মানুষ তুই বাছা !'
ঝি বলিল, 'ঠাঁইটা করে দিয়ে শুচ্ছি মা।'
'ফের মুখের ওপরে কথা বলে। কাল যদি তোকে দূর না করি তো—ভালো চাস তো শুয়ে পড়গে যা বাছা। কেন বকাছিস, অসুখ বাড়লে হাঙ্গামা তো আমাকেই পোয়াতে হবে !'
ঝি আর কথাটি না বলিয়া চলিয়া গেল।
গৃহিণী একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'দেখিগে শুলো কিনা। যে সব তোমার ঝি চাকর। একটা যদি কথা শোনে ?' বলিয়া চলিয়া গেলেন।
ফিরিয়া আসিয়া আমার জামাটা লইয়া আনলায় টাঙাইতে গিয়া গৃহিণী সেই দাগ ও ছেঁড়া দেখিতে পাইয়া বজ্রগর্ভ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিলেন।
দাগ ও ছেঁড়ার একটা কাল্পনিক ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছিলাম—'ওটা হয়েছিল কি জান ?—এই গিয়ে—'
সময় সৌভাগ্যক্রমে নিচে বন্ধু নীরদাবরণের কণ্ঠ শুনিলাম, 'ওহে ঘুমুলে নাকি ?'
'নীরু এসেছে। কি বলছে শুনে আসি।'…বলিয়া আমি চম্পট প্রদান করিলাম।
নয়টার সময় বন্ধুকে বিদায় দিয়া, দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে উপরে গিয়া দেখি গৃহিণী একমনে একটি চিঠি পড়িতেছেন। মুখের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।
নয়টার সময় আহার শেষ করিয়া আবার নিচে নামিলাম। অফিস ঘরে ঢুকিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া বসিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের তিন দিন হইল পত্র আসিয়াছে। পত্রে বহুদিন আমার কোনো পত্র না লেখার জন্য অনুযোগ আছে এবং গৃহিণীও সে পত্রখানা পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ করিয়া খামে ভরিয়া ঠিকানা লিখিতেছি, গৃহিণীর গলা কানে গেল, 'ভালো চাস তো উঠে আয় হরে, আমাকে রাগাস নে বলে দিচ্ছি ? খাবি না তো তুই বিকেলে বল্লি না কেন ? অত ভাত নষ্ট হবে ?'
হরের জবাব শোনা গেল, 'আমার অসুখ হয়েছে, আমি খাব না।'
গৃহিণী বলিলেন, 'সে সব আমি জানি। চাকরি করতে এসে ভাতের ওপর রাগ করিস তোর লজ্জা করে না হারামজাদা ? উঠে আয় বলছি !'
হরে বলিল, 'আমি খাব না।'
গৃহিণী, 'বেশ।' বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন এবং আমার অফিস ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।
ঠিকানার ওপরে ব্লটিং চাপা দিয়া বলিলাম, 'খাওয়া হয়েছে তোমার ?'
'হুঁ।'
'হরে বুঝি খেলে না ?'
ঝঙ্কার দিলেন, 'শুনতে পাওনা ? এতক্ষণ ধরে সাধছিলাম কাকে ?'
আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কথা বলাটা নিরাপদ নয়।

কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তুমি একবার হরেকে বল গে না!'
'আমি ? তুমি বলতে খেলে না, আর আমার কথা শুনবে ?'
চুপ করিয়া রহিলেন।
আমি বলিলাম, 'মরুক, নিজেরাই খিদের জ্বলায় জ্বলবে। একটা চাকর, তাকে আবার খোসামোদ করে খাওয়াতে হবে, ভারি তো! চল শোবে, রাত হল।'
'চল,' বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
শয়ন ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা একটা শেষ ধর্মের ডাক দিয়ে আসি। একটা লোক না খেয়ে থাকবে তাই, নইলে—' কথাটা শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।
আমি একটু হাসিয়া বারান্দায় রেলিঙের কাছে দাঁড়াইলাম।
গৃহিণীর শান্ত গলা শোনা গেল, 'হরে, লক্ষ্মী বাবা। উঠে এসে খেয়ে নে। মিথ্যে জ্বলাস কেন বল দেখি ?'
'আমার খিদে নেই, খাব না মা।'
'হরে!' কণ্ঠস্বর ঠিক কোন্ গ্রামের বলা শক্ত। কিন্তু অতি তীক্ষ্ন। এবং ভর্ৎসনা, ক্রোধ, সান্ত্বনা ইত্যাদি এতগুলি ভাব লইয়া ঐ একটি কথা উচ্চারিত হইল যে শুনিলে অবাক হইতে হয়।
হরিচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া আসিল।
গৃহিণী বলিলেন, 'রান্না ঘরে ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। কাল সকালে মাইনে নিয়ে তুমি বাবু বিদেয় হোয়ো। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাবে না।' বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। নিচের বারান্দায় আলোতে দেখিলাম হরিচরণ নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।
তিনি উপরে উঠিবার আগেই আমি ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপরে বসিলাম। তিনি আসিলে বলিলাম, 'খেলে' ?'
দরজায় খিল দিতে দিতে বলিলেন, 'হুঁ, খাবে না আবার। কাল কিন্তু ওকে দূর করবো।'
আমি বলিলাম, 'বেশ তো।'
পাশে বসিয়া বলিলেন, 'চিঠিটা কারেক্ট করেছ ?' কাল সকালের ডাকে যাওয়া চাই কিন্তু।'
বলিলাম, 'না'।
'কেন ? সময় হল না বুঝি ?'
গম্ভীর ভাবে বলিলাম, 'তুমি না ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে ? না, বিয়ের সময় ঐ কথা বলে আমাদের ঠকান হয়েছিল ? ম্যাট্রিক পাশ করেছ আর শুদ্ধ করে ইংরাজীতে একখানা চিঠি লিখতে পার না ?'
'কে বল্লে পারি না ? তবে, হঠাৎ যদি ভুল থাকে, চর্চা তো নেই। তাই তোমায় অনুরোধটা জানিয়েছিলুম—তা ঘাট হয়েছে। বিয়ের সময় তোমার মামা না কে

পুরো আধ ঘণ্টা ধরে ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন মনে নেই ?'

আমি হাসিয়া তাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, 'তাই নাকি ! তবে তো কথাই নেই । আচ্ছা দেবো কাল কারেক্ট করে ।'

আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আবার কাল ! তোমায় একটা কাজ করতে বল্লেই দশটা ওজোর কর । বেশি রাত হয় নি, পাঁচ মিনিটও লাগবে না, দাও না লক্ষ্মীটি এখুনি । কাল সকালের ডাকে পাঠিয়ে দেবো ।'

আদেশ প্রতিপালন করিলাম ।

পরদিন প্রাতে হরে আসিয়া বেতন ও বিদায় চাহিলে গৃহিণী তাহাকে শুধু মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন । সন্ধ্যায় ফিরিয়া দেখি আমার সেই চায়ের দাগ ধরা নূতন ফ্যানেলের পাঞ্জাবিটা হরে গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে । ছেঁড়া অংশটুকু গৃহিণী সেলাই করিয়া তাহাকে দিয়াছেন ।

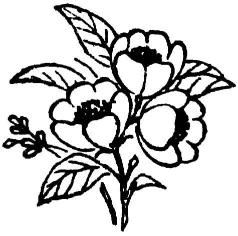

অপ্রিয়

শচীন দত্তের বাড়িতে চাকর টেকে না। মাইনে কম, খাওয়ার কষ্ট, পান থেকে চুন খসলে গালাগালি, সুতরাং চাকর টিকবে কেন! কেরানীর মতো ওদের চাকরি তো দুর্লভ নয়, লোকে ডেকে নিয়ে কাজ দেয়।

এক মাস কাজ করে দীনবন্ধুও পালাবার উপায় দেখল। নতুন মাসের দুই তারিখে সে এক পয়সা দিয়ে চারখানা চিঠির কাগজ কিনে ফেলল। আড্ডায় বসে আদালতের পিওনকে দিয়ে এই মর্মে পত্র লেখাল যে, দেশে তার বৌ মর মর, স্বামীকে যেতে লিখেছে সকাতরে।

চিঠি পড়ে শচীন দত্তের স্ত্রী বিমলা নাক সিটকে বললেন, 'মর মর তো চিঠি লিখলে কি করে শুনি?' সেজমেয়ে নন্দরাণী হেসে বলল, 'বজ্জাতি, নারে? তোর বৌ তোকে খামে চিঠি লেখে, ইস। কই দেখি বার করত খামটা?'

দীনবন্ধু বলল, 'খামটা ফেলে দিয়েছি আজ্ঞে। আর তেনা চিঠি লিখবে কেন, চিঠি লিখেছে আমার ভাই জগবন্ধু।'

দীনবন্ধুর পেটে অনেক বুদ্ধি।

বিমলা অনেকক্ষণ তানানানা ভাঁজলেন, শেষে বললেন, 'আচ্ছা যাস বাড়ি, কিন্তু লোক দিয়ে যেতে হবে বাছা। নইলে মাইনে পাবিনে।'

নন্দরাণী বলল, 'এই শীতে আমাকে দিয়ে বাসন মাজালে তোর কি হবে জানিস? গাড়িতে কলিসন হয়ে বাড়ির বদলে একেবারে স্বর্গে চলে যাবি।'

দীনবন্ধু আড্ডায় ফিরে বন্ধু বঙ্কুকে ধরল তাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। বিশেষ কিছু না, সে শুধু একবেলা শচীন দত্তের বাড়ি কাজ করে আসবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দীনবন্ধু বলবে, এই লোক দিলাম, দাও মাইনে। মাইনে নিয়ে সে সটকাবে, বঙ্কুও সে-বেলাটা খেটে পরদিন আর ওমুখো হবে না।

বঙ্কু ত্রিশ বছরের জোয়ান, কিন্তু তার মুখে একটা অসুস্থ বিমর্ষতার ছাপ। মাঝে মাঝে তার মাথার কল একেবারে বিগড়ে যায়। তখন সামান্য একটা কথা বুঝতে তার এত দেরি হয়, এমন ভাবে সে হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যে দেখলে মমতা হয়। মাথা যখন অনেকটা পরিষ্কার থাকে তখনও সে মুখ ভার করে একপাশে চুপচাপ বসে থাকে, সহসা কথা বলতে চায় না, তাস খেলায় যোগ দিতে আহ্বান করলে শুধু মাথা নাড়ে। দুপুর বেলা তেরো টাকার হারমোনিয়মের বেখাপ্পা আওয়াজের সঙ্গে দেড় টাকার তবলা পিটে আড্ডায় যখন

বিষম সঙ্গীত চর্চা হয়, বঙ্কু নির্লিপ্তের মতো একধারে পড়ে থাকে। সকলে বেশি রকম হৈ চৈ আরম্ভ করলে সে আড্ডা ছেড়ে চলে যায় এবং অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে আসে। বঙ্কুর জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, জীবনের কলরবের প্রতি ওর তাই বিরক্তি।

দীনবন্ধুর প্রস্তাবে অনেক কৌতুক ছিল, যারা শুনল সকলে হাসল—বিশেষ করে বিপিন দাস। বঙ্কু কোনো দিন হাসে না, সে শুধু স্বীকার করে বলল, আচ্ছা।'

বিমলা বললেন, 'এই নাকি তোর নতুন লোক? যে ফর্সা জামা-কাপড়, থাকলে হয় টিকে।'

দীনবন্ধু বলল, 'বাপরে, আমি দিয়ে যাচ্ছি টিকবে না?'

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

বঙ্কু বলল, 'বঙ্কু।'

'ব্লেঙ্কো? কি কালার? ব্রাউন না ব্ল্যাক?' বলে নন্দরাণী হাসল।

বঙ্কু বলল, 'ব্ল্যাক মানে কালো।'

নন্দরাণী অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তুমি ইংরেজী জানো?'

বঙ্কু বলল, 'বুক ফার্স্ট—হর্স মানে ঘোড়া, সোয়ান মানে হাঁস।'

শুনে নন্দরাণী রাগ করে সেখান থেকে চলে গেল। বঙ্কু এদিক ওদিক চেয়ে কলতলায় গিয়ে অঞ্জলি পেতে জল খেতে আরম্ভ করল। বিমলা মুখভার করে বললেন, 'ইঞ্জিরী জানা চাকর আমাদের দরকার নেই দীনু। তুই অন্য লোক দেখে দে। ব্যাটা মেয়ের মুখের ওপরে ইঞ্জিরী ঝেড়ে দিল।'

দীনবন্ধু বিপদগ্রস্ত হয়ে বলল, 'একটু পাগলাটে মা কিন্তু কাজ দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। কিছু খেতে চায় না, দু'মাস খেটে একমাসের মাইনে নেয়। মাসকাবারে মাইনে দিতে গেলে বলে আজ তো মাসের অর্ধেক এখন মাইনে নেব কেন?—মাথাটা একটু খারাপ। দু'টাকা কম দিলেও খুশি হয়ে কাজ করবে।'

বিমলা নরম হয়ে বললেন, 'কিন্তু পাগল-ছাগল লোক—'

দীনবন্ধু জিভ কাটল, 'পাগল কেন হবে মা, পাগল নয়। ছেলে বৌ মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন একটু হাবা মতো হয়ে গেছে, এই মাত্তর। অপঘাতে মরল কিনা ছেলে আর বৌটা, তাই—'

নন্দরাণী ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কিসের অপঘাতরে?'

দীনবন্ধু বলল, 'অপঘাত বৈকি আজ্ঞে। নদীর ধারে গ্রাম, বৌটাকে কুমীরে নিলে ছেলেটা মোলো জলে ডুবে। সে কি ছেলে দিদিমণি, যেন রাজপুত্তুর। সেদিন সন্ধে লেগেছে কি লাগেনি, মহাকাল ডাকলে, আয় বঙ্কুর বৌ, আয় বঙ্কুর ছেলে। মহাকালের ডাক, সাড়া না দিয়ে তো আর উপায় নেই, ছেলের হাত ধরে বৌটা জল আনতে গেল নদীতে। সেই যে গ্যালো দিদিমণি, আর ফিরে এল না। দেহ আমরাই খুঁজে পেলাম চরের মধ্যে এক গর্তে।'

নন্দরাণী বলল, 'সেই থেকে বঙ্কুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বুঝি ?'
'আজ্ঞে ! কিন্তু কোনো জুলুম নেই দিদিমণি, খুব ঠান্ডা। গাল দিলেও ফিরে কথাটি কয় না।'
'তবে মার খুব সুবিধে হবে' বলে নন্দরাণী হাসল।
মাইনে হস্তগত করে প্রস্থানের আগে দীনবন্ধু হেঁকে বলে গেল, 'ভালো করে কাজ করিস বঙ্কু, এমন মুনিব আর পাবি নে। দু'বেলা গিন্নিমার পায়ের ধুলো নিস।'
কলতলায় বাসন ছড়ানো ছিল, আদেশের অপেক্ষা না রেখেই বঙ্কু সেগুলি মাজতে আরম্ভ করেছিল, ফিরেও তাকাল না। উঠানে লিচু গাছের ব্যাপক ছায়া। এক পাশে চৌবাচ্চা ও কল, সেখানে পাতার ফাঁকের চিকরিকাটা আলোছায়ার আলপনা। নন্দরাণীর মনে হল নতুন চাকরটা যেন রোদ আর ছায়া দিয়ে বোনা চেক আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বাসন মাজতে বসেছে যার বৌকে খেয়েছে নদীর কুমীর, ছেলেকে খেয়েছে নদী নিজে।
—ওকে বেশি বকাবকি কোরো না মা। দুঃখী লোক।'
বিমলা চটলেন, 'আমি বুঝি খালি বকাবকি করি ?'
'কর না ? দীনবন্ধু পায়ের ধুলোর ঠাট্টা করে গেল কেন, ধরতে পার নি ? একটা পাগলকে দিয়ে ও মিছামিছি পালিয়েই বা গেল কেন তবে ? মিছামিছি নয় ? খামের চিঠি মা, খামের চিঠি ! দীনবন্ধুর বৌ খামে চিঠি লেখে।'
রান্নাঘর থেকে একটা এঁটো গেলাস নিয়ে নন্দরাণী কলতলায় গেল।
'এটা আগে মেজে দাও তো বঙ্কু।'
বঙ্কু থালা মাজা বন্ধ করল। আঙুল দিয়ে বাসনগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আগে ? ওগুলি মাজার আগে না সকলের আগে ?'
হাসির কথা, নন্দরাণী কিন্তু হাসল না। বলল, 'সকলের আগে। জল খাব কিনা, তাই।'
বঙ্কু একটু ভেবে বলল, 'এক মিনিট লাগবে।'
'লাগুক, তুমি মেজে দাও।'
বঙ্কু গেলাসটা মাজল, গেলাসের সঙ্গে হাতও ধুয়ে কল থেকে জল ভরে নন্দরাণীকে দিল। কি জানি কি ভেবে গম্ভীর মুখে বলল, 'নদীর জল খুব মিষ্টি, কলের জলে স্বাদ নেই। দেশে আমরা নদীর জল খাই।'
নন্দরাণীর মনে হল, সত্যই জলে স্বাদ নেই। তার আরও মনে হল, বঙ্কুর দেশের নদীর নাম যদি গঙ্গা হয়। তবে তো বঙ্কু তাকে হাতে করে যে জল দিল তার মধ্যে বঙ্কুর বৌয়ের সূক্ষ্মতম এক কণা রক্ত আর বঙ্কুর ছেলের তিল পরিমাণ প্রাণ মিশে ছিল। বঙ্কু তাকে কি খাওয়াল ? কি গিলে ফেলল সে ? জলটা অমন বিস্বাদ লাগল কেন ?
বঙ্কুর শোকার্ত উপস্থিতিটা স্নায়ুতে ঘা মারছিল, নন্দরাণীর মনে হল সত্যই কি

রকম একটা বিশ্রী বোটকা স্বাদ আটকে রয়েছে জিভে।

'তোমার দেশ কোথায় বঙ্কু ? গঙ্গার ধারে ?'

বঙ্কু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি করে জানলেন ?

আর কি করে জানলেন। নন্দরাণীর সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল, সে সেইখানেই বসে পেটের সব উগরে ফেলে দিতে আরম্ভ করল। শুধু জল নয় অবেলায় খাওয়া ডাল ভাত তরকারী। তার যতই মনে হতে লাগল সেগুলি কুমীরের ভুক্তাবশিষ্ট বঙ্কুর বৌয়ের পচা মাংস। ততই বমির ধমক বেড়ে গিয়ে নন্দরাণীর দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হল।

বঙ্কু হতভম্ব। জ্বর হয়ে তার বৌ একদিন এমনি ভাবে বমি করেছিল। কিন্তু এ তো তার বৌ নয়, এ তেমনি ভাবে বমি করে কেন ?

বিমলা ছুটে এলেন, বড় ছেলে সরোজ ছুটে এল, ছেলে মেয়ে যে যেখানে ছিল মুহূর্তে কলতলায় হাজির হয়ে গেল। সুস্থ হয়ে কলসীর জলে মুখ ধুয়ে নন্দ-রাণী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ এক সময় বালিশে মুখ গুঁজে সে বেজায় হাসতে আরম্ভ করে দিল। বিমলার কাছে খবর গেল নন্দরাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বিমলা এলেন—'ও রাণী কাঁদিস কেন ?'

নন্দরাণী হাসিমুখ বার করে বলল, 'কাঁদছি কই, হাসছি। ভূতে পেয়েছে ভাবছ ? হিস্টিরিয়া হয়েছে ? তা নয় মা। আমার নার্ভগুলি গোল্লায় গেছে—এক শিশি নার্ভটনিক কিনে দিও আমায়। নদীতে স্রোত থাকে সে কথাটা কি একবারও মনে হল ছাই। মিথ্যে বমি করে মরলাম। বঙ্কুর ছেলে বৌ এ্যাদ্দিনে সমুদ্রে পৌঁছে গেছে, কি বল মা ?...কে রে ?'

বঙ্কু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, এক গাল হেসে বলল, 'আমার বৌ বমি করে কাঁদত। একদিন'—নন্দরাণী ধমক দিয়ে বলল, 'যা চলে, এখান থেকে পাজী।'

বঙ্কু ধীরে ধীরে সরে গেল।

রাত্রি এগারটায় বঙ্কু আড্ডায় ফিরল। তিন জোড়া তৈলকৃষ্ণ তাসে বিন্তি কাবার হচ্ছে। বিপিন বাজারের দিকে গিয়েছিল, সে পুঁটির সম্বন্ধে গোপনীয় সংবাদ দিচ্ছে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন চাকরি করলি বঙ্কু ?'

বঙ্কু বলল, 'বেশ।'

দীনবন্ধু বলল, 'কাল যাস আমার সঙ্গে, বোস-বাবুদের বাড়ি চাকরি করিয়ে দেব।'

বঙ্কু বলল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু খুব ভোরে উঠে বঙ্কু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে দীনবন্ধু অবাক হয়ে গেল।

'কোথায় চলেছিস রে ?'

'কাজে যাচ্ছি। দিদিমণি খুব সকালে যেতে বলে দিয়েছে।'

'ওখানে তুই কাজ করবি নাকি ?'

'করব,' বলে বঙ্কু চলে গেল।

দীনবন্ধু সকলকে বলল, 'একদম ক্ষেপে গেছে। ব্যাগার খাটতে চলল ভূতের বাড়ি।'

বঙ্কু কাজ করে বেশ, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা কইলেই মুশ্কিল বেধে যায়। নিজে নিজে পনের মিনিটের মধ্যে সব মশলা বেটে ফেলে, কিন্তু হলুদটা আগে বেটে দিতে বললেই তার সব গোল পাকিয়ে যায়। প্রত্যেকটি হলুদ পাঁচ মিনিট ধরে কচলে কচলে ধোয়, বাটতে আরম্ভ করে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি সব ভাবতে থাকে, শেষে নন্দরাণীকে বলে, আমার বৌ খুব তাড়াতাড়ি হলুদ বাটতে পারত। আমার অনেকক্ষণ লাগে। বৌ কি করে হলুদ বাটত ভাবছি।......এমনি করে নোড়া ধরত ?'

দুমাসে এক মাসের মাইনে নেয়, তাও কম ; বিমলা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে চলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব কোথায় যাবে। তিনি বলেন, 'আ-মরণ। যেমন করে রোজ বাটিস তেমনি করে বাট্ না? রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস যে হাঁ করে ? ও জানে নাকি তোর বৌ কেমন করে নোড়া ধরত ?'

নন্দরাণী মাকে সরিয়ে দেয়, বলে, 'তুমি যাও মা এখান থেকে। তুমি মুখ ছোটালে এমন ভড়কে যাবে যে সারাদিনেও হলুদ বেটে উঠতে পারবে না।'

বঙ্কুকে বলে, 'আমি দেখিয়ে দেব বঙ্কু ?'

কথাটা বুঝতে বঙ্কুর সময় লাগে। বুঝে বলে, 'দেখি হাত ?'

নন্দরাণী হাত দেখায়। বঙ্কু মাথা নেড়ে বলে, 'নরম হাত ব্যথা হবে। আমার বৌ-এর হাত খুব শক্ত ছিল। একদিন এমন চড় মেরেছিল—'

'কাকে ?'

বঙ্কু অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, 'পাঁচুকে। পাঁচু ঘুরে পড়ে গিয়েছিল চড় খেয়ে। তারপর মা ব্যাটায় কি কান্না !'

নন্দরাণী বলে, 'চড় মেরে পাঁচুর মা কেঁদেছিল কেন ?'

অনেক ভেবেও বঙ্কু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, করুণ চোখে নন্দরাণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, নন্দরাণীর মনে হয় তার মনের ভেতরটা যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে—কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। এতবড় জোয়ান লোকটা নিজের মনের কুয়াশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু মশলা চাই, নইলে রান্না বন্ধ, নন্দরাণী বলে, 'তোমার দেরি হবে, আমায় দাও।'

এ যেন অন্যায় শাসন, এমনি মুখ করে বঙ্কু জোরে জোরে মশলা বাটতে আরম্ভ করে। নন্দরাণীর মনে হয় শিলটাই বুঝি সে ভেঙে ফেলবে।

চাকরকে ধমকোনো এ বাড়ির ছেলে বুড়োর ধাতস্থ, দিন কয়েক সংযত হয়ে চললেও

ক্রমেই সকলে নিজের মেজাজ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। অন্য সকলের চেয়ে বিমলাই বেশি কারণ তিনি বাড়ির গিন্নি বলে সর্বদা চাকরের সঙ্গে তাকেই কারবার করতে হয় এবং তাতে মেজাজ প্রকাশের সুযোগ অহরহ উপস্থিত থাকে। নন্দরাণী বঙ্কুকে ধমকায় না তা নয়, কিন্তু অন্য কাউকে সে বেশি ধমকাতে দেয় না। বঙ্কু যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার খুশি হলে সে বকবে, মারবে, কিন্তু অন্যে তা পারবে না, নন্দরাণীর মনোভাব কতকটা এই রকম। অন্য সকলে বঙ্কুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে নন্দরাণী রাগ করে কড়া কথা শুনিয়ে তাদের থামিয়ে দেয় মাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলে, 'একরকম মাগনার চাকর, ওকে কেন বক' বলত ? চলে গেলে ভালো হবে বুঝি ?' বিমলা চুপ করে থাকেন, কিন্তু রাগ হলে ফের বকেন। কিন্তু তার বকুনি গালাগালির রূপ নিতে পারে না, শুরুতেই নন্দরাণী থামিয়ে দেয়।

একদিন খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল বাধল। অল্প দুটি ভাত আর একটু ডাল ছাড়া বঙ্কুর জন্য সেদিন কিছুই ছিল না।

অন্য দিন নীরবে খেয়ে যায়, আজ বঙ্কু বলল, 'তরকারী কই ?'

বিমলা বলল, 'তরকারী নেই, ওই দিয়ে খা।'

বঙ্কু বলল, 'তবে আমায় দুধ দাও। নইলে খাব না।'

'তোকে উনুনের ছাই দেব। না খাস তো উঠে যা।'

কিন্তু বঙ্কু উঠেও গেল না, ভাতও খেল না, খালি মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'দুধ দাও। আরে, দাওনা দুধ। কি দিয়ে ভাত খাব ? দুধ দাও।'

তার মাথা নাড়ার রকম দেখে শঙ্কিত হয়ে বিমলা ডাকলেন, 'ও রাণী, দ্যাখসে বঙ্কু কেমন করছে।' নন্দরাণী এল।

'কি রে বজ্জাত ? বদমাসি হচ্ছে ? খা বলছি।'

'একটু দুধ দেবে না ? এক কড়ার দুধ কে খাবে ?'—বঙ্কুর স্বরটা অত্যন্ত করুণ।

নন্দরাণী বলল, 'তোকে কচু দেব। নবাবপুত্তুর কিনা, দুধ খেতে দেবে ওকে। ডাল দিয়ে খা।'

বঙ্কু নীরবে খেতে আরম্ভ করল। নন্দরাণী সগর্বে মার দিকে চেয়ে ঘরে চলে গেল। অর্থাৎ একটু ডাল তো আছে আমি ইচ্ছে করলে ওকে শুধু ভাত খাওয়াতে পারি।

বঙ্কু যে তার মুখের কথায় বাঁচে-মরে এর আনন্দে নন্দরাণী দিশেহারা।

বঙ্কুকে শাসন করে নন্দরাণী আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখল, বঙ্কু দরজার বাইরে চুপ করে বসে আছে।

সদয় হয়ে বলল, 'কিরে বঙ্কু।'

বঙ্কু বলল, 'আমার পেট ভরে নি।'

'আমি তার কি করব ? আড্ডায় গিয়ে খেয়ে আসগে যা। আমাকে জল দিয়ে যাস

এক গেলাস।'

জল দিতে ঘরে ঢুকে বঙ্কু আর বাইরে যেতে চায় না। নন্দরাণী বলল, 'যাবি না আড্ডায়?'

বঙ্কু মাথা নাড়ল। নন্দরাণী বলল, 'তবে আমার একটু পা টেপ।'

বিমলা রাগ করে বললেন, 'ওকে দিয়ে পা টেপাচ্ছিস যে? ওই জোয়ান মদ্দ—ধিঙ্গি মেয়ের যদি একটু বুদ্ধি সুদ্ধি থাকে।'

নন্দরাণী হেসে বলল, 'পাগল আর ছাগল সমান মা। ওর শরীরটাই বড়, মনের বয়স এক বছরও নয়। নইলে তোমার বাড়ি কাজ করে?'

নন্দরাণী মাকে এমনিভাবে খোঁটা দেয়। নিজে যেন বঙ্কুর প্রতি পরম দয়াবতী। কারো দয়া থাক বা না থাক বঙ্কু এ বাড়িতে কায়েমী হয়ে রয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে একথাটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে ধমক ছোট জিনিস, গালাগালি দিয়েও বঙ্কুকে তাড়ানো যায় না। মাইনে না পেয়ে আধপেটা খেয়েও সে ও-বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে।

নন্দরাণী হেসে বলে, 'পাগলের মর্জি। কিন্তু তাই বলে সবাই মিলে যে ওকে গাল দেবে তা হবে না কিন্তু।' বিমলা এ উপদেশের মর্যাদা রাখতে অস্বীকার করলেন। বালতির কানায় লাগিয়ে কাপড় ছেঁড়ার জন্য একদিন এমন গালাগালি করলেন যে নন্দরাণীকে খুঁজে বার করে বঙ্কু কেঁদেই অস্থির। বঙ্কু বোঝে নন্দ-রাণী তারই পক্ষে।

অতবড় মানুষটির কান্না দেখে নন্দরাণীর বিষম হাসি পেল। তাকে হাসতে দেখে কান্না থামিয়ে বঙ্কু ভীত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সরে গেল।

হাসি পাক, বঙ্কু তার উপরে নির্ভর করেছে এটুকু নন্দরাণী বোঝে। এর মর্যাদা রাখবার জন্য বঙ্কুর সামনে সে মাকে বলল, 'কেন অত বক? তোমার বড় বাড়া-বাড়ি মা!'

'বটে।' বিমলা পেটের মেয়ের মুখ-ঝামটা সইলেন না, সমান প্রত্যুত্তর দিলেন। ফলে মা মেয়ের রীতিমত ঝগড়া হয়ে গেল।

তার পক্ষ হয়ে নন্দরাণীকে লড়তে দেখে বঙ্কু ভারী খুশি। আনন্দে কেবল মাথা চালতে লাগল।

একদিন নন্দরাণী কলঘরে স্নান করছে। এমন সময় বঙ্কুর কান্ডে বিমলা একেবারে ক্ষেপে গেলেন। নন্দরাণীর আয়না চিরুনির সাহায্যে চুল আঁচড়াবার সখ বঙ্কুর কেন হয়েছিল বলা কঠিন, কিন্তু সে সখ যে জন্যই হোক আয়নাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ভালো করে মুখ দেখার সখ না চাপলে কোন গোল হত না। বঙ্কুর হাতে নন্দরাণীর ক্রিম মাখা, পিছলে পড়ে আয়নাটা ভেঙে গেল। বিমলা এমন গালা-গালি আরম্ভ করলেন যেন আয়নার শোকে আর্তনাদী মড়াকান্না জুড়েছেন।

বড় ছেলে সরোজ জানে কথার মারে মানুষ মরে না। সে বঙ্কুর গালে ঠাস করে

চাড়িয়ে দিল। বঙ্কু কাঁদ কাঁদ হয়ে কলঘরের সামনে গিয়ে জোরে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করল।

ভেতর থেকে নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমাকে দাদাবাবু মারছে!' বঙ্কুর স্বর কান্নায় ভেজা।

বঙ্কুর গলার আওয়াজ পেয়ে বিষম চটে নন্দরাণী ধমক দিল, 'যা এখান থেকে বজ্জাত কোথাকার।'

ওদিকে বিমলা হাঁকলেন, 'ও সরোজ, দ্যাখ হারামজাদার কান্ড?'

কান্ড দেখে সরোজের রক্ত মাথায় চড়ে গেল, বঙ্কুর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে এল একেবারে রাস্তায়।

'দূর হয়ে যা বজ্জাত কাঁহাকা!'

বিমলা বললেন, 'আহা তাড়িয়ে দিলি কেন একেবারে! তোর বড় রাগ সরোজ। যা ডেকে নিয়ে আয়। মাগনার চাকর মাগনা জোটে ভাবিস নাকি?'

'তুমি ডেকে আনগে।' বলে সরোজ দাড়ি কামাতে বসল।

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দরাণী সদরে গিয়ে পথের দু'দিকে উঁকি মেরে দেখল, কোথাও বঙ্কুর চিহ্ন নেই, সে চলে গেছে। রাগে মুখ কালো করে সে ভেতরে এল।

সরোজ বলল, 'যাক যাক, মরুক। স্নানের দরজা ঠ্যালে—ব্যাটা বজ্জাত।'

নন্দরাণী বলল, 'দু' ইঞ্চি পুরু দরজা, সেটা মনে রেখো দাদা। মাতব্বরি করা তোমার একটা অতি উৎকট স্বভাব। আমার বেরিয়ে আসার তর সইল না তোমার।'

'তুই এসে কি করতিস্ শুনি?'

'তোমায় বলতাম তাড়িয়ে দাও, না হয় মারো। বলতাম, কিছু বোলো না!' দুম-দাম পা ফেলে নন্দরাণী চলে গেল।

কিন্তু দেখা গেল এত সামান্য কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো মন্দ চাকর বঙ্কু নয়। ঘণ্টাখানেক পরে সে কোথা থেকে এসে নীরবে এঁটো বাসন কুড়োতে আরম্ভ করল আর মাঝে মাঝে ভীত চোখে তাকাতে লাগল নন্দরাণীর দিকে। এই এক ঘণ্টায় তার মস্তিষ্ক এইটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে যে, নন্দরাণীর স্নানের সময় কলঘরের দরজা ঠেলা অপরাধ।

সরোজ হেসে বলল, 'দেখলি?'

নন্দরাণী বলল, 'তুমি ভাবছ ও মান অপমান বোঝে না? বলব চলে যেতে?'

সরোজ বলল. 'থাক। তুই বললে হয় তো চলে যাবে।'

নন্দরাণী সগর্বে হেসে বলল, 'মানুষ বশ করতে জানা চাই দাদা। শুধু বকলেই হয় না।'

সে যেন অনেক চেষ্টায় অনেক তপস্যায় বঙ্কুকে বশ করেছে। বঙ্কুর বশ্যতা স্বীকারে বিধাতার কোনই হাত নেই; সবটুকু কৃতিত্ব তারই।

বাইরের চৌবাচ্চায় বঙ্কু কাপড় ধোয়, খানিক পরে ছাড়া কাপড় আনতে কল ঘরে ঢুকে সে আর বেরিয়ে আসার নাম করে না। বিমলা বলেন, 'তোর সাবান মাখছে হয় তো মুখে, রাণী।'

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কলঘরে গেল। দেখল, বঙ্কু সকলের কাপড় বালতিতে তুলে তার উপরে শাড়িটা দিয়ে মুখ মুছছে।

'ও কি হচ্ছে বঙ্কু?'

বঙ্কু তাড়তাড়ি শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভীত চোখে চেয়ে রইল।

নন্দরাণী বলল, 'ভয়ানক বজ্জাত তো তুই। আমার কাপড়ে মুখ মুছছিস কেন?'

বঙ্কুর মুখে কথা নেই।

বঙ্কুর বুদ্ধির জড়তা ক্রমেই কেটে গেল। কাজটা প্রকৃতির, কিন্তু তাতে নন্দরাণীর অজ্ঞাত প্রভাব কি একটুও ছিল না? অবশ্য চাকরের বুদ্ধির জট খুলবার ধৈর্য ও ইচ্ছা নন্দরাণীর থাকার কথা নয়। বঙ্কুকে সে পছন্দ করত শুধু এই জন্য যে, বঙ্কু নিজেকে বাড়ির মধ্যে বিশেষ করে তারই চাকর করে রেখেছিল। সে যেন নন্দরাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার নন্দরাণীর আছে। মুখের কথা খসা মাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, ব'কে কাঁদানো যায়, মিষ্টি কথায় খুশি করা চলে, এমন একান্ত নির্ভরশীল মানুষকে কে না পছন্দ করে?

কিন্তু ব কুর সহজ বুদ্ধি ফিরে আসার সঙ্গে চারদিকে গোল বাধতে লাগল। বঙ্কুর বিশেষত্ব লোপ পেয়ে এল, তার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে একজন পূর্ণ মানবের মধ্যে শিশুর প্রাণ দেখে এবং সেটা এক শোচনীয় ফল বলে জেনে, তাকে আর অন্যান্য চাকরদের চেয়ে পৃথক করে দেখার আর কোনো কারণ রইল না। তার উপর বঙ্কু নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝে নিতে শিখল এবং একদিন ন' মাসের বাকী মাইনে এক সঙ্গে দাবী করে বসে সকলকে ক্রুদ্ধ ও চমকিত করে দিল।

বিনা পয়সার নন্দরাণীর কেনা গোলাম হয়ে থাকতেও তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। তার নির্ভরশীলতা গেল শোচনীয় ভাবে কমে। কেউ ধমকালে সে একা নিজের হয়ে নিজেই লড়াই করে, নন্দরাণীর মুখ চেয়ে থাকে না। নন্দরাণী অন্যায় হুকুম করলে সে গম্ভীর মুখে জানায়, সে অন্য কাজ করছে। নন্দরাণীর জুলুমে বিরক্ত হয়ে এক এক সময় ফোঁস করে ওঠে।

একটা রাজ্য যেন হাত ছাড়া হয়ে গেছে, নন্দরাণীর এরকম জ্বালা বোধহয়। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু যে রাজ্য সে নিজের চেষ্টায় জয় করে নি, একবার হারিয়ে নিজের চেষ্টাতেই আবার সে রাজ্য জয় করবে কি করে। সে রাগ চেপে অনুযোগের সুরে বলে, 'তুই আজকাল আর আমার কথা শুনিস না বঙ্কু।'

বঙ্কু বলে, 'যে সব অন্যায় কথা, কি করে শুনি। মশলা বাটছি, হুকুম দিলে ঘর

ঝাঁট দিয়ে যা—একটা মানুষ তো আমি।'

'তবে তুই দূর হয়ে যা এ বাড়ি থেকে।'

'মাইনে চুকিয়ে দাও, এখুনি যাচ্ছি,' বলে বঙ্কু রেগে চলে যায়।

শেষে একদিন নন্দরাণীর সঙ্গে ঝগড়া করে মাইনে না নিয়ে বঙ্কু চলে গেল। বলে গেল, 'আমার মাইনের টাকায় তুমি হার গড়িয়ো দিদি।' একথা শুনে সরোজ তাকে মারতে উঠেছিল, কিন্তু বঙ্কুকে রুখে দাঁড়াতে দেখে গায়ে হাত তোলা আর সঙ্গত বিবেচনা করে নি।

দু'দিন পরে সকাল বেলা কিন্তু বঙ্কু ফিরে এল। নন্দরাণী তখন দাঁত মাজছে। বঙ্কু ম্লান হেসে বলল, 'নতুন লোক রেখেছো নাকি দিদিমণি?'

'যদি রেখে থাকি?'

'তাকে ছাড়িয়ে আমায় রাখতে হবে। তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাইনে চাইনে আমি।' কথাটার কদর্থ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে নন্দরাণী উঠে চলে গেল। মাকে গিয়ে বলল, 'শুনছো মা, আমায় ছেড়ে থাকতে না পেরে বঙ্কু ফিরে এসেছে। মাইনে ও নেবে না।'

বিমলা বললেন, 'বেশ তো পাগলের কথায় তুই রাগ করেছিস নাকি?'

নন্দরাণী মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ও পাগল? দেখগে ওর ঘরে আমার শাড়ি আমার চুল আমার জুতো এইসব জড়ো করা আছে। হারামজাদাকে রোজ পা টিপতে দিতাম, ঘুমিয়েও পড়তাম এক একদিন···মাগো!'

'আহা, কি যে সব বলিস!' বলে বিমলা কার্যান্তরে গেলেন।

নন্দরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, তারপর কাকে যে মুখ ভ্যাংচালে অন্তর্যামী জানেন।

পরের বছর বৈশাখ মাসে নন্দরাণীর বিয়ে হল এক দোজপক্ষ মুন্সেফের সঙ্গে। বিয়ের তিন মাস পরেই সে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল বহরমপুরে।

ঠিক এক মাস পরে বঙ্কু সেখানে গিয়ে হাজির।

নন্দরাণী বললে, 'কিরে বঙ্কু?'

বঙ্কু বলল, 'মা বড় বকে, তাই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমায় রাখবে দিদিমণি? আমি মাইনে নেব না।' নন্দরাণীর কোলে স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে, গায়ে একরাশি গয়না, পরনে দামী কাপড়, সিঁথিতে চওড়া সিন্দুর। তার চাল অতি ভারিক্কী—গিন্নির মতো এবং বেমানান! সে বলল, 'তা বেশ তো, থাক না।'

মুন্সেফ শুনে বললেন, 'আরে না মাইনে দেব বৈকি! খাটবে মাইনে দেব না—ছি!'

নন্দরাণী বলল, 'তোর মাইনে আমার কাছে জমা থাকবে, কি বলিস বঙ্কু?'

বঙ্কু বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর দিন কেটেছে মাস কেটেছে অনেকগুলি। নন্দরাণীর ঘর ভরা ছেলেমেয়ে,

সে বেজায় মোটা হয়ে পড়েছে। বঙ্কু এখনো তার কাছে চাকরি করে—বিনা পয়সায় গোলামী। তার মাথার মধ্যে কোনও গোল নেই, কিন্তু নন্দরাণীর উপর তার আগের মতই নির্ভরতা, নন্দরাণীর মুখের কথায় তার মরণ-বাঁচন।

কুড়ি বছরের মাইনে জমা, মুন্সেফ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেন, 'বঙ্কু যদি এখন সব মাইনে চেয়ে বসে রাণী, তোমায় আমি বিক্রি করব।'

নন্দরাণী হাসে, তারপর নিজের মোটা শরীরটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। গড়ানো চাকা গড়িয়েই চলবে অবশ্য, কিন্তু তবু ভয় করে। চুল পাকতে দাঁত পড়তে আর বাকী কত!

বঙ্কুর কিন্তু চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা।

খুকী

যার ভালো নাম কাদম্বিনী তার ডাক নাম সাধারণত হয় কাদু অথবা কাদি। দশ বছর বয়স পর্যন্ত কাদম্বিনী তার ভালো নামের এই দু'রকম ভাঙা সংস্করণেই সাড়া দিত। তারপর হঠাৎ একদিন সে সাড়া দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবাদ নয়, রাগ করাও নয়, ডাক নাম দুটি যে সে পছন্দ করে না সে কথা ঘোষণা করা নয়, একেবারে সাড়া না দেওয়ার অসহযোগ। 'কাদু! ও কাদু! ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল, শুনতে পাস না? এই কাদি!'

কে সাড়া দিবে? এ বাড়িতে কাদুও কেউ নাই, কাদিও কেউ নাই।

সেই হইতে তাকে খুকী বলিয়া ডাকা হয়। প্রথম প্রথম লোকের মনে থাকিত না, পুরানো নামে তাকে ডাকিয়া বসিত। কাদম্বিনী ভুলিয়াও সাড়া দিত না। নাম যেন তার ছেলেমানুষীর চেয়েও বড় ছিল—নিত্য ব্যবহার্য তুচ্ছ ডাক নাম। এখন, ষোল বছর বয়সে (সতর হওয়া আশ্চর্য নয়, আঠারও হইতে পারে) খুকী নামটাও সে পছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু একজন মানুষ আর কতবার সামান্য ডাক নামের জন্য চুপচাপ গোলমাল বাধাইতে পারে? বুড়ো বয়সে সেটা ভালও দেখায় না। তাছাড়া, এ বাড়ির বাস সাঙ্গ হইতেই বা তাব কত দেরি। ছ' মাস এক বছরের জন্য অত হাঙ্গামা করা হাঙ্গামার অপচয়।

রঙ একটু ময়লা কাদম্বিনীর, মুখখানাও দেখিতে তেমন সুশ্রী নয়, তবে দেহের গঠনটি তার সুঠাম। এক কথায় বোঝান যায় না এ রকম। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে সচরাচর চোখে পড়ে না এরকমও বটে। এটা রূপের পর্যায়ভুক্ত নয়। মেয়েদের যে রূপ ভদ্রলোকদেব চোখে পড়ে সেটা থাকে তাদের মুখে আর চামড়ায়—চামড়াতেই বেশী। জ: মানোর আগে ভৌতিক আত্মারা সত্যম শিবম সুন্দরমের জ্যোতিতে অন্ধ হইয়া থাকে—নয়তো কালা আদমি আর মেয়েদের 'ফর্সা কর, ফর্সা কর', আবেদনের কোলাহলে জন্মদাতার কান কালা হইয়া যাইত। মেয়েদের স্বাস্থ্যও অনুমোদনযোগ্য, ভদ্র রকমের রোগবিহীন হৃষ্টপুষ্টতা। গঠন আর স্বাস্থ্য আলাদা। শরীর ভালো থাকা স্বাস্থ্য, গঠন—? সম্ভবতঃ সেটা শরীরের বজ্জাতি, কারণ বজ্জাত লোক ছাড়া ওটা আর কারও দ্রষ্টব্য নয়।

কাদম্বিনীর বাবা ডাক্তার অসমঞ্জ রক্ষিত কিছুদিন হইতে মেয়েদের ভালো ভালো ছেলের বাপ দাদা খুড়ো জ্যেঠা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির সামনে হাজির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে লক্ষ্য ছিল উঁচু, আশা মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায়

কিনা। কিন্তু সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা এত ঠান্ডা আর ভদ্র আর মার্জিত-দৃষ্টিসম্পন্ন যে কাদম্বিনী ঘরে ঢোকামাত্র বিতৃষ্ণায় তাদের যেন মাথা গরম হইয়া ওঠে, একটা প্রাগৈতিহাসিক অভদ্রতায় অপমান বোধহয়, ফাটা চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া তাকানোর মতো দু'চোখে ধারালো রেখার সূক্ষ্ম পীড়ন শুরু হয়। দোষটা বাড়ির লোকের। তারা কাদম্বিনীকে না সাজানোর আধুনিক ফ্যাসানে সাজায়। শাড়ীর প্যাঁচে, এলোচুলের ঔদ্ধত্যে এবং আরও কতকগুলি খুঁটিনাটিতে কাদম্বিনীর বৈশিষ্ট্য হয়। চৌকাঠ পার হইয়া কয়েক পা হাঁটিয়া কাদম্বিনীকে বসিতে হয়। তার সেই চলন ও বসিবায় ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় পুকুরে যেন একটি সমুদ্রের ঢেউ আসিয়াছে।

কাদম্বিনীর মুখের একটি সম্পদ এই উপযুক্ততার পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরিণত হয় তার একটি অতিরিক্ত বিপদে। মুখে শিশুসুলভ সরলতার ছাপ। অজানা দর্শকদের সন্দিগ্ধ মনে এটা তার মৌখিক অভিনয়ের মতো খাপছাড়া ঠেকে, কাদম্বিনীকে তারা ফেলিয়া দেয় বর্ণচোরা আমের পর্যায়ে। মুখের কচিত্ব পাকামির আবরণ, চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি প্রবঞ্চনার কৌশল।

বাস্তবতার ভারে সকলের আশাও সুতরাং নুইতে নুইতে এখন মাটি ছুঁইয়াছে। কেরানী, স্কুল মাস্টার দ্বিতীয়পক্ষ প্রভৃতি স্তর। জীবনের সংস্করণের সবগুলি ভূমিকায় মমতার ভাবপ্রবণতা সার্থক করিতে চাহিলে চলিবে কেন ? তাই, এবার কাদম্বিনীকে একজনের পছন্দ হওয়ার পর বাড়ির লোক হাসিলও না, কাঁদিলও না।

কাদম্বিনী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে মধ্যস্থ ব্যবহার করিলে গোলমালও বেশি হয়, সময়ও নষ্ট হয়। তার চেয়ে সব কলকাঠি যার হাতে সোজাসুজি তার কাছে যাওয়াই ভালো। যতই হোক, সে তার বাপেরই আদুরে মেয়ে। লোকে আহ্লাদী পর্যন্তও তো বলিতে ছাড়ে না।

অসমঞ্জ রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিলেন। কাদম্বিনী গিয়া বলিল, 'একটু পরে রোগী দেখতে যাও বাবা। আমার একটা দরকারী কথা শুনে যাও।'

মেয়ের দরকারী কথা শুনিয়া অসমঞ্জ থতমত খাইয়া গেলেন। মাথামুন্ডু কি যে বলিস ঠিক নেই। চিঠির জবাব দেব না। পছন্দ করে চিঠি লিখেছে, জবাব দেব না কেন ?'

'লোক ভালো নয় বাবা।'

'লোক ভালো নয়। তুই কি করে জানলি লোক ভালো নয় ?'

বাপের মুখের উপর একথার জবাব দেওয়ার মতো বেহায়া বা আহ্লাদি বা সরলা বা খুকী মেয়ে কাদম্বিনী নয়। মধ্যস্থ শেষ পর্যন্ত তাকে মানিতেই হইল। কৈফিয়ৎ সে দিল পিসতুতো দিদি শান্তিলতার কাছে।

লোকটি ভারি বদ শান্তিদি। বিচ্ছিরি ক'রে তাকাচ্ছিল।'

বিচ্ছিরি ক'রে তাকাচ্ছিল মানে কি ভাই খুকী ? তুই কি ওর তাকানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলি ? তাকানি দেখে কি ক'রেই বা বুঝলি সে বদ লোক ?'

শান্তিলতা সাতবছরের পুরনো বৌ, কিন্তু সুখ অথবা দুঃখের বিষয়, তার শ্বশুর-বাড়ি নাই। স্বামী তার এত কম রোজগার করে যে এ বাড়ির সকলকেই তার খাতির করিয়া চলিতে হয়। এমন শিথিল, তামাসা-বর্জিতা, কথা-শোনা, মন-রাখা মেয়ে সে, যে, বৌদির চেয়ে তার কাছেই মনের কথা বলা সহজ।

'বিচ্ছিরি চেহারা, বিচ্ছিরি তাকানি, গরীবের একশেষে ; ওকে আমি—'

শান্তিলতা মীমাংসিত সমস্যায় স্বস্তি বোধ করিল।

'তাই বল্ তোর পছন্দ হয় নি ! গরীব তো নয় ভাই খুকী ? একশো বারো টাকা না কত মাইনে পায় যে !

'পাক্। ওর সঙ্গে যদি আমার ইয়ে হয় আমি তাহলে গলায় দড়ি দেব, নয় বিষ খাব, নয় কাপড়ে আগুন ধরিয়ে—'

শান্তিলতার কাছে মাসে মাসে একশো বারো টাকা অনেক, অনেক। কাদম্বিনীর অপছন্দ, সজল চোখ আর সাংঘাতিক নভেলি কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। এমন বোকা ছেলেমানুষ সরল মেয়ে না হইলে কারো মুখ এমন কচি খুকীর মতো হয়.? 'ছি ভাই খুকী, এসব কথা কি বলতে আছে ?'

কি বলতে আছে আর কি বলিতে নাই সেটা নির্ভর করে যে বলে তার বুদ্ধি বিবেচনার উপরে। কাদম্বিনী চোখ পাকাইয়া বলিল, 'ছি ? ছি, শান্তিদি ? তোমরা আমায় ধরে বেঁধে—'

কথা শেষ না করিয়া কাদম্বিনীরে ঢোক গেলার রকমে শান্তিলতার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ধরে বেঁধে নয় খুকী। ক'দিন থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে, এক জায়গায় বিয়ে তো হওয়া চাই ? এ সম্বন্ধ মন্দ কি, একশো বারো টাকা—'

'রাখো তোমার একশো বারো টাকা।'

'উনি বলছিলেন—কাল মাথা ধরে আমার ঘুম আসে নি কিনা তাই অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে কথাবার্তা বলছিলাম—উনি বলছিলেন, এখানে বিয়ে হ'লে খুকী খুব সুখী হবে। বি-এ পাশ, একশো বারো টাকা মাইনে—'

কাদম্বিনী হাই তুলিয়া বলিল, 'আমি কিছু শুনতে চাই না শান্তিদি। আমি কি ফেল্না যে একটা বি-এ পাশ হাড়গিলে—একশো বারো টাকায় কি হয় মানুষের !'

সৌম্য নামে যার জন্যে এই বিদ্রোহ সে-ও কম হাড়গিলে নয়, এবং ছ'মাস ওকালতি করিয়া বারোটা টাকাও সে রোজগার করিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার বাবার এত টাকা আছে যে তিনি ভয়ানক কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও সৌম্য সিল্কের পাঞ্জাবী গায় দেয় আর একটা সিগারেট ফুঁকিয়াই প্রায় তিনটা পয়সা ধোঁয়া করিয়া উড়াইয়া দেয়। মাঝে মাঝে অসমঞ্জের মধ্যবিত্ত সংসারের বিশৃঙ্খল আবর্তের মাঝখানে

আসিয়া হাজির হয় এবং অকৃত্রিম প্রসন্নতার সঙ্গে আগাগোড়া ঘরের ছেলের মতো ব্যবহার করিয়া যায়। বড়লোকের ছেলের এই অনুগ্রহ এখনো এ বাড়ির লোক সময় সময় বিশেষভাবে উপভোগ করে। কারণ, অনেকদিন হইতে ঘরের ছেলের মতো ব্যবহার করিয়া গেলেও বড়লোকের ছেলে চিরকাল বড়লোকেরই ছেলে।

কাদম্বিনীর সতর আঠার বছর ধরিয়া বড় হওয়ার ফলাফল প্রথম যেদিন একসঙ্গে সৌম্যের চোখে পড়িল, সেদিন সকালে তার বড় মাথা ধরিয়াছিল এবং এ্যাসপিরিন গিয়াছিল ফুরাইয়া। দু'কাপ চা খাইয়াও মাথা ধরা না কমায় বেলা প্রায় সাড়ে ন'টার সময় সে গেল অসমঞ্জবাবুর বাড়ি। কাদম্বিনীকে দেখিয়া মাথা ধরা কমানোর জন্য নয়, এ্যাস্পিরিনের জন্য। চাকরকে পাঠাইয়া দিলেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঔষধটা আসিত, তবু সে যে নিজেই কেন গেল তার কোনো কারণ নাই। এ রকম কারণ-বিহীন তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া বড় বড় ওলোটপালট ঘটে বলিয়া অনেকে একে বলে ভবিতব্যতা। সেটা সংগত নয়। কারণ, আজ সৌম্যের মাথা না ধরিলে, বাড়িতে এ্যাস্পিরিন থাকিলে অথবা চাকরকে এ্যাস্পিরিন আনিতে পাঠাইলেও দু'দিন পরে যে কাদম্বিনীর দিকে তার চোখ পড়িত না তার কোনো প্রমাণ নাই। সে তো অন্ধ নয়। বড় বড় চোখ আছে তার।

অসমঞ্জবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। বাহিরের ডিস্পেনসারী হইতে ওষুধ সংগ্রহ করিয়া সৌম্য ভিতরে গেল, কাদম্বিনীকে ডাকিয়া হুকুম দিল, খুকী, জল দে তো আমাকে এক গ্লাস, ওষুধ খাব।

কাদম্বিনীর দুই দাদা অফিস, এক ভাগ্নে কলেজ, ও আরও দুই ভাই স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় একসঙ্গেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংসারের আবর্ত এখন চরমে উঠিয়াছে সত্য, তবু সৌম্যের হুকুম অনেকগুলি প্রতিধ্বনি তুলিল। রান্নাঘর হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি ওষুধ খাইবে, স্বামীর কাপড় গামছা হাতে সামনে দিয়া যাইতে যাইতে একটু দাঁড়াইয়া বড়বৌ বলিল—সর্দির জন্য মাথা ধরিয়া থাকিলে সে ইউক্যালিপটাস শুঁকুক না, আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে টাঙানো আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে মেজদাদা মন্তব্য করিল যে মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যায়, এত ওষুধপত্র খাওয়া কি জন্যে।

কাঁচের গেলাসে জল আনিয়া দিয়া একটু হাসিয়াকাদম্বিনী বলিল, 'আবার মাথা ধরেছে? কি বিচ্ছিরি মাথাটা তোমার!'

এই হাসি আর মন্তব্যের পরে তার পরিচিত খেয়াল করিয়া ঝিমানো ভাব কাটিয়া গিয়া সৌম্য যেন হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। একটা বিশেষ বয়সেই শুধু মেয়েরা ঠোঁটের নতুন পাওয়া খেলনার মতো এই হাসিকে লইয়া খেলা করে, নূতন শেখা গানের মতো মুখে সব সময় শোনা যায় এই কথা, এই সুর। কাদম্বিনী যে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে সে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বুড়ো ধাড়ী পাকা

ঝানু মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, এ জগতে তার যে আর কিছুই জানিতে বুঝিতে অনুভব ও কল্পনা করিতে বাকি নাই, এতদিন যে তার জীবনের আসল সমারোহ শুরু হইয়াছে—এটা তার ঘোষণা মাত্র। কাঁচা আমে প্রথম রঙ ধারার মতো—বর্ণ-চোরা আম ছাড়া, এ সংকেত কাদম্বিনীর ব্যক্তিগত মৌলিক সম্পত্তি নয়, একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কাদম্বিনীর সর্বাঙ্গে ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী স্থূল ও সূক্ষ্ম ঘোষণা অনেক আসিয়াছে। তবু, এ্যাস্পিরিনের বড়ি দু'টো গিলিয়ে সৌম্য খানিকক্ষণ এমনভাবে শুধু কাদম্বিনীর মুখখানাই দেখিল যে তার হাসিটা গেল মিলাইয়া। তখন সৌম্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল সম্পূর্ণ কাদ-ম্বিনীকে।

কাদম্বিনী একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, 'রাগ হ'ল নাকি? সত্যি খুব মাথা ধরেছে?'

সৌম্য বলিল, 'টন টন করছে মাথাটা।'

কাদম্বিনী বিজ্ঞের মতো নির্ভয়ে হুকুম দিল, 'আজ আর কোর্টে গিয়ে কাজ নেই তবে।'

একটিমাত্র, নিশ্বাস ফেলিবার অবসরটুকুর আগে ভয়ে এবং পরে নির্ভয়ে কাদ-ম্বিনীকে কথা বলিতে শুনিয়া সৌম্যের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু ভাবিয়া সে বলিল, 'না, কোর্টে যাব না।'

কাদম্বিনী খুশি হইয়া বিজ্ঞতা বিসর্জন দিয়া আবার একটু হাসিল।

'মক্কেল আসে না একটা, কেন যে রোজ কোর্টে যাও! চুপচাপ শুয়ে থাকো খানিক-ক্ষণ, মাথা ধরা সেরে যাবে।'

সৌম্য হাসিয়া বলিল, 'সকালবেলা শোব কিরে খুকী, এইতো উঠলাম সারা রাত শুয়ে থেকে।'

'সকাল বেলা মাথা ধরাতে পার, শুতে পারবে না? ডাক্তারের মেয়ে আমি, আমার পরামর্শ শোন সমুদা, ওপরে গিয়ে শুয়ে থাক। ওপরে কেউ নেই, চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারবে। চলো তোমাকে বিছানা পেতে দিচ্ছি।'

চুপচাপ শুইয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার লোভ সৌম্যের জীবনে কখনো এ বাড়িতে আসে নাই, নিজের বাড়িতে এ সুযোগ তার দুর্লভ নয়। এ বাড়ির চেয়ে তার নিজের বাড়িতেই বরং লোকের ভিড় কম। লোভের ও লাভের হিসাব বাদ দিলেও এ সময় কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতলায় গেলে অনেকেই তা লক্ষ করিবে এবং কারণ জানিতে চাহিবে। ওষুধ খাওয়ার জন্য কাদম্বিনীর কাছে জল চাওয়ায় সকলের মধ্যে যে কৌতূহল জাগিয়াছিল মাথা ধরার কৈফিয়তে তা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক শ' গজ দূরে নিজের বাড়িতে গিয়া শোয়ার বদলে কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতলায় শুইতে যাওয়ার কৈফিয়ৎ হিসাবেও ওটা সকলে গ্রহণ করিবে বটে কিন্তু কে জানে কারো মনে মৃদু একটু খুঁতখুঁতানি জাগিবে কি না, কেউ ভাবিবে কিনা এটা তার কাদম্বিনীকে দোতলায় লইয়া যাওয়ার ছলনা মাত্র।

এক মুহূর্ত ভাবিয়া সৌম্য গলা নামাইয়া বলিল, 'তুই একবার ওঘরে যা তো খুকী, ভাঁড়ার ঘরে।'
কাদম্বিনী আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন?'
'যা বলছি, শোন। যা।'
একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাদম্বিনী ভাঁড়ার ঘরে চলিয়া গেল। সব বুঝিবার বয়স তার হইয়াছে বটে, সৌম্যের আজকের হেঁয়ালি বুঝিবার ক্ষমতা তার নাই। পেট মোটা কাঁচের জারের ঢাকনি খুলিয়া এক খাবলা আচার লইয়া সে খাইতে আরম্ভ করিল। বাবু মশায় তো হুকুম দিলেন এ ঘরে আসিবার, এখন সে করিবে কি? হাসিবে? না, কাঁদিবে?
কাজের ফাঁকে বড়বৌ ইতিমধ্যে সৌম্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।
'কাল বিকেলে আমারও যা মাথা ধরেছিল ভাই সমু ঠাকুরপো, কি আর বলব। উনি তো ভেবেই অস্থির, এডিকলোন-টলোন কত কি যে দিলেন ঠিক নেই। ক'-বার হাঁচলাম রাত্রে, তাতে উনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন। সকালে উঠেই দেখি ভীষণ সর্দি হয়েছে। ইউক্যালিপটাস শুঁকে শুঁকে একটু অরাম পাচ্ছি। শুঁকবে?'
ধরা মাথাটা নাড়িয়া সৌম্য বলিল, 'না, আমার সর্দি হয় নি।'
দাড়ি কামানো সাঙ্গ করিয়া কাদম্বিনীর মেজ ভাই ভূপেন কাছে আসিল। বলিল, 'তোর এত মাথা ধরে কেন রে?'
সৌম্য বলিল, 'কি জানি। কাল সারা রাত ঘুমোই নি। এমন বিশ্রী লাগছে শরীরটা। ভাবছি কোর্টে না গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি।'
'তাই থাক, খানিকক্ষণ ঘুমোলেই হয়তো কমে যাবে।'
সৌম্য চিন্তিত মুখে বলিল, 'নিজের বুদ্ধিতে এ্যাস্‌পিরিন খেলাম, কি রকম যেন করছে শরীরটা। জ্বর আসছে কিনা বুঝতে পারছি না।'
ভূপেন চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তবে এক কাজ কর এখানেই শুয়ে থাক, বাবা ফিরলে বাবাকে দেখাস্—তাড়াতাড়ি কামাতে গিয়ে গলাটা কতখানি কেটেছে দেখেছিস?'
সৌম্য বলিল, 'টিনচার আইডিন দে। ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি, কি বলিস? একটা বিছানা—'
ভূপেন হাঁকিয়া বলিল, 'খুকী, ও খুকী, সমুকে একটা বিছানা ঠিক করে দিয়ে আয় তো ওপরে। কোথায় গেলি তুই খুকী?'
ভাঁড়ার ঘরে অভাবনীয় ভাবনায় বিব্রতা কাদম্বিনী হাতের সবখানি আচার মুখে গুঁজিয়া মুখের ভাবনার কুঞ্চনগুলি ঘুচাইয়া বাহিরে আসিল। কলতলায় হাত ধুইয়া সে দোতলায় গেল সৌম্যের সঙ্গে। ভূপেনের ছোট ঘরে ভূপেনের বিছানা পাতিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়েছিলে কেন বলত?'

সৌম্য বলিল, 'মুখে কি ভরেছিস ফেলে দে খুকী।'

কাদম্বিনী বাহিরে গিয়া মুখ খালি করিয়া আসিল। সৌম্য শুইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া বলিল, 'একটু সবুর সইল না, বিছানাটা ঝেড়ে দিতাম ?'

সৌম্য বিছানার প্রান্তটা নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বোস খুকী, এইখানে বোস।'

কাদম্বিনী বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'বসিবার কি সময় আছে নাকি আমার ? সবাই ওদিকে খেতে বসেছে, কাজ নেই ? একশোবার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, জবাব দিচ্ছ না কেন ? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমাকে ভাড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলে কেন ? মেজদার কি গলা বাবা ! তোমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দিতে বলবে, তাও পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বলা চাই ! আমি যেন কালা !'

কাদম্বিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল। সৌম্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'তোকে ভাঁড়ার ঘরে কেন যেতে বলেছিলাম বুঝতে পারিস নি খুকী ? সতি কথা বলিস। যদি বুঝতে পেরে থাকিস্ এখুনি বাড়ি চলে যাব।'

কাদম্বিনী দু'চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'কি বুঝতে পারি নি ? কি বলছ তুমি ? তোমার আজ হয়েছে কি বল তো ?'

'মাথা ধরেছে।'

মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কাদম্বিনীর ডান হাতখানা নিজের কপালে রাখিয়া সৌম্য চোখ বুজিল। কাদম্বিনীর হাতের তালুতে এখনো আচারের গন্ধ লাগিয়া আছে। হাতে ছাড়া ছাড়া মৃদু কম্পনের আবির্ভাব ঘটামাত্র সৌম্য তা টের পাইল। এবার হাতে টান পড়িবে অনুমান করিয়া আরও জোরে সে হাতের তালু চাপিয়া ধরিল কপালে। কিন্তু দেখা গেল, টানাটানি কাদম্বিনী পছন্দ করে না।

'মাথা টিপে দেব ?'

'না।'

'আমি তবে নিচে যাই, মা ডাকছে।'

সৌম্য তা জানে, চিরকাল মা'ই সকলকে ডাকিয়া থাকে। কাদম্বিনী উঠিয়া দাঁড়ানোয় তার আচারের গন্ধমাখা হাতটি সৌম্যের ছাড়িয়া দিতে হইল। চোখ মেলিয়া সে দেখিতে পাইল কাঁচা আমে প্রথম রঙ ধরার মতো মৃদু একটু রঙের আভাস কাদম্বিনীর মুখে দেখা দিয়াছে এবং জগতের সেরা অভিনেত্রীর মতো সে নিজেই যেন পরিণত হইয়া গিয়াছে নির্বাক বিস্ময় ও প্রশ্নে। তবে অভিনয় নয় বলিয়া এরকম যে হইয়াছে, এমন ভাবে, যে দেখিলে মায়া হয়।

সৌম্য মৃদুস্বরে বলিল, 'মা কেন ডাকছে শুনে আমাকে একটু আচার এনে দিবি খুকী ?'

কাদম্বিনী বলিল, 'জ্বর আসছে, আচার খেতে হবে না। সারা রাত ঘুম হয় নি, ঘুমোও না একটু ?' বলিয়া সে চলিয়া গেল নিচে। খানিক পরে একটা চায়ের কাপে খানিকটা আচার ও ছোট একটি চামচ আনিয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আচার খাবে শুনে মা যা বকছে সমুদা। মেজদা বললে, একটু কুইনিন মিশিয়ে দিতে, একটুখানি দিয়েছি। চার গ্রেনের বেশী নয়, সত্যি বলছি। টেরও পাবে না।'

সৌম্য উঠিয়া বসিল। দু'আঙুলে একটু আচার তুলিয়া মাখাইয়া দিল কাদম্বিনীর ঠোঁটে। তারপর কাপে অত আচার থাকিতে চাখিতে গেল তার ঠোঁটের হাসি-মাখানো আচারটুকু। হাসি অবশ্য কাদম্বিনীর মিলাইয়া গেল তৎক্ষণাৎ এবং একটি ভয়ার্ত কপোতীর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য রহিল না। কিন্তু কি করিবে সে? সে তো ছেলেমানুষ আর সৌম্য তার কাছে চিরদিন দেবতার সমান। তা ছাড়া, তার জন্য বর খোঁজ হইতেছে, সৌম্য যদি তাকে বিবাহ করা ঠিক করিয়া থাকে সে তো ভালোই। সুখের কথা। সৌম্যের সঙ্গে একা একা সিনেমায় যাইতে তখন আর কোনো বাধাই থাকিবে না। দিন রাত যত খুশি গল্প করিতে পারিবে সৌম্যের সঙ্গে। কাদম্বিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সৌম্য বলিল, 'কাঁদছিস কেন?'

কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'কাঁদছি না তো।'

সৌম্য খুশি হইয়া ভাবিল যে এ যদি আর কেউ হইত, তবে নিশ্চয় এরকম সরল জবাব দিত না, বলিত, চোখে আচার লাগিয়াছে। সত্য সত্যই চোখে আচার অথবা খোঁচা না লাগিলে সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার চোখে জলই যে আসিত না, একথাটা সৌম্যের আর মনে পড়িল না।

তারপর যে দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, সৌম্যের কাছে না হোক কাদম্বিনীর কাছে সেগুলি হইয়া রহিল অতুলনীয়। বিরহের দিনগুলি পর্যন্ত। অন্ততঃ দেখা হইলেই সৌম্যের কাছে কাদম্বিনী দু'একবার তাই ঘোষণা করে এবং সৌম্য অবিশ্বাস করে না। এতকালের জানাশোনা মেয়েটার সম্বন্ধে সে একটা নূতন কথা জানিয়াছে। তার অভিজ্ঞতায় সরলতার হিসাবে কাদম্বিনীই আদর্শ বালিকা। কারণ, সরলতার সঙ্গে চিরদিন যে বোকামি সে মিশিয়া থাকিতে দেখিয়াছে কাদম্বিনীর মধ্যে সে তা খুঁজিয়া পায় না। ধারালো বুদ্ধি তার নাই, চালাক মেয়ে সে নয়। সৌম্য তা জানে। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া আর কোনো বোকামির পরিচয়ই সে দেয় না। তার যে কথা ও কাজে সৌম্যের হাসি পায় সেগুলি সে বলে ও করে না-বলা ও না-করার প্রয়োজন সে জানে না বলিয়া, মস্তিষ্কের ওজন তার কম বলিয়া নয়। যা কিছু তাকে একবার বুঝাইয়া বলা যায় চোখের পলকে সে তা বুঝিতে পারে। এমন কি, পুরুষ ও নারীর প্রেম সংক্রান্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি পর্যন্ত সে এত সহজে আয়ত্ত করিয়া ফেলে এবং ও-বিষয়ে এমন চমকপ্রদ মন্তব্য করে যে সময় সময় সৌম্যের মনে হয় সে বুঝি খনাকে বরাহের গণনা শিখাইতে যাওয়ার মতো স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছে।

'মনে মনে হাসছিস, না খুকী?'

'হাসছি? কি বলছ তুমি পাগলের মতো? তুমি যখন এসব কথা বুঝিয়ে বলো,

আমার তখন—তখন—যাও বলব না তোমাকে।'

সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে। কাদম্বিনীর এই কথাগুলির মধ্যেই সে তার বোকামির অভাব ও সরলতার প্রমাণ খুঁজিয়া পায়। মনে মনে হাসছিস, না খুকী? এই আকস্মিক প্রশ্নের মানে বুঝিতে বোকা মেয়ের সময় লাগিত, কেন মনে মনে হাসিবে কয়েকবার একথা জিজ্ঞাসা করিত এবং শেষ পর্যন্ত হয় তো সৌম্যকেই বুঝাইয়া বলিতে হইত যে কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতে এক ধরনের নীরস অমার্জিত হৃদয়হীন মানুষ মনে মনে হাসিয়া থাকে, পার্থিব লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া জীবনে যারা আর কোনো হিসাব জানে না। প্রশ্ন শোনামাত্র মানে বুঝিয়া কাদম্বিনী রাগিয়া তাকে বলিয়াছে পাগল, কিন্তু তার মুখে ভাল-বাসার কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে হাসার বদলে তার মানসিক অবস্থাটা কি রকম হয় বুঝাইয়া বলার মতো শব্দ খুঁজিয়া না পাইয়া, হয় তো যে দু'একটি শব্দ মনে আসিয়াছিল লজ্জায় সেগুলি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, মেয়েদের চিরন্তন অধিকার খাটাইয়া এ অক্ষমতা গোপন করিয়াছে। যাও বলব না তোমাকে। কি মিষ্টি অভিমান, কি মধুর ছলনা। সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটা হইলে পুরা তিন মিনিট বক্তৃতা দিত, যার মানে বুঝিতে মন নয়, অভিমান খুঁজিতে হইত সৌম্যকে। ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতে চায় না। দু'এক মাস নয়, কাদম্বিনীকে তার অনেক দিন ভালো লাগিবে, হয়তো একেবারে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত। গায়ে হলুদের আগের দিন কাদম্বিনীর কাছে সে গ্রহণ করিবে শেষ বিদায়। পর দিন ট্রেনের কামরায় বসিয়া সে যখন বাংলার বাহিরে মাঠ বন গাছপালার বিস্ময়কর বিপরীত গতি দেখিতে থাকিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে কাদম্বিনী তখন গায়ে মাখিবে হলুদ। নিজে মাখিবে না, সকলে মাখাইয়া দিবে।

'আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুই খুব কাঁদবি, না খুকী?'

'আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, না খোকা?

এ ধরনের তামাসা সৌম্যের বিশেষ ভালো লাগে না। এই যা একটু দোষ আছে কাদম্বিনীর, স্নায়ুগুলি তার বড় সতেজ, মরার কথাতেও সে কাবু হয় না, মুখে হাত চাপা দিয়ে সভয়ে বলে, না, ওকথা বলতে নেই! একটা দুর্বোধ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ জাগে সৌম্যের মধ্যে, কাদম্বিনী যেন বড় বেশি হাসি খুশি, বড় বেশি আনন্দময়ী। তার ছেলেমানুষী ও সরলতার তুলনায় ভাবপ্রবণতা যেন বড় কম। হাসি তামাসা, কথা কাটাকাটি, ভিত্তিহীন আনন্দের পিরামিড বানানো এসব সে এত ভালবাসে বলিবার নয়। কে জানে সময় আসিলে ও কি ভাবে ভাঙিয়া পড়িবে, সামান্য কারণে যে এত আনন্দ পায়, অত বড় আঘাতে কি প্রচণ্ড হইবে তার বেদনা? কালীঘাটের গলাকাটা ছাগশিশুর মতোই বোধহয় ছটফট করিবে। চোখের সামনে বড় হওয়ার দাবিতে তার স্নেহ আর মমতা যার প্রাপ্য, তার মতো

প্রেমপিপাসু পাষণ্ডের হাত হইতে যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য, তার জীবনে এরকম ভয়ঙ্কর দুঃখের সম্ভাবনা বোধহয় না আনাই তার উচিত ছিল। একটু অনুতাপ বোধ করে সৌম্য, কাছাকাছি কাদম্বিনীর বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চাহিয়া সব মেয়ের মতো ওকেও সে নিবিড় জোরালো মমতার সঙ্গে ভালবাসে। এই রকম স্বভাব সৌম্যের, এই রকম বাধ্য তার কোমল হৃদয়ের কোমলতর প্রেম। মনে আবেগ আসিবামাত্র হৃদয়ে প্রেমের বন্যা দেখা দেয়। আবেগটা বাদ দিয়া, প্রেমের বন্যায় ভাটা ফেলিয়া, ভালবাসাটা চিরস্থায়ী করিবার সময় আসিলেই কাদম্বিনীকে আর যে তার ভালো লাগিবে না, এমন কি, কাঁচা আমের কাঁচ শাঁস-টুকুর মতো তিতোই হয়তো লাগিবে, সেকথা সৌম্যের আর মনে থাকে না। আদরে আদরে কাদম্বিনীর সে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দেয়।

তবু কাদম্বিনী মরে না, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আনন্দে গদগদ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তার নিশ্চিত বিশ্বাসে সৌম্য পর্যন্ত অবাক হইয়া যায়। যত কাঁচা হোক, যত সরল হোক, যত বিশ্বাসী হোক, যত প্রবল প্রেম জাগিয়া থাক তার বুকে, আত্মরক্ষার কয়েকটি মূলমন্ত্র বারো বছরের মেয়েও যে জানে। লোকনিন্দা আছে, আত্মীয় স্বজনের ভয় আছে, আগামী কালের হিসাব আছে, গোপনে গোপনে ভাঙা ভাঙা ছেলেখেলাকে প্রকাশ্য ও একটানা লীলাখেলায় পরিণত করার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, আরও আছে কত কিছু—কাদম্বিনী যেন এ সমস্তের ধার ধারে না। সৌম্য যা বলিবে যা করিবে, তাই সই। ফলাফলের দায়িত্বটা যে অন্ততঃ সৌম্যের থাকা উচিত, এ দাবিও যেন সে করিবে না। তিনতলার ছাদ হইতে নিজের ইচ্ছায় উঠোনে ঝাঁপাইয়া পড়ার মতো তার আত্মসমর্পণের হিসাব নাই, বিবেচনা নাই, না মরিবার ইচ্ছা নাই—মরণের আতঙ্ক পর্যন্ত যেন নাই। তার ঝাঁপ দিবার কথা, সে ঝাঁপ দিয়াছে। সৌম্যকে সে ভালবাসে, ব্যাস, সেইখানেই সব হিসাব-নিকাশের ইতি, তার পর আর কিছু নাই।

আঠারো বছর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর এ জিনিসটা কোনো মেয়ের মধ্যে থাকা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অসম্ভব। এদেরও যে নরকে দেওয়া চলে না তা নয়। কিন্তু প্রথমে যাত্রা করিতে হয় স্বর্গের দিকে, সত্যের আবরণে অনেক মিথ্যাকে সামনে ধরিতে হয়, অনেক ভুলাইয়া ভুল করাকে করিয়া তুলিতে হয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যের মতো গ্রহণীয়, বাস্তবতার তুলি দিয়া সমস্ত ভবিষ্যতকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া করিতে হয় তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরবর্তী জীবনের মতো লোভনীয়, —আর প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া দিতে হয় আশ্বাস, জাগাইতে হয় বিশ্বাস। আটাশ বৎসর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর সৌম্য এ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, এর মধ্যে ফাঁকি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কাদম্বিনী যেন তার হাতে একখানা শিশুপাঠ্য রূপকথার বই তুলিয়া দিয়াছে, খবরের কাগজে পড়া বিদ্যায় যা বোঝা যায় না, দিনের পর দিন কাদম্বিনী যেন তাকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়াছে যে, যেমন দিয়া সে

সংগ্রহ করিয়াছে তার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান সে মনটাও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তার চেয়ে যিনি ঢের বেশী চালক এবং বর্তমানের দেড়শো কোটি খানেক মন ছাড়াও তিনি অতীতের অগুন্তি মন তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের অগুন্তি মনগুলিও সৃষ্টি করিবেন ; মন দিয়া মন জানার কাজটা অত সহজ নয়।

সৌম্য বলে, 'আমি কি রকম খারাপ লোক, জানিস খুকী ?'

কাদম্বিনী বলে, 'জানি।'

'কি করে জানলি ?'

'ও সব আমরা জানতে পারি। কচি খুকী তো আর নই আমি।'

কাদম্বিনী হাসে। তার সহজ আত্মবিশ্বাস ও গর্ব দেখিয়া সত্য সত্যই মনে হয় কচি খুকী বোধহয় সে নয়। জয় যেন সেই করিয়াছে সৌম্যকে এবং সৌম্য যে তার কাছে ধরা দিবে এ বিষয়ে কোনোদিন তার এতটুকু সন্দেহও ছিল না। আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে সৌম্য একটু হাসে। এই রকম মনে করে মেয়েরা, মনে করে কিছু না করিয়াও তারাই করিয়াছে সব, সৌম্যদের বুকে ভালবাসা জাগাইয়াছে তারা, সৌম্যদের আপন করিয়াছে তারা, সৌম্যদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে তারা। এই ভালবাসার ব্যাপার যদি হয় কবিতা, তবে তারা এ কবিতার প্রেরণা। সৌম্যরা তো শুধু কাগজে কলমে কবিতাটা লেখার কাজটুকু করে। সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে কাদম্বিনীর অবিশ্বাস্য নিশ্চিন্ত ভাব ও অন্ধ আত্মসমর্পণের একটা কারণ যেন সে আবিষ্কার করিতে পারে। তাকে জয় করিয়া নিজেকে কাদম্বিনী এত দামী মনে করিয়াছে, এমন আকাশস্পর্শী আত্মবিশ্বাস তার আসিয়াছে যে ভবিষ্যতের কথাটা মনে আনাও সে আর দরকারী মনে করে না। দু'চার দিন পরে যা ঘটিবেই সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিয়া কি হইবে ? তবে একটা খটকা লাগিয়া থাকে সৌম্যের মনে। এই জল্পনা কল্পনা, দু'জনের একত্র গ্রথিত জীবন সম্বন্ধেতার সঙ্গে গভীর বিস্তারিত আলোচনা কাদম্বিনীকে সীমাহীন আনন্দ দেওয়ার কথা। এ আনন্দ সে কামনা করে না কেন ? কিসে তার এই অস্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়াছে ?

কাদম্বিনী কাছে থাকিলে নয়, নিজের ঘরে একা থাকিবার সময় ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের বড় রাগ হয়। একটা তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে, তার সম্বন্ধে এত ভাবনারই বা কি দরকার ? ও তো আর তার নিজের জীবনের সমস্যা নয়।

একদিন কাদম্বিনীর বড়দাদার বৌ সৌম্যকে বলিল, 'আমার যেন কি হয়েছে ভাই সমু ঠাকুরপো, খালি অসুখে ভুগছি, আজ মাথা ধরছে, কাল জ্বরভাব হচ্ছে, একটা কিছু লেগেই আছে আমার। এমন ভয় পেয়ে গেছেন উনি '—ভেবে ভেবে শেষে ওঁর আবার কিছু না হয়। শীগগির আমাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবেন বলেছেন।'

সৌম্য বলিল, 'ভালই তো। কবে যাবেন ?'
বড়বৌ বলিল, 'জেমসেদপুর থেকে খুকীকে দেখতে আসবে, নয় তো কবে নিয়ে যেতেন।'
'খুকীকে দেখতে আসবে নাকি ?'
'ওমা তুমি জাননা ভাই সমু ঠাকুরপো ? কি আশ্চর্য! ছেলে ওখানে কি যেন কাজ করে, আড়াইশো টাকা মাইনে পায়, বাপ হচ্ছে সাবজজ্ এখন পেন্সন নিয়েছে। পক্ষঘাত না কি হয়েছে বাপটা উঠতে পারে না বিছানা থেকে, ছেলে তাই নিজে বন্ধুর সঙ্গে খুকীকে দেখতে আসবে।'
'চিঠি এসেছে কবে ?'
'কাল।—ওমা তাইতো, তুমি তবে কি ক'রে জানবে ? অসুখে ভুগে ভুগে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ভাই সমু ঠাকুরপো।'
দিন তিনেক পরে ঘণ্টা তিনেকের জন্য কাদম্বিনীকে কাছে পাওয়া গেল বটে, কাদম্বিনী কিন্তু আপনা হইতে সাবজজ পুত্রের দেখিতে আসার কথাটা উল্লেখও করিল না! দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সৌম্যই শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জেম-সেদপুর থেকে তাকে দেখতে আসবে, না ?'
কাদম্বিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।
'আসবে। বেশ মজা হবে, না ?'
মজা হইবে! কাদম্বিনীর নির্ভয় নিশ্চিন্ত কৌতুকোজ্জ্বল মুখখনা দেখিতে দেখিতে সৌম্যের মনে হইল সে যেন ম্যাজিক দেখিতেছে। কি হবে এবার ?—বলিয়া যার কাঁদ কাঁদ হওয়া উচিত ছিল এ ব্যাপারটা তার কাছে শুধু মজা!
'যদি তোকে পছন্দ করে ?'
'যদি কি ? আমাকে পছন্দ করবে না, ইস্!'
সৌমা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তামাসা রাখ খুকী। তোকে দেখে যদি পছন্দ হয়, বিয়ের সব ঠিক হয়ে যায়, কি করবি তখন ?'
কাদম্বিনী দু'হাতে খোঁপা ঠিক করিতে করিতে বলিল, 'আমি আবার কি করব ?'
সৌম্য তার গাম্ভীর্যকে আরও গম্ভীর করিয়া বলিল, 'কিন্তু তুই তো জানিস খুকী বিয়ে টিয়ে আমি করতে পারব না ? তোকে যেদিন বিয়ে করব সেই দিন তোর জন্যে আমার সমস্ত ভালবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে। তুই তো জানিস আমি তা সইতে পারব না।'
কাদম্বিনী সহজ ভাবেই বলিল, 'দুবা'র জানিস বললে। কি করে জানব আমি ? কোনো দিন বলেছ ?'
'বলিনি ?'—সৌম্য যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।
'কবে বললে ? বিয়ে করলেই ভালবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে কেন বল তো শুনি।'
সৌম্য বলিল, পাঁচ মিনিটে তার নিজের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য জটিল যুক্তি তর্ক

বিশ্লেষণ দিয়া এমনভাবে কথাটা প্রমাণ করিয়া দিল যে কাদম্বিনীর আর বলিবার কিছুই রহিল না। সে তাই শুধু একটু হাসিল, বলিল, 'নাও, তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না। সবাইর আসবার সময় হল, এবার আমি পালাই।'

সৌম্য ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'চালাকি করিনি খুকী। সত্যি তোকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'আচ্ছা সে হবে'খন।'

বলিয়া কাদম্বিনী চলিয়া যায়, সৌম্য তাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল।

'আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

কাদম্বিনী বলিল, 'হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে মানুষের লাগে।—তোমার মতলব আমি বুঝেছি মশায়—একটু ঝগড়া করতে চাও তো ? আরেকদিন হবে, আজ সময় নেই।'

সৌম্য বলিল, 'তুই বড় ছেলেমানুষ খুকী, বড় বোকা তুই। কিন্তু তোকে আমি বলে রাখছি পরে যে আমায় দোষ দিবি তা হবে না, বিয়ে আমি কাউকে করব না।'

কাদম্বিনী সরলভাবে বলিল, 'একথা প্রথমে বলনি কেন ?'

সৌম্য বলিল, 'বিয়ে করব তাও তো বলিনি। প্রথমে বলিনি বলেই তুই আমাকে জোর করে বিয়ে করাবি নাকি তোকে ?'

রাগে সৌম্যের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। এখনও ভাবনা নাই কাদম্বিনীর, এখনও তার মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া যাইতেছে না! অন্য মেয়ে হইলে আতঙ্কে এতক্ষণ যে আধমরা হইয়া যাইত। কিন্তু তার শেষ কথাটা কাদম্বিনী যেভাবে গ্রহণ করিল, রাগের বদলে সৌম্য তাতে একেবারে থ বনিয়া গেল। কাদম্বিনীও যে রাগিতে জানে আজ সে তা টের পাইল প্রথম।

মুখ লাল করিয়া কাদম্বিনী বলিল, 'দ্যাখো শোন বলি তোমাকে, মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যা শুনলে মানুষের গা জ্বলে যায়। তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে পায়ে ধরে সেধেছি তোমার? ও, ভারি তো মানুষ তুমি! তুমি বিয়ে না করলে আমার যেন বর জুটবে না!'

কাদম্বিনী তো চলিয়া গেল গট গট করিয়া, বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া সৌম্য অনেকক্ষণ থ বনিয়া রহিল। কাদম্বিনীর রাগটা আশ্চর্য নয় কিন্তু এমন রাগ! —আজ পর্যন্ত যে একদিনও রাগ করে নাই? তা ছাড়া, কান্নাবিহীন, অভিমান-বিহীন এ কোন্‌দেশী রাগ ছেলেমানুষ মেয়েটার? কথাগুলি শেষ করিয়াও তো অন্ততঃ একটু তার কাঁদা উচিত ছিল। এ যেন সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার রাগ। শুধু রাগ—নিছক অবিমিশ্র রাগ। এক ফোঁটা অনুরাগও যেন কারো জন্য তার নাই।

সাত দিন পরে জামসেদপুরের পাত্রটি সবন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিল। পাত্রের মেয়ে পছন্দ হইলে মামা আসিয়া আর একবার দেখিয়া যাইবে। তারপর হইবে পাকা কথা।

এই সাত দিনের মধ্যে সৌম্য শুধু একদিন কিছুক্ষণের জন্য অসমঞ্জবাবুর বাড়ি গিয়াছিল। এক ফাঁকে কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'সেদিন হঠাৎ অত রেগে গেলি কেন রে খুকী ?'

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'রাগ হয়েছিল তাই।'

'পরশু তোকে দেখতে আসবে, না ?'

'হ্যাঁ। খুব হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার ? বাবাকে বল না গিয়ে, এখখুনি বাবা ওদের টেলিগ্রাম ক'রে আসতে বারণ করে দেবে।'

সৌম্য ম্লান মুখে বলিয়াছিল, 'সত্যি হিংসে হচ্ছে। কিন্তু জানিস তো, বিয়ে আমি কোনোদিন করব না।'

কাদম্বিনী বলিল, 'তা না করলে, আমাকে দোষ দিও না কিন্তু শেষে। ওদের দেখতে আসা বন্ধ করার উপায় বলে দিলাম।'

পাকা মেয়ের কত কথা। সৌম্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখ আর চোখ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। কাদম্বিনীর মতো সরল কাঁচা ঘরোয়া মেয়ের মুখে চোখে সে কি পাকামি খুঁজিয়া পাইবে ?

তারপর সৌম্য বড় বৌকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। 'ক'দিন থেকে খুকীর কি হয়েছে বলুন তো বৌদি ? সব সময় মুখ ম্লান করে থাকে কেন ?'

বড়বৌ বলিয়াছিল, 'কই আমি তো মুখ ম্লান করে থাকতে দেখি নি ভাই সমু ঠাকুপো ? দেখবো কি, নিজেদের অসুখ নিয়েই সব সময় যা বিব্রত হয়ে থাকি। বেশ হাসিখুশিই তো দেখি ভাই সমু ঠাকুরপো ?'

তিনটি বন্ধুর সঙ্গে ছেলে মেয়ে দেখিতে আসিল বিকালের দিকে। গায়ে একটা হাল্কা সিল্কের পাঞ্জাবি চাপাইয়া প্রসাধনের সময় মুখে ক্রীম মাখার মতো একটা হাল্কা অবহেলার মতো ভাব মুখে ফুটাইয়া রাখিয়া সৌম্য তার আগেই এ বাড়িতে হাজির হইয়াছিল। একবার অন্দরে পাক দিয়া আসিয়া সে দক্ষিণের বড় ঘরখানায় আগন্তুকদের মধ্যে গিয়া বসিল। ছেলে আর তার বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলিয়া আলাপও করিল। ছেলের নাম দিব্যেন্দু, দেখিতে ভালই। তবে একটু রোগা আর লাজুক। পড়িতে পড়িতে মেরুদণ্ডটা একটু বাঁকাইয়া যে সব ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তাদের মতো !

কাদম্বিনী আসিয়া খোলা জানালার সামনে বসিল, আলোতে তাকে যাতে ভালো করিয়া দেখা যায়। তিন জোড়া অপরিচিত চোখ তাকে খুব ভলো করিয়াই দেখিল, কেবল যার দেখাটা ছিল সব চেয়ে দরকারী সে এক সেকেণ্ডর জন্য দেখিয়াই পুরো এক মিনিট কাল নামাইয়া রাখিতে লাগিল চোখ। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল কাদম্বিনীকে, ইংরাজী বাংলা লেখানো হইল তাকে দিয়া, তার সূচীকর্ম দেখানো হইল, হারমোনিয়াম বাজাইয়া সিকি খানা এবং এস্রাজে খানিকটা গজল সুরে সে সকলকে শুনাইয়া দিল। লজ্জা ভয় ও নম্রতার যে মধুর মুখোশ পরিয়া কাদম্বিনী

ধীর পদে ঢুকিয়াছিল এত কাণ্ডের পরে আবার তেমনি ধীর পদে অন্দরে ফিরিয়া যাওয়ার সময়েও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই দেখিয়া সৌম্যের মনে হইতে লাগিল, পানের বদলে সে বুঝি শুধু খয়ের চিবাইতেছে। আগাগোড়া কাদম্বিনীকে সে অবাক হইয়া লক্ষ করিয়াছে। চার মাস ধরিয়া সে যাকে ভালবাসিয়াছে তার সামনে কাদম্বিনীর মতো মেয়ে যে চারজন অপরিচিত যুবকের কাছে এমন নিখুঁত ভাবে নিজেকে দেখাইতে পারে এ অভিজ্ঞতা সৌম্যের ছিল না। এ কি অভিনয় ? হে ভগবান, এ কি অভিনয় তার কাদম্বিনীর? কিংবা তার চারমাসের প্রেমটাই তার কাছে কিছুই নয়, প্রতিদিনকার ডাল ভাত খাওয়া, সাজগোজ করার মতো তুচ্ছ ? তাই সে চার মাস তার সঙ্গে ভালবাসার খেলা না খেলিলেও যেমন ভাবে নিজেকে দেখাইতে পারিত, আজও অবিকল তেমনি ভাবে দেখাইয়া যাইতে পারিল। এমন একটা রেখা সে কাদম্বিনীর মুখে দেখিতে পাইল না, এমন একটি ভঙ্গি তার চোখে পড়িল না যার মধ্যে গত চার মাসের একটি মিনিটকে সে খুঁজিয়া পায়।

কিছু বুঝিতে পারে না সৌম্য। বাড়ি ফিরিয়া সে ছটফট করিতে থাকে। ওমিল-লাইন কেশতৈলের অতি ক্ষীণ একটি গন্ধ যেন সে অনুভব করিতে পারে। মাথা ঘুরিতে থাকে সৌম্যের, গা বমি বমি করে। একি সম্ভব ? কাদম্বিনীর প্রকৃতির সঙ্গে একি খাপ খায় ? সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটাও তো ছ'মাস পরে হঠাৎ তাকে দেখিয়া একটু পাংশু হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সকালে সৌম্য কাদম্বিনীকে বলিয়া আসিল, 'আজ দুপুরে সেখানে একবার যেতে পারবি খুকী ?'

'খুব পারব ? কটার সময় ?'

'একটার সময় যাস।'

প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার নাম করিয়া কাদম্বিনী বেলা একটার সময় আসিয়া দাঁড়াইল তাদের বাড়ির সামনের পথটার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটার কাছে। সৌম্য অপেক্ষা করিতেছিল। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া দুজনে তাদের হোটেলের ঘর-খানায় হাজির হইল অল্পক্ষণের মধ্যেই। সমস্ত পথ সৌম্য একটি কথাও বলে নাই। কিছুক্ষণ বকবক করিয়া কাদম্বিনীও শেষে চুপ করিয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই সৌম্য সটান বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে কাদম্বিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিল, 'তুই আমাকে ভালবাসিস্ না খুকী।'

কাদম্বিনী বলিল, 'তা তো তুমি বলবেই। আগের বার বাড়িতে বলে এসেছিলাম উষাদের বাড়ি যাচ্ছি, একটু পরেই মা ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমায় ডাকতে। সারা দুপুর বাইরে কাটিয়ে বাড়িতে কৈফিয়ত দেওয়ার মজা মেয়ে হলে বুঝতে।'

'তুই বুঝি ভাবিস বাড়ির লোকের রাগ, লোক লজ্জা এ সব গ্রাহ্য না করলেই ভালবাসা প্রমাণ হয়ে যায় ?'

'আমি ভালবাসার কিছু জানি না, হল ?'

সৌম্য হতাশ ভাবে বলিল, 'আমার সঙ্গে ছাড়াছড়ি হবে বলে তোর এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।'

কাদম্বিনী সহজ ভাবে বলিল, 'আমি বলেছি ছাড়াছাড়ি হতে ?'

'কিন্তু তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে—'

'আমি বলেছি বিয়ে হোক ?'

তারপর দু'জনেই চুপ করিয়া রহিয়া গেল। অল্পক্ষণের জন্য। হঠাৎ কাদম্বিনী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'তুমি কিছু বোঝো না। আমি কি করব, আমার কি করার আছে ? তোমার কথা শুনতে হয়, তুমি যা বল করি, বাড়ির লোকের কথা শুনতে হয়, তারা যা বলে করি।'

কান্না। চাপিয়া রাখা কান্না এতদিনে বাহির হইয়া আসিতেছে। কাদম্বিনীর আকস্মিক উত্তেজনায় সৌম্য উঠিয়া বসিল, কাদম্বিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কিন্তু লোকের কথা শুনে তো তোর সুখ-দুঃখ জাগে না খুকী ? তোর মনে কষ্ট হলে তো বাড়ির লোকের হুকুমে সেটা উপে যায় না ?'

কাঁদ কাঁদ ভাবটা কাদম্বিনীর উপিয়া গেল। চোখ মিটমিট করিতে করিতে সে বলিল, 'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কষ্ট হলে বাড়ির লোকে কি করবে ? তারপর হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হওয়ার মতো হঠাৎ হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, তোমার কি হয়েছে জানো ? মাথা ধরে ধরে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

এবার সৌম্য অনেকক্ষণ চুপচাপ চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল। কপালে কাদম্বিনীর হাতের স্পর্শ অনুভব করার পর ক্লান্ত স্বরে বলিল, 'তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা খুকী।'

'কেন ?'

'তোর বিয়ের সব ঠিকঠাক হচ্ছে, আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত হবে না। আজকেই আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাক। কেমন ?'

সৌম্য এতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল। কথাটা বলিয়া কাদম্বিনীর মুখের ভাব দেখিবার জন্য সে চোখ মেলিল। অল্পক্ষণের জন্য তার মনে হইল কাদম্বিনীর মুখের চামড়াটা যেন টান হইয়া চকচক করিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া কাদম্বিনী যখন কথা বলিল তখন সে বুঝিতে পারিল এটা তার কল্পনা অথবা আলোর কারসাজি।

আমি কি বলব বলো ? আমি তো বলেছি তুমি যা বলবে তাই হবে। কিন্তু শেষ দিনটা তা হলে মুখ ভার করে থেকো না, হেসে কথা বলো একটু।'

সৌম্য উঠিয়া বসিল। জুতোয় পা ঢুকাইয়া ফিতা লাগাইতে লাগাইতে বলিল, 'চল বাড়ি যাই।'

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের এলোমেলো চিন্তার মধ্য হইতে সৌম্য ক্রমে ক্রমে একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বকথা আবিষ্কার করে। এজগতে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, সমস্ত এখানে আবোল তাবোল। সেই জন্যই একটু যাদের বুদ্ধি আছে তারা বলিয়া থাকে, ব্যতিক্রম

নিয়মকে প্রমাণ করে। আসলে একথাটাও একপেশে সত্য। নিয়মটা নিয়ম না ব্যতিক্রমটা নিয়ম, কে তা বলিতে পারে? দশবার নিয়ম আর একবার ব্যতিক্রমের দেখা পাইলে নিয়মটাকে মানুষ নিয়ম বলে কিন্তু দশবার ব্যতিক্রম আর একবার নিয়মের দেখা পাইলে মানুষ তো ব্যতিক্রমটাকেই নিয়ম বলিত? এই ভীষণ জটিল তত্ত্বটা আবিষ্কার করার পর সৌম্য কিছুক্ষণ গভীর তৃপ্ত বোধ করে: প্রহারের পর চকচকে খেলনা পাইলে ছোট ছেলে যেমন সজল চোখে আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়, এই দুশ্চিন্তাটি আয়ত্ত করার পর সৌম্যের আহত মনে তেমনি সঞ্চার হতো আনন্দের। সেই একুশ বছরের মেয়েটা যদি চুলোয় গিয়া থাকে, কাদম্বিনীও চুলোয় যাক্। কোর্টে গিয়া একটা পেটি কেসে মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া সে এমন বক্তৃতা জুড়িয়া দেয় যে তিনবার সংক্ষেপে তার বক্তৃতা শেষ করিতে বলিয়া হাকিম তার মক্কেলের সাত টাকা জরিমানা করিয়া দেন।

এদিকে একদিন জামসেদপুরবাসী দিব্যেন্দুর মামা আসিয়া কাদম্বিনীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া যান এবং দেখিতে দেখিতে কথাবার্তা পাকা হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়। তখন একদিন সৌম্য কাদম্বিনীকে দেখিতে যায়। অপরাহ্ন বলিয়া বড়বৌ তাকে দেয় খাবার আর কাদম্বিনী করিয়া দেয় চা।

বড়বৌ জিজ্ঞাসা করে, 'এতদিন আসনি যে ভাই সমু ঠাকুরপো?'

কাদম্বিনী মুচকি হাসিয়া তামাসা করিয়া বলে, 'মাথা ধরার জন্যে বোধহয়।'

বড়বৌ বলে, একটু রোগাই যেন তোমাকে দেখাচ্ছে সত্যি। অসুখ বিসুখের কথা শুনিনি? আমি তো এদিকে অসুখে ভুগে ভুগে মরতে বসেছি ভাই সমু ঠাকুরপো। উনি তো ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছেন। বলছেন, 'খুকীর বিয়েটা হয়ে গেলেই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

কাদম্বিনী বলে, 'বোসো, পালিয়ে যেয়ো না। একটা নতুন আচার করেছি, তোমাকে চাখতে হবে। ওপরে বাবাকে খাবার দিয়ে এখ্খুনি আসছি।'

এক হাতে খাবারের প্লেট অন্য হাতে জলের গেলাস লইয়া লঘুপদে কাদম্বিনীকে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া সৌম্যের সাধ হয় তার খাবারের প্লেট, জলের গেলাস, চায়ের কাপ আর দেয়াল ভাঙিয়া খান কয়েক ইট মেয়েটাকে ছুঁড়িয়া মারে।

তবু সে বড় বৌকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বৌদি, খুকীর নাকি বর পছন্দ হয় নি, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে?'

বড়বৌ বলে, 'কই না, কাঁদে না তো? আমি কখনো দেখিনি ভাই সমু ঠাকুরপো ওকে কাঁদতে। দেখব কি, যা ভোগাটাই ভুগছি অসুখে! কিন্তু বর খুকীর পছন্দ হয়েছে, ও বাড়ির ঊষার কাছে নাকি বলেছে।'

কাদম্বিনী নিচে নামিয়া সৌম্যকে খানিকটা আচার আনিয়া দেয়, নিজেও পরম তৃপ্তির সঙ্গে এক খাবলা আচার চাখিতে আরম্ভ করে। সৌম্য হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়,

বলে, 'তোর বাবার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে খুকী। আগে বলে আসি, তারপর তোর আচার চাখব।'

বাসর ঘরে, মেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর ঘরে যখন সকলের হাসি তামাসা গানের সুরের রেশটুকুও বোধহয় মিলাইয়া যাওয়ার সময় পায় নাই, সৌম্যের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাদম্বিনী তখন শুরু করে কান্না। শুকনো গ্রীষ্মের পর বর্ষার মতো প্রবল, অশান্ত অফুরন্ত কান্না।

কাঁদিতে কাঁদিতে কোনো রকমে বলে, 'তুমি আমায় বিয়ে না করলে আমি বিষ খেয়ে মরে যেতাম।'

কাঁদে সে ঘণ্টাখানেকের কম নয়। মুখে হাসি ফুটিতে লাগে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা।

'আমাকে তুমি এবারে ঘেন্না করবে?'

'তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোকে ঘেন্না করতে পারব মনে হয় না খুকী।'

কাদম্বিনী বলে, 'এখনো আমাকে খুকী বলবে নাকি। আর দ্যাখো, তুই বোলো না আমাকে। বিচ্ছিরি শোনায়।'

স্ত্রী হওয়ার পর স্ত্রীত্বের দাবি আরম্ভ করা সৌম্যও আর অন্যায় মনে করে না।

বন্যা

তারপর ভৈরবকে শেষরাত্রির দিকে একেবারে ঘরের চালায় উঠিতে হইল। আজ কতকাল এই শণে ছাওয়া চালা তাকে সপরিবারে আকাশের কৃপণ অকৃপণ বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে, আকাশ-ফাটা রোদে যোগাইয়াছে ছায়া। এই চালার নিচে কত দিনরাত্রি কাটিয়াছে, কে জানিত কেবল তলায় নয়, একদিন রাত্রিশেষে দরকার হওয়া মাত্র উপরেও তার এমন আশ্রয় মিলিবে?

ঢালু ভিজাচালা বাহিয়া একেবারে ডগায় উঠিয়া ভৈরব পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। এখন বৃষ্টি নাই। আকাশের একদিকে আলগা মেঘ, অন্যদিক ফাঁকা। ফাঁকায় তারাও আছে, ছোট একটি চাঁদও আছে। মেঘ যে ঘষামাজা করিয়াছে আকাশকে, বৃষ্টি যেন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে—কি জ্বলজ্বলে সব তারা, কি জ্যোৎস্না বিলানোর শখ অতটুকু আনমনা ক্ষয়ধরা চাঁদের।

অথচ পৃথিবী ঝাপসা, চারিদিকে ভালো নজর চলে না। চাঁদ আর তারার আলো যেন পৃথিবীর জন্য নয়, যেটুকু পায় সে শুধু উপাচানো দয়া। উত্তরে আম-বাগানের বন, আবছা অন্ধকারের একটা এলোমেলো স্তূপ। পশ্চিমে সেই আবছা অন্ধকারই সমতল করিয়া বিছানো—ক'দিন আগে ছিল ফসল ভরা মাঠ, এখন প্রায় নিস্তরংগ জলের সমুদ্র। পূর্ব আর দক্ষিণের বাড়িগুলি সমুদ্রের মধ্যে বিশাল নিশ্চল আবছা অন্ধকারের ঢেউ।

সবগুলি বাড়ি নয়, মাঝে মাঝে মাচা আছে, কিন্তু খুব কাছের মাচাটি ছাড়া একটিও চেনা যায় না।

'আরে হোই মহিম, আছ নাকি, হেঁই?'

নিজের হাঁক শুনিয়া ভৈরবের নিজেরই চমক লাগে। এত জোরে হাঁক না দিলেও চলিত। কাছের মাচাটি হইতে মহিমের জবাব আসিবার আগেই আরও দূরের সাড়া আসিল।

'ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা, একবারটি এসো ইদিকে—সর্বনাশ হইছে মোর—শুনছ ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা!'

বেশ বুঝিতে পারা যায়, আলতামণির গলা। সম্পদের আলোচনায় এমন কোমল আর মনোহারী, বিপদের আর্তনাদে এমন তীক্ষ্ন আর মর্মভেদী গলা রাজনগরে আর কারো নাই।

কিন্তু কোনোদিক হইতে কেহ সাড়া দিল না। এমনি ভাবে রাত্রিশেষে ঘরের চালায়

উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় আগেই গ্রাম অর্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যারা গিয়াছে তাদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক আর শিশু, ঘরের চালায়, মাচায়, চালের বাঁশ আর গাছের ডাল হইতে দোলনার মতো ঝুলানো তক্তপোষে, অনাথদের বাড়ির পিছনের উঁচু মাটির ঢিপিটায় আর ছোট-বড় কয়েকটা নৌকায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। এ অবস্থায় কেউ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাও মনে করা চলে না। তবু আলতামণির আর্তনাদে কেহ সাড়া দিল না।

ভৈরবের হাঁকের জবাবে মহিম বলিল, 'চালায় বটে নাকি ? কতক্ষণ ?'

ভৈরব বলিল, 'এই মাত্তর উঠলাম, ভাবছিলাম, চৌকির পরে রাতটুকুন কাটাব, তা শালার জল হু হু করে বাড়তে শুরু করে দিলে। দিনে দিনে ভাগ্যি সব ক'টাকে রেখে এলাম বনগাঁয়ে, নয় তো বিপদ ঘটত। চাল ক'টা নিতে এসে নিজে হলাম আটক। কানাই না'টা নিয়ে গেল বিকেলে, বলল কি, এই এলাম বলে মামা, হাট-তলা যাব আর আসব। মিথ্যুক লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটার আর পাত্তা নেই।'

আবার আলতামণির আর্তনাদ শোনা গেল, মহিম মামা! ভৈরব মামা!—আগো শুনছ ?

ভৈরব মহিমকে বলিল, 'ঘরে ঘরে সমান বিপদ, আলতামণির চিল্লানিটা শুনছ ? সবার আগে মাচান হল তোর, আগে থেকে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসে আছিস মাচানে উঠে, এত চেঁচানি কিসের রে বাবু।'

'অমনি স্বভাব ছুঁড়ির, গাঁ সুদ্ধ লোক দেখতে পারে না সাধে ?'

মহিম বোধহয় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, আগুন দেখা গেল। একটু তামাক টানিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু মহিমের মাচানে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেও সুবিধা হইবে না, অতটুকু মাচানের উপর মহিমের বৌ, মহিমের ছেলের বৌ, দুটি বয়স্কা মেয়ে, সকলে আশ্রয় নিয়াছে। তাদেরি বোধহয় নড়িবার ঠাঁই নাই, ওর মধ্যে কোথায় বসিয়া সে তামাক টানিবে? ডিঙি নৌকাটা অবশ্য আছে মহিমের, কিন্তু তাকে তামাক খাওয়ানোর জন্য মহিম যে মাচান হইতে নামিয়া ডিঙিতে করিয়া এখন তার চালায় আসিয়া উঠবে সে ভরসা নাই। কোমরে দুটি বিড়ি আর দেশলাই গোঁজা ছিল, একটু হিসাব করিয়া ভৈরব একটা বিড়ি ধরাইল।

তারপর আবার শোনা গেল আলতামণির আর্ত চিৎকার—এবার আওয়াজটা আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্মভেদী।

'ও মহিম মামা! ও ভৈরব মামা! তোমাদের ভাগ্নি-জামাই যে মরে গেল গো, এক-বারটি আসবে না ?'

মহিম হুঁকোয় একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'যাবে নাকি ?'

ভৈরব বলিল, 'চল যাই। হুঁকোটা এনো দাদা, বিড়িফিড়ি একদম মুখে রুচে না। বাড়ির পিছনে সবচেয়ে মোটা আমগাছটার অনেক উঁচুতে মোটা ডাল বাছিয়া

আলতামণির মাচান বাঁধা হইয়াছে। গাছটার সকলের নিচের ডালটি পর্যন্ত জল উঠিয়াছে, দেড়খানা মানুষ ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্যের কিছু নাই, উঁচু জমিতে উঁচু ভিটায় ভৈরবের বড় ঘর, চালা হইতে নামিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘরের দরজার অর্ধেকের বেশি জলের নিচে ডুবিয়া গিয়াছে। ইঁট দিয়ে তক্তপোষ উঁচু করিয়া কি সাহসেই সে ঘরের মধ্যে রাতটা কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল! তক্ত-পোষটা এখন বোধহয় ঘরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে আলতামণির অবস্থা সত্যই কাহিল। কাছে আসিয়া ভৈরব ও মহিম দুজনেই বুঝিতে পারিল, অকারণে আলতামণি ওরকম আর্তনাদ করে নাই। আম-গাছের ডুবুডুবু ডালটা এক হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, অন্য হাতে ধরিয়া আছে কানাইকে। কানাই জীবিত না মৃত বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু একেবারেই নিশ্চেষ্ট, আলতামণি ছাড়িয়া দিলেই জলে ডুবিয়া স্রোতে ভাসিযা চলিয়া যাইতে পারে, এমনিভাবে গা এলাইয়া দিয়াছে।

'ধর মামা' চট করে ধর একজন—হাত এলিয়ে গেছে আমার। কতখন এমনি করে ধরে আছি।'

মৃদু ও মধুর গলা আলতামণির, কে বলিবে একটু আগে তারই গলা দিয়া অমন ইঞ্জিনের হুইসেলের মতো আওয়াজ বাহির হইয়াছিল।

গাছের ডালে ডিঙি বাঁধিয়া দুজনে ধরাধরি করিয়া কানাইকে ডিঙিতে তুলিতেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝা গেল। কানাইয়ের মুখ দিয়া দেশী মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভৈরব বলিল, 'বটে! এইজন্য বাঁদরটার না'য়ের দরকার হয়েছিল! না'টা হলো কি রে আলতা, এ্যাঁ?'

আলতা তখন ডালটার উপর বুক দিয়া হাঁপাইতেছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষীণ-স্বরে বলিল, 'ভেসে গেছে।'

ভৈরব চমকাইয়া বলিল, 'ভেসে গেছে! কোন্ দিকে গেল? হায় সব্বোনাশ!'

আলতা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'কোন্ দিকে গেল কি করে বলব মামা? আমার ইদিকে এমন সব্বোনাশ—'

'সব্বোনাশ? তোর সব্বোনাশ? আমার না' গেল, সব্বোনাশ তোর? বজ্জাতটাকে ধরলি কেন তুই, বানের জলে গাঁয়ের কলঙ্ক ধুয়ে যেত! ও ছোঁড়া যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন তোর সব্বোনাশ, বেটাচ্ছেলে মরলে তোর হাড় জুড়োবে।'

'শাপমন্যি দিও না মামা—গুরুজন বটে না তুমি?'

আলতা হাঁপাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, ভৈরবের নৌকা জলে ভাসিয়া যাওয়ার অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছে, নিচু গলাতেও কোমলতা নাই—গাছের ডালে ভর দিয়া এমন ভাবে মুখ তুলিয়াছে যেন সাপের মতো ছোবল দিবে।

মহিম ভৈরবকে সাহস দিয়া বলিল, 'কোথাও ঠেকে থাকবে নিশ্চয়—কাল পাত্তা

মিলবে ।'

নৌকার শোকে কাতর ভৈরব জবাব দিল না । জলে ঢেউ নাই, স্রোত প্রবল । তিনজনের ভারে ডিঙি নৌকাটির এমন অবস্থা হইয়াছে যে ঢেউ থাকিলে হয়তো ডুবিয়াই যাইত ? আলতামণি হাত বাড়াইয়া ডিঙির প্রান্তটা ধরিতেই ভৈরব জোর করিয়া তার হাত ছাড়াইয়া দিল ।

'ডুবিয়ে মারবি নাকি সবাইকে ?'

আলতামণি আবার কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'অমনি করে ফেলে রাখবি নাকি ?' মাচানে তোল তবে ধরাধরি করে ?'

ডিঙির মাঝখানে একটা নির্জীব বস্তার মতো কানাইকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানেও জলের অভাব নাই। শরীরের হাড়গোড় থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া গা এলাইয়া পড়িয়া-থাকা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব কানাইকে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না । তবে কানাইয়ের পড়িয়া থাকিবার ভঙ্গির জন্য নয়, অতটুকু ডিঙিতে এতগুলি লোকের থাকা নিরাপদ নয় বলিয়াই ভৈরব আর মহিম পরামর্শ করিয়া কানাইকে মাচানে তুলিবার কষ্টটা স্বীকার করাই স্থির করিয়া ফেলিল । এ বন্যা, আর কিছু নয় । নদীর বাঁধ কতটুকু ভাঙিয়াছে কে জানে, কতখানি ভাঙিবে তাই বা কে জানে । এমন বন্যা আর কখনও হয় নাই, এর চেয়ে ভয়ানক, এর চেয়ে সর্বনাশকারী বন্যা কল্পনা করা অসম্ভব, তবু এখনও কিছু বলা যায় না । এ বন্যা, আর কিছুই নয় । হয়ত হঠাৎ প্রবল গর্জন করিতে করিতে কোথাকার আটকানো জলরাশি ছুটিয়া আসিবে । তাদের চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাছাড়া, আলতামণি কানাইকে এভাবে ডিঙিতে পড়িয়া থাকিতেও দিবে না, সে নিজে ডিঙিতে উঠিয়া আসিবেই । একজনের ডিঙিতে চারজন উঠিলে চলিবে কেন ?

মাচানে উঠবার বাঁশের মইটা কানাই মন্দ করে নাই, গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে শক্ত করিয়া । এদিক দিয়া বজ্জাতটার জ্ঞান আছে অনেক—যা করে, ভালো করিয়াই করে । কত তাড়াতাড়ি মাচান বাঁধিয়াছে, হাতের কাছে যা কিছু উপাদান পাইয়াছে তাই লাগাইয়াছে কাজে, তবু মাচানটি যেন দারুণ বিপদে ক'দিনের জন্য নিরুপায়ের আশ্রয় নয়, বন্যা-উপভোগ করিবার আরামের অবস্থা । উপরের ছাউনিটা পর্যন্ত এমনভাবে করিয়াছে যেন বহুকাল রোদ বৃষ্টি ঠেকাইবার জন্য ছাউনিটার দরকার হইবে ।

শিথিল দেহ মাচানে তোলা সহজ ব্যাপার নয় । দূর সম্পর্কের দুই মামার অকথ্য গালাগালিতে আলতামণির শ্রবণ-যন্ত্র দু'টি যে একেবারে বিকল হইয়া গেল না, সে এক রহস্যময় ধর্ম বটে মানুষের ইন্দ্রিয়ের । আলতামণির আর্তনাদে সাধে কেউ সাড়া দেয় না । তার প্রত্যেকটি আর্তনাদ শেষ পর্যন্ত এমনিভাবে মানুষকে হাঙ্গামায় ফেলে, প্রাণান্ত করিয়া ছাড়ে । বৈশাখের প্রথমে মাঝরাত্রে সে একবার

এইরকম আর্তনাদ করিয়াছিল—ঘরে তার আগুন লাগিয়াছে। কেন লাগিয়াছে? নদীর মোট তিন মাইল দূরে এই গ্রামে বৈশাখ মাসে জলের জন্য মানুষের যেমন পিপাসা জাগে তীব্র, নারীবহুল এই দেশে আলতামণির জন্য কয়েকটা মানুষের তেমনি কামনা জাগিয়াছিল বলিয়া। আলতামণিকে না পাইলে আলতামণির ঘরে আগুন দিতে হয়, এমন হিংস্র সেই কামনা।

মাচার একপাশে কানাইকে ফেলিয়া দিয়া মহিম ও ভৈরব ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। আলতামণি কানাইকে উপরে তুলিতে তাদের সাহায্য করিতে পারে নাই, সেটা সম্ভব ছিল না। এখন তড়াতাড়ি কানাই ভিজা কাপড় বদলাইয়া নিজের একটা শাড়ি দিয়া সে তাকে ঢাকিয়া দিল। গাছের পাতা মাচানের ছাউনি এখানে জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়াছে—মাচান অন্ধকার।

'কি হইছে মামা? নড়ন নাই যে?'

ভৈরব বলিল, 'কি হইছে সে তো তুই জানিস—আমরা কি করে বলব?'

মহিম বলিল, 'হবে আবার কি, ঠেসে মদ গিলেছে, এখন জ্ঞান নেই।'

আলতামণি কাঁদ কাঁদ গলায় বলিল, 'ফিরে এসে কি সব আবোল-তাবোল বকতে বকতে মই বেয়ে উঠছিল মামা, হঠাৎ কি হ'ল পড়ে গেল নিচে। ভেসেই যেত চলে, মাচান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ধরেছি। তখন চেতনা ছিল না মামা—অমন হঠাৎ চেতনা লোপ পেল কেন মামা, বড় ডর লাগে মামা. গা কাঁপছে মোর—হা দ্যাখো—'

গা কাঁপিতেছে কিনা দেখিয়াই তাকে ঠেলিয়া দিয়া ভৈরব বলিল, 'দেখেছি বাবু দেখেছি। বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর, আপন থেকে চেতন আসবে। বেশি গিললে অমন হয়।'

হাওয়া করার কথাটা খেয়াল ছিল না, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলতামণি পাখা খুঁজিয়া বাহির করিল, তারপর কানাইয়ের মাথায় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, 'আস্তে আস্ত হাওয়া কর, অত জোরে লোকে হাওয়া করে নাকি?'

'না মামা, জোরে জোরে করি, শীগ্‌গির চেতন হবে।'

'যেমন মুখ্য তুই—আস্তে হওয়া দিলে বেশী কাজ দেয়। তিনবার আমায় মারলি পাখা দিয়ে, পাখা রাখ, আঁচল দিয়ে হাওয়া দে।'

আলতামণি এ পরামর্শ শুনিল না, পাখা দিয়াই হাওয়া করিতে লাগিল। তবে অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে নয়, ধীরে ধীরে।

খানিক পরে মহিম বলিল, 'এবার যাই আমরা?'

'না মামা, না, ভোরবেলা তক্ত বোসো, পায়ে ধরি তোমাদের।'

ভৈরব অন্ধকারে হাসিয়া বলিল, 'এত ভয়কাতুরে যদি তুই, কানাই তো ক'দ্দিন রাতে ঘরে থাকে না একা থাকিস কি করে শুনি?'

'আজ যে চেতন নেই মামা।'

পাখাটা কানাই-এর মাথায় ঠেকিয়া যাওয়ায় মাচানের উপর পাখাটা একবার ঠুকিয়া আলতামণি আবার বাতাস করিতে লাগিল।

অরপর অস্ত যাওয়ার আগেই চাঁদ ঢাকিয়া গেল মেঘে, ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া দু' একটা তারা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে ভোরের আলোয় ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে আর কোনো বাধা রহিল না। তবে দেখিবার কিছু নাই। এ বন্যা, আর কিছু নয়! বন্যা দর্শনীয় নয়, বর্ণনীয় নয়। বুক চাপড়াইবার, মাথা কপাল ঠুকিবার যা কারণ, উপবাসে আর রোগে মরণ ঘটিবার যা' কারণ, আগামী বন্যায় বুক চাপড়াইয়া মাথা কপাল ঠুকিয়া উপবাস করিয়া আর রোগে ভুগিয়া মরা পর্যন্ত রাক্ষুসে জোঁকের কাছে ঋণী থাকিবার যা' কারণ, তার মধ্যে পর্যন্ত দেখিবার মতো কিছু নাই, বর্ণনা করিবার মতো কিছু নাই। চারিদিক জলে ডুবিয়া আছে, এই চরম দেখা। চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বন্যার এই চরম বর্ণনা।

ভৈরব শেষ বিড়িটা ধরাইবে কিনা ভাবিতেছিল। বিড়িটা জমাইয়া রাখিবার আর বোধহয় দরকার নাই। মহিমের ডিঙিতে তার হারানো নৌকার খোঁজে বাহির হইলে এখানে ওখানে তামাক কি দু' এক কল্কি জুটিবে না? আলতামণি এখনও কানাইকে সমানে বাতাস করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ পাখা বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায় সে বলিয়া উঠিল, 'একবারটি দ্যাকো দিকি মামা ভালো করে তাকিয়ে?'

মহিম ও ভৈরব তাকাইয়া দেখিল। দু'জনের মুখ পাংশু হইয়া গেল। এমন ধারা মুখ হ'ল কেন মামা? শ্বাস পড়ছে না কেন মামা?' কানাই-এর মুখ দেখিলেই সেটা বোঝা যায়! কতক্ষণ তার শ্বাস পড়িতেছে না, তাও অনেকটা অনুমান করা যায়।

ভৈরব ও মহিম পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কাল অত হাঙ্গামা করিয়া মই বাহিয়া তারা কি তবে একটা শবকে মাচানে তুলিয়াছে? ভৈরব গুরুজন হইয়া কি ক্ষীণ চাঁদের আবছা আলোয় বাঁশের মই বাহিয়া শবের মতো একটা নিশ্চেষ্ট শাপমন্যি করিয়াছে একটা মৃত মানুষকে?

তাই সম্ভব। মাচান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কানাইকে আলতামণি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই, এক হাতে আমগাছের ডালটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে কানাইকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আর তীব্র মর্মভেদী আর্তনাদ আরম্ভ করিয়াছিল। তবু বন্যার স্রোত তখন কানাইকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা মানুষকে রেহাই দেয় না। সাবিত্রীর স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সাবিত্রী বিধবা হইয়া যায়।

বিষাক্ত প্রেম

মানুষের মনের মিল তো, যখন তখন যেমন তেমন অবস্থায় যার তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও এক মাসের বেশী সময় লাগল না। অপরে যেখানে বাদ সাধে না, মাথা ঘামানোও দরকার মনে করে না, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণতঃ যথেষ্ট, যে-মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেল না যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না ক'রে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশি উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যবসা হল চুরি—সরলার ঘরে আসা-যাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগ মতো তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোনো কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাব্য। যা-কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জন থেকে জীবন-যাপন পর্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোরার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে। বাড়িতে পর্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধে করতে পারে নি। তার বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ করে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবার সরঞ্জাম—ধুতি পাঞ্জাবি, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি: একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্যর জীবিকার্জনের উপায়, হাতে-আসা পয়সা খরচ করে দামী জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বৈকি। মোটামুটি বলা যায়, জামা কাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার সময়টাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব

ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলি মৃদু আপসোস আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থায় একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ ক'দিন ঠিক থাকতে পারে ?

রূপ ব'লে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড় সমস্যা সরলার—অতি বড় আকর্ষণ। সবাই বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসী বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোনো একটা মতটত ঠিক করে ফেলবার অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোনো পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারি পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যে-সব পুরুষের স্বভাব, তারা বড় ভীরু। সরলার গায়ে গহনা আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিলটিকরা, ঘরের আসবাব অধিকাংশই নীলামে কেনা। সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে রাখার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গয়না যে নিরাপদে থাকে এখবর জানা থাকায় গায়ের গিলটি করা গয়নার জন্য তার কোনো আপসোস সেই। আসবাবগুলি তার আদায় করা উপহার—আদায় করা উপহার যে সাধারণত সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস হয় এ খবরটাও জানা থাকায়, সেকেন্ড-হ্যান্ড আসবাবের জন্যও তার কোনো আপসোস নেই। তাছাড়া, তিন পুরুষের একটা ভাঙা খাট আর উই-এ ধরা আলমারিতে সাজান স্বামীর ঘরখানার তুলনায় সাহেববাড়ির নীলামে কেনা আসবাবের সাজান ঘরের শোভাই কি কম মনোহর। খাটখানা সরলার নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে-লোকটা হার্টফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উপে যায়, কিন্তু দামী খাট পুরানো হয় না।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, একজনের জন্য অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড় ভালো তারা, বড় সরল, আনন্দের নামে হৈ চৈ করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দু'জনের মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তারপর দু'জনের হল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করান গিয়াছিল সহজেই, এখন কে এ কথায় বিশ্বাস করবে ? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপায়ও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীর নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যের লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির ফাঁদের মতো সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের

মিলে হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা সে সত্যর নেই, টাকার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সরলার নেই।

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হ'ত। দাবি-দাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদর-যত্নের পরিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশী বেশী সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর, বদমাশ।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু হ'ত! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাবুলিওয়ালী!

এইসব ভাবে আর দু'জনেরই গা জ্বালা করে।

গা জ্বালা করে আর দু'জনেই মনে মনে আপসোস করে যে, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপসোস করে আর সত্য ভাবে, যত শীগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপসোস করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাঁটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, 'কাগুলি টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফুর্তি করা যাক, অ্যাঁ?'

সরলা খুশি হয়ে বলে, 'কত টাকা পেয়েছিস? কোথায় পেলি?'

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, 'পেলাম।'

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কি উপায়ে কোথায় কি পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তাকিকর্ক। সরলা তাই খুশিতে গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।'

বিপদ মাথায় ক'রে উপার্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মতো দুর্বল মুহূর্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে? সরলা গদ্‌গদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'যাই তো যাব জেলে, তোর জন্য যাব তো?—বয়ে গেল!'

সরলা আরও গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'ইস!'

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয় নি, তবু কি যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মতো, যে-সাপ কোনো অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, 'এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড় বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল—ফিরে এসে ফুর্তি জমান যাবে।

'ভালো করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।'

'আসমানী রঙের শাড়িটা পরব?'

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

'বেগুনিটা পরলে হ'ত না?—আচ্ছা পর, 'আসমানিটাই পর। বেগুনি আর আসমানি দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বৌ।'

'ইস!'

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, 'গয়নাগুলো বদ্‌লাস কিন্তু—গিল্‌টি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।'

এ সমস্যাটি সত্য-সত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, 'তুই বুঝি ভাবিস গিল্‌টি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।'

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে বসে, 'টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়। দু'জনে একেবারে গিয়ে টিকিট কাটব।'

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন্ ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'কখন বদলালি গয়না?'

'এই মাত্তর।'

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'এই মাত্তর। —কোথায় ছিল রে?'

আদর-করা উপহার নীলামে-কেনা সেকেণ্ডহ্যান্ড আলমারিটার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায় সরলা বলে, 'ঐ আলমারিতে, আবার কোথা?'

এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট, জোরাল তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে। সরলার গয়না কোনোদিন আলমারিতে লুকানো ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশিরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত তার ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশী ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা চপ আর দামী বিলাতী মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, 'ঘরেই তো ছিল, আবার এখানে কেন?'

'আজ একটু প্রাণ ভরে ফুর্তি করতে সাধ যাচ্ছে।'

'কেন আজ কি?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে

বলে, 'অতগ্‌লো টাকা রোজগার করলাম যে আজ ?' বলে দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে আর বেশীরকম আদর করে না, বেশী বেশী রসিকতা করে হাসায় না।
ঘরে ফেরার কিছ্‌ক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ যে আবার ম্‌খ ভার হল ?'
প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় ও সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ায় সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, 'না, মাইরি না। ম্‌খ ভার হয় নি।'
জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড়রকম কৈফিয়ৎ না থাকায়, একট্‌ নিশ্চিন্ত হলে সরলা স্ফ্‌র্তি জমানোর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন্‌ ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গ্‌ঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টের পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে ল্‌কানো গয়না বার করতে সে যেমন পট্‌, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পট্‌ নয়।
বিয়ে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধহয় বাতিল হয়ে যায় এজন্য যে বোতলের বিষকে লোকে স্‌ধা বলে, মনেও করে তাই। ম্‌খ বিকৃত করে সরলা বলে, 'থ্‌ঃ কি খাওয়ালি আমাকে তুই ? কি বিচ্ছিরি স্বাদ !'
সত্য অন্‌যোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পচা চপ্‌ খাস না, তব্‌ তুই খেলি। মর এবার !—নে, পান খা একটা' বলে সস্নেহে তার ম্‌খে পান গ্‌ঁজে দেয়।
তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, 'গা কেমন করছে। মাথা ধরেছে। আর খাব না আমি।'
সত্য আবার অন্‌যোগ দিয়ে বলে, বললাম পান খাস না, তব্‌ তুই খেলি। মর এবার।...আয় মাথাটা টিপে দিই।'
তারপর সত্যের কোলে মাথা রেখে সরলা ছটফট করে, গোঙায়, ম্‌খে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে, বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যের ম্‌খের দিকে, দ্‌'হাতে সত্যকে জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপম্‌ত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছ্‌ক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে সম্প্‌র্ণভাবে স'পে দেয় সত্যের হাতে, কিছ্‌ চেতনা কেবল থাকে চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্বোধ চেতনার স্‌ষ্টি হয়েছে।
একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যার সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছ্‌ গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশ্‌ ম্‌খে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগ্‌লি খ্‌লে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে ল্‌কানো ও জমানো টাকাগ্‌লি খ্‌'জে খ্‌'জে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যের পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে। বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে

মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলায় পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কার সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত কাবুলিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানই ভালো, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে?

সরলার আসমানী রঙের শাড়ির আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে মুখে চোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিলে আর কতটুকু সেবা করা হয়? চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না। এমনি আশ্চর্য সেবা করার নেশা।

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায়? সব বিষের ক্রিয়া একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য একজনের মরে যাওয়া আশ্চর্য কি? আর যদি জ্ঞান না হয়, সরলার অপলক চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায়? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশী পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনীকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যথাও হবে সেই অনুপাতে বেশী। ধরা পড়লে চোরের চেয়ে খুনীর শাস্তিটাও চিরদিন বেশীই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেক বেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয়? খুব কি দুর্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব? আজ পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সরলার কম নয়? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলার দিকে চেয়ে জগতে কারও যে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মতো শক্তসমর্থ সরলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তার চোখে জল আসে। এত বেশী রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এতদিনের মতলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তার উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশী হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে তার টাকাগুলি যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরালো সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের

অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর পুতুল। সত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক, কি আর করা যায়, চুরি করার জন্য খুনী হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে? যতদিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদন্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটম্বুর।

দোকানীর বৌ

সরলার পায়ে সব সময় মল থাকে। মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা—ঝমর ঝমর। চুপি-চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়—মল আর বাজে না। প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না, ভাবিত বৌ আশেপাশে আসিয়া পৌঁছানোর আগে আসিবে মলের আওয়াজের সংকেত—পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্ণের শব্দ আসে। ক'বার বিপদে পড়িয়া বৌ-এর মলের উপর নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে।

ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড় টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশ বাঁশের মাচার উপর শম্ভুর দোকান। মাটির হাঁড়ি, গামলা, কেরোসিন কাঠের তক্তার চৌকো চৌকো খোপ, ছোট বড় বারকোশ, চটের বস্তা ইত্যাদি আধারে রক্ষিত জিনিসপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ও পয়সা রাখিবার ছোট চৌকী; হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিসের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু সারি কাঠের তাক। সাবু, বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্য একপাশে কাঁচ বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি দামী মশলার নানা আকারের পাত্র, লণ্ঠনের চিমনি, দেশলাই-এর প্যাকেট, কাপড়-কাচা গায়ে-মাখা সাবান, জুতোর কালি, লজেন্স এবং মুদিখানা ও মনোহারী দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেওয়াল। তাক আর এই দেওয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে, শম্ভুর সেটা অন্দরে যাতায়াত করার পথ। সরলা বৌ-মানুষ, অন্দরেই তার থাকার কথা, কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে করে কি, পায়ের মল উপরে ঠেলিয়া দিয়া চুপি-চুপি তাকের জিনিসের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারী দেখে এবং খদ্দেরের সংগে আলাপ আলোচনা শোনে। বাড়িতে শম্ভু খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ, কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সংগে তাকে কথা বলিতে হাসি-তামাসা করিতে দেখিয়া সরলা অবাক মানে। মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এরকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শুধু পুরুষেরাই জিনিস

কিনিতে আসে না।

বেচা কেনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সরলা অপেক্ষা করে, তারপর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাথিমারার মতো জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজইয়া অন্দরে যায়। শম্ভুও ভিতরে আসে একটু পরেই। দেখিতে পায় উনান নিবিয়া আছে, ভাত-ডালের হাঁড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে, আর স্বয়ং সরলা গড়াইতেছে রোয়াকে। অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গরুতর মনে করে না, ঘরে তিনপুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত সুখশয্যা থাকিতে রোয়াকে ছেঁড়া মাদুরে কালা, কানা, বোবা ও বিকৃতমুখী সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই সে কাবু হইয়া যায়। তারপর অনেকক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয়, একটা মানুষের একটু হাসা ও একটা মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছুই নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আপসোস করিতে হয়, আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেন্স। সরলা একেবারে লজেন্স খাওয়ার রাক্ষসী। তাও যদি কম দামী লজেন্স খাইয়া তাঁর সাধ মিটিত! পয়সায় যে লজেন্স শম্ভু দুটির বেশি বিক্রি করে না, কেউ চার পয়সার কিনিলেও একটি ফাউ দেয় না, সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই।

তারপর সরলার কানাত্ব, কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে এবং রাগের আগুন নিবিয়া যায়। তবে একটা উদাস-উদাস অবহেলার ভাব, কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাঁদ কাঁদ হওয়া, এ সমস্তের ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ি, দামী নয়, সাধারণ একখানা শাড়ি, ডুরে হইলেই ভালো।

একবছর মোটে দোকান করিয়াছে শম্ভু, এর মধ্যে এমনি ভাবে এবং এই ধরনের অন্য ভাবে সরলা সাতখানা শাড়ি আদায় করিয়াছে। সাধারণ কম দামী শাড়ি—ডুরে হইলেই ভালো।

তবু বছরের শেষাশেষি, চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে, অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা ডুরে শাড়ি কিনিয়া দিল। বলিল অবশ্য যে ভালবাসিযা দিয়াছে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল, কিন্তু বিনা দোষে সাতবার জরিমানা আদায়কারিণী বোকে এরকম কেউ কি দেয়? যাই হোক, শাড়ি পাইয়া এত খুশি হইল সরলা যে আর এক দণ্ডও স্বামীর বাড়িতে থাকিতে পারিল না, বেড়ার ওপাশে শ্বশুর বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। শম্ভুর বাড়িটা আসলে আস্ত একটা বাড়ি নয়, একটা বাড়ির একটুকরো অংশ মাত্র—তিন ভাগের এক ভাগ। দোকানঘর ও শয়নঘরে ভাগ করা বড় ঘরখানা, উত্তরের ভিটায় আর একখানা খুব ছোট ঘর, তার পাশে রান্নার একটি চালা আর শয়ন ঘরের কোণ হইতে চালাটার কোণ পর্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাঁচের বেড়া দিয়া ভাগ করা তিনকোণা একটুকরা উঠান। শম্ভুরা তিন ভাই কিনা, তাই বছরখানেক আগে এই

রকম ভাবে পৈতৃক বাড়িটা ভাগ করা হইয়াছে, বেড়ার এপাশে শম্ভুর এক ভাগ এবং ওপাশে অন্য দুভায়ের বাকী দুভাগ। এপাশে শম্ভু আর সরলা থাকে, ওপাশে একত্র থাকে শম্ভুর দাদা দীননাথ ও ছোট ভাই বৈদ্যনাথ, তাদের বৌ আর ছেলেমেয়ে, শম্ভুর বিধবা মা আর মাসী এবং শম্ভুর দুটি বোন। এভাবে শুধু বৌটিকে লইয়া বাড়ির উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়ার জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইলেও আসল কারণটা কিন্তু তা নয়। এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকার, সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এইরকমভাবে ভিন্ন হওয়ার সর্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয়, বর্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুকু সরলা তার বাপের টাকাতেই কিনিয়াছে।

কি সুখ সরলার, কি স্বাধীনতা। বেড়ার ওপাশে যাদের কাছে সে ছিল একটা বেকার লোকের বৌ, বেড়ার এপাশে এখন তাদের শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিতে তার কি গর্ব, কি গৌরব! দোকানটা ভালই চলিতেছে শম্ভুর, ওদের টানাটানির সংসারের তুলনায় তার কি সচ্ছলতা। একটু মুখ ভার করিলে তার ডুরে শাড়ি আসে, না করিলেও আসে।

সরলার পরনে নূতন ডুরে শাড়িখানা দেখিয়া বেড়ার ওপাশের অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল। তার মধ্যে সবচেয়ে কড়া হইল ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা বড় জা কালীর মন্তব্য। শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, নাচনেউলী সেজে গুরুজনদের সামনে আসতে লজ্জা করে না মেজবৌ? যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলাগে যা স্বামীকে।

ছোট-জা ক্ষেন্তির মাথায় একটু ছিট আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই। সে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ঝম্‌ ঝম্‌ যা মল বাজে সারাদিন, মেজদি নিশ্চয় দিন রাত্তির নাচে দিদি। পান খাবে মেজদি?'

হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘোমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল। দীননাথ গম্ভীর গলায় বলিল, মেজবৌ কেন এসেছে পুঁটি?'

বিবাহের তিন মাসের মধ্যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত কাঠির মতো সরু পুঁটি বলিল, এমনি।

এমনি আসবার দরকার!—বলিয়া দীননাথ সরিয়া গেল। সরলা ঘোমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় ক্ষেন্তি ঘোমটা টানিল। বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ; শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা বাছা খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা করে, বৈদ্যনাথ সময় অসময় মানুষ অমানুষ বাছে না। সম্ভবত রাত্রে তার রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হাসিতে হয় বলিয়া ক্ষেন্তির মাথায় যখন-তখন কারণে অকারণে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ওঠার ছিট্‌ দেখা দিয়াছে। সে আসিয়াই বলিল, 'মেজোবৌঠান যে সেজেগুজে! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে

উঠেছিলাম অ্যাঁ? ও পুঁটি, দে দে বসতে দে, ছুটে একটা দামী আসন নিয়ে আয়গে ছিনাথবাবুর বাড়ি থেকে।'

এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে। কেবল শম্ভুর মা বড় ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায়, সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিলেও চাহিয়া দেখে না। সরলা পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে, নতুন কাপড় পরে ছুঁয়ো না বাছা।

সরলার দাঁতগুলি একটু বড় বড়। সাধারণত কোনো সময় সেগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না। কুড়ি মিনিট শ্বশুরবাড়ি কাটাইয়া বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ও ওষ্ঠের নিবিড় মিলন হইয়াছে।

ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত; উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারি রোগা ও দুর্বল, কাজ করিত বেশি, খাইত কম, বকুনি শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কান দুটিতে শম্ভুও কখনও মিষ্টি কথা ঢালিত না।

এক বছর একা থাকিয়া সরলার শরীরটি হইয়াছে নিটোল, মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে। রাণীর মতো আছে সরলা, রান্না ছাড়া কোনো কাজই একরকম তাকে করিতে হয় না, পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি করিয়া দিয়া যায়। দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা শম্ভুকে দিতে বলিয়াছিল, সব এখনও দেয় নাই, অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে। মাসে এক-বার করিয়া আসিয়া দোকানের মজুত মালপত্র ও বেচা কেনার হিসাব দেখিয়া যায়। প্রত্যেকবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতিমধ্যে শম্ভুর পত্নীপ্রেমে সাময়িক ভাটাও কখনও পাড়য়াছিল কি না। বড় সন্দেহপ্রবণ লোকটা, বড় অবিশ্বাসী—নয় তো মেয়ের আহ্লাদে গদগদ ভাব আর ডুরে শাড়ির বহর দেখিবার পর ও-কথাটা আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না।

দুঃখ যদি সরলার কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ; বেড়ার ওধারে অশান্তি-ভরা সংসারটির কলরব দিনরাত্রি তার কানে আসে, ছোট বড় ঘটনাগুলি ঘটিয়া চলা এ বাড়িতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে; ছেলেমেয়েগুলি কখনও কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনও কাঁদে মার খাইয়া, বড়জা কখনও কারণে অকারণে চেঁচায়, ছোট-জা কখনও কি জন্য খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে, ছোট দেবর কখনও কাকে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে, কবে কে আত্মীয় স্বজন আসে যায়। বেড়ার একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সরলা স্থানে স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে, সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। ওই আবর্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হয় সরলার।

নিজের বাড়ি আসিয়া সে ডুরে শাড়ি ছাড়িল না, রান্নার আয়োজন করিল না, একবার শম্ভুর দোকানদারী দেখিয়া আসিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বিকালে তার

বাবা আসিবে, বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে কি না তাই ভাবিতে লাগিল সরলা। কত কথা মনে আসে, আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে। শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা, ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ। বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ি দু'টাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না? তার স্বামী এখন রোজগার করে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি করিবে. এই সমস্তই ভাবিয়া? তবে মুস্কিল এই, এখন যদি দোকানের আয়ে ওরা ভাগ বসায় দোকানের উন্নতি হইবে না, এমন একদিন কখনও আসিবে না যেদিন লোহার সিন্দুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে। যত ডুরে শাড়ি সে আদায় করুক আর লজেন্স খাক, দোকানের আয়-ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে। তিনপুরুষের পালঙ্কে গিয়া সে শুইয়া পড়ে। কত দিন পরে ও-বাড়ির সকলের ভয় ভালবাসা ও সমীহ কিনিবার মতো অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া কষ্ট হয় সরলার।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাসমত সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটোয় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ও-বাড়িতে বড় ঘরের দাওয়ায় শম্ভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে শম্ভুকে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায়। এতে সরলা আশ্চর্য হয় না, সে পরের মেয়ে সে যখন যায়, শম্ভুও মাঝে মাঝে যাইবে বইকি! সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের ব্যবহার। ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্যন্ত হয় নাই শম্ভুর উপর। বেড়া ডিঙানো মাত্র ওপাশের মানুষগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়, এতটুকু বাধা পায় না। পুঁটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে। সকলের সঙ্গে কি আলোচনা শম্ভু করিতেছে সরলা বুঝিতে পারিল না, মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশি হইয়া কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে। শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, তার স্বামীর যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কি গুরুতর ব্যাপার থাকিতে পারে যে এত পরামর্শ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করিতে শম্ভু বলিল, ও কিছু না। জমিজমা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি না।

—কেন. বেচবে কেন?

শম্ভু মুখ ভার করিয়া বলিল, তুমি জান না, না? কবে থেকে বলছি তেল নুন বেচে লাভ নেই একদম, বাজারে একটা মনিহারী দোকান করব—তাতে টাকা লাগবে না? কোথায় পাব টাকা, জমি না বেচলে?

সরলা বলিল, জমির থেকেও আয় তো হচ্ছে?

—দোকানে বেশি হবে।

সরলা চিন্তিত হইয়া বলিল, কবে খুলবে বাজারে দোকান?

—পয়লা বোশেখ খুলব ভাবছি, এখন আমার অদেষ্ট। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া মুখের সামনে তুড়ি দিল শম্ভু, মাথা নাড়িল, বাঁকা হইয়া বসিল। বলিল, তোমার বাবা বলেছিল সব সুদ্ধ ছশ' টাকা দেবে দোকান করতে, দোকান খোলার জন্যে একশ' দিয়ে বাকি টাকা আটকে দিলে। এক বছরে আর মোটে দুশ' দিয়েছে তার-পর—এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ? দোকান করতেও একসঙ্গে টাকা চাই।

মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল, বাবা তো আসবে আজ, বাবাকে বলব ?

শম্ভু বিষণ্ণ মুখে বলিল, ব'লে কি হবে ? বিশ ত্রিশ টাকার বেশী একসঙ্গে দেবে না।

আমি বললে নিশ্চয় দেবে, বলিয়া সরলা একগাল হাসিল।

তারপর বৌকে লজেন্স দিল শম্ভু, কালো গালে অদৃশ্য রঙ আনিল আর ফিস্-ফিস্ করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল। মা'র হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভুর, সব ছেলের চেয়ে শম্ভুকে তার মা বেশি ভালবাসে তা জানে সরলা, ওই টাকাটা বাগানোর ফিকিরে আছে শম্ভু, নয়ত এত বেশি ও বাড়িতে যাওয়ার তার কি দরকার। বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভু, এবার আর দোকান-দারী নয়, রীতিমত ব্যবসাদারী—বাবাকে বাকী টাকাটা একসঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভোলে। দুর্গা দুর্গা। না, এবেলা আর রাঁধিবার দরকার নাই। ফলার-টলার করিলেই চলিবে। আহা, গরমে সরলার রাঁধিতে কষ্ট হইবে যে।

সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে, বাটখারা লাভের দিকে না-ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে, তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশি দোকানদারী করা ভালো নয়। বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর, এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো, তাতে যা হয় হবে। একদিন তো নিজেকে কোনো রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই স্বামীর হাতে সমপর্ণ করিতে হইবে তার। তা ছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাকে যে-রকম ভাল-বাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানির জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সব চেয়ে ভালো হইত, এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলার কি আর জানিতে বাকি আছে নিজের ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কি রকম কাঁচা আর নরম হইয়া যাইবে। তবে ছেলেটার জন্মিতে এখন অনেক দেরি। তার আগে জমি বেচিয়া বাজারে মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্তি তার একার, কারও কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই। আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে

শম্ভুর কাছে। বাজারে মনোহারী দোকান খুলিয়া দু-এক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানে বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে শান্তিতে, একরকম বাড়ির কর্ত্রীর মতোই সকলের সঙ্গে বাস করিতে পারে, হয়তো অকৃতজ্ঞ পাষাণের মতো শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে। তবু, ভবিষ্যতেও সে তার বশে থাকিতে পারে এ-রকম একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেখাই ভালো যে কি হয়।

সরলার সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। একসঙ্গে তিনশ' টাকা। জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবছিল, দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভুর, তাতে দুজন মানুষের খাইয়া-পরিয়া থাকা চলে, বড়লোকের মতো না হোক গরীবের মতো চলে। জামাইকে বড় লোক করিয়া দিবার ভার তো সে গ্রহণ করে নাই। মোট ছশ' টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছিল, তবে সংসারে কত সময় মানুষ কত কথা বলে, সব কি আর চোখ-কান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত, না তাই মানুষে পারে? অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয় ব্যবস্থা। তাছাড়া, বাজারে মনোহারী দোকান খোলার মতো দুর্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে—

কাঁদিয়া কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে, কত কষ্টে বাপের কাছ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে, শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশি কাঁদাকাটা করে। দেবে বলেছিলে এখন দেবে না বলছ বাবা?—বলিতে বলিতে দুঃখে অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার। একসঙ্গে তিনশ' টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয়, তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া হার মানিল। ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই। সরলা তার একমাত্র মা-মরা ছোট মেয়ে। কোথায় দোকান করিবে, কি রকম দোকান খুলবে, কত টাকার জিনিস রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে, শম্ভুকে এসব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল।

সরলা বলিল—দেখলে?

শম্ভু যথোচিত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল। স্বামীদের যে-ভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান উচিত ঠিক সে ভাবে নয়, নম্র ভাবে, সবিনয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই সময় বেড়ার ওপাশে হঠাৎ শোনা গেল ছোটবৌ ক্ষেন্তির খিল্ খিল্ হাসি। বেড়ার ফুটোয় সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ, তাদের আলাপ শুনিতেছিল? রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও-বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈদ্যনাথ ক্ষেন্তি আর বাড়ির কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জন। উঠানের বেড়া আর ধানের মরাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল।

—সবাই কোথা গেছে লো ছোটবৌ?

কাছে আসিয়া ক্ষেন্তি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, ঘরে।

সেটা অসম্ভব। চৈত্রের দুপুরে ঘরের বাহিরে কড়া রোদ, গরম বাতাস। কিন্তু এদের দুজনের কি ঘর নাই? এখানে এরা কি করিতেছে এ সময়? হাসাহাসি? নিজের বাড়িতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়া এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল। তিন-পুরুষের পুরোনো পালংকে (ভিন্ন হওয়ার সময় ভাইদের কবল হইতে' শম্ভু সেটা কি কৌশলে বাগাইয়াছিল আজও সরলা তাহা বুঝিতে পারে না) শুইয়া সরলা চোখ বুজিল, শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক। নিজেই তামাক সাজে কি না শম্ভু, এত বেশি তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দু-বেলাই সরলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় বাপের সংগে সমস্ত সকালবেলাটা লড়াই করিয়া না-হয় বৈদ্যনাথ ও ক্ষেন্তিকে ধানের মরাইয়ের আড়ালে রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দিন-সাতেক পরে শম্ভু সকাল বেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। গেল ও-বাড়ি হইয়া। দোকানে নূতন মাল আনা সে কিছু-দিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল, অনেক জিনিস ফুরাইয়া গিয়াছে, অনেক খদ্দের ফিরিয়া যায়। মনোহরী দোকানে যে-সব জিনিস রাখা চলিবে না—চাল ডাল মশলাপাতি, সে সব শেষ হওয়াই ভালো। তাই আজকাল একটা দিনের জন্য ও দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায়না। বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে। বেকার রসিক বৈদ্যনাথ। শম্ভুর যে ছোট ভাই এবং যে দুপুরে রোদে উঠানে ধানের মরাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বৌয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে। শম্ভুও একদিন বেকার ছিল, বৌও ছিল শম্ভুর—ছ্যাকরা গাড়ির মতো হাড্ডিসার হোক, বৌ বৌ। ক্ষেন্তিই বা এমন কি রূপসী পরীর মতো? ওর মাথায় বরং ছিট আছে, একবছর আগেকার সরলার মতো কম খাইয়া বেশি খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেই বেশি খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসে। বেকার অবস্থায় একবারও নয়, দোকানদার হওয়ার পর শম্ভুকে কয়েকবার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা, কিন্তু সে অন্য একজনের সংগে। তারপর শম্ভু বৌকে কিনিয়া দিয়াছে ডুরে শাড়ি। অন্য অনেকের সংগেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে, ক্ষেন্তিকে কিন্তু কখনও কিছু কিনিয়া দেয় না। কি' করিয়া দিবে? পয়সা নাই যে! দু-ভায়ের মধ্যে প্রভেদটা আশ্চর্যজনক। নামে নামে পার্থক্য শুধু 'নাথ' এর মিল, ওটা বাদ দিলে একজন শম্ভু অন্যজন বৈদ্য!

মল না বাজাইয়া দোকানে তাকের অড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভ্যস্ত দোকানদারী দেখে। মালপত্রের অভাবে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লক্ষ্মীছাড়া মনে হয় দোকানটা।

ক'দিন হইতে মনটা ভালো ছিল না সরলার, উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। পাকা দোকানীর মেয়ে সে, কাঁচা দোকানীর বৌ, তার কেবল মনে

হইতেছিল ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে, শুধু লোকসান নয়, একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার। কিছুদিন হইতে কিরকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না তবু চোখ-কান বুজিয়া এইসব না-বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চালিতে সাহায্য করিতেছে। আজকাল শম্ভু ঘন ঘন ও-বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করিয়াছে, ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, সেটা না হয় জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যই হইল, শম্ভুর সঙ্গে ওবাড়ির সকলের ব্যবহার? ও-বাড়িতে কি শুধু দেবদেবী বাস করে যে, এক বছর ধরিয়া এমন ভাবে ভিন্ন থাকিয়া জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে গেলেও শম্ভুর সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিবে? তাছাড়া এখানকার দোকান তুলিয়া দিয়া বাজারে দোকান খুলিতেছে শম্ভু, সেজন্য ও-বাড়িতে একটা উত্তেজনার প্রবাহ আসিবে কেন? ওদের কি আসিয়া যায়? বেড়ার ফুটায় চোখ রাখিয়া সরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও-বাড়ির বয়স্ক মানুষগুলির কি যেন হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নের মতো বড় রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ির লোকগুলি যেমন করে, ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই। হইতে পারে শম্ভুর বাজারে দোকান খোলার একই সময়ে ওদের সংসারেও একটা বড় ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তবে সেটা যে কি ব্যাপার তা সরলা জানিতে পারিতেছে না কেন? বেড়ার ওপাশে যা ঘটিবে, সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে তো গোপন থাকার কথা নয়। আর, সরলার কাছে সকলে যা গোপন করিবে, তার পক্ষে সেটা কি কখনও শুভকর হইতে পারে?

শুধু টাকা আদায়ের চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এ-সব বিষয়ে পরামর্শ না করার জন্য সরলার দুঃখ হয়। মেয়েমানুষ সে, এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সাম লাইয়া চলিতে পারে? চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত, একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত। সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। মেয়েমানুষ সে, বৌ-মানুষ সে, তার উচিত এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহাতে তার বিরুদ্ধে সকলের চুপিচুপি চক্রান্ত করিতে হয়?

দোকানে খদ্দের নাই দেখিয়া একসময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, ও তোমাদের বাড়ি গিয়া কি সব বলত বল তো?

রসিক বৈদ্যনাথ বলিল, তা জান না মেজো বৌঠান? তোমার নিন্দে করত—তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে ওঠাও, আর এক কান ধরে বসাও। কানের ব্যথায়—

সরলা রাগিয়া বলিল, চাষার মতন কথাবার্তা হয়েছে তোমার বাপু, এদিকে এক পয়সা রোজগার নেই, কথা শুনলে গা জ্বলে মানুষের। বিক্রির পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমিই জান।

ক'দিন আগে ধানের মরাইয়ের আড়ালে বৌ-এর সঙ্গে হাসিহাসি করার পুরস্কার

পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল। সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা। বড় ভাই উকিলের মুহুরি, পাত্র নিজে একটা পাস দিবার দু-ক্লাস নিচে পর্যন্ত পড়িয়া একটা আড়তে হিসাব লেখার কাজ করে, এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছেন, তার দাঁত উঁচু কালো মেয়েকে। না-ই বা দিত ? পাশের গাঁয়ের জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত ? সে লোকটা এমনিই বশে থাকিত সরলার, আর অদৃষ্ট থাকিলে তাহাকে দিয়া আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়তো সে আনিতে পারিত যখন ডুরে শাড়িটি পরিয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত, না করিত সংসারের কাজ, না শুনিত কারও বকুনি। দোকানদারের দাঁত-উঁচু কালো মেয়ের মুখ্যু চাষা স্বামীই ভালো। লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানী হয়, তার মতো পাজী বজ্জাত লোক—

পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল, যে-লোকটা কাল বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই। গিয়াছিল দম-আটকানো অবস্থায়, ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁফ ছাড়িয়া। শম্ভু একবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল, রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর স্বপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় আসিয়াছিল, এবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা তার সঙ্গে মেলে।

টাকা পেলে ? সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ পেয়েছি।

—সব ?

—সব। পাখাটা কই ? বাতাস কর না একটু।

সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে। হ্যাঁগো, দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে ? বিয়ের সময় তোমাকে চারশ' টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেধেছিল দাদার !

শম্ভুর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল, কড়া দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, ঘেমে-টেমে এলাম রোদে, পাখাটা পর্যন্ত এনে দিতে পার না তুমি হাতে ? অন্য কেউ হলে বাতাস করত নিজে থেকে, বলতে হত না।

সরলা হাসিয়া বলিল, ছোটবৌ করে, ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কি না সেই জন্যে।

পাখাটা আনিয়া সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে, বাতাসে শম্ভু কিন্তু ঠাণ্ডা হইল না। ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়াই আছে সেটা বোঝা যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে। সরলা আনমনে বলিতে লাগিল, আহা, আমার মাথার যত চুল তত বচ্ছর পরমায়ু হোক ছোটবৌয়ের !

—কেন ?

—কাল রাত্তিরে দুঃস্বপন দেখলাম যে। হাসতে হাসতে ছোটবৌটা যেন মরে গেছে বুক ফেটে। আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপন দেখায় ?

শম্ভু রাগিয়া বলিল, ইয়ার্কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে, অ্যাঁ ? ভালো হবে না বলছি। ঘেমেটেমে এলাম আমি—

বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাখা ফেলিয়া রোয়াকে গিয়া ছেঁড়া মাদুরে শুইয়ে পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল, রাগ হল নাকি ? রাগবার মতো কি তোমাকে বলেছি শুনি ?

সরলা জবাব না দেওয়ায় গামছা কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে। চলন্ত স্বামীকে দেখিতে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল সরলার। ডুরে শাড়ি নয়, লজেন্স নয়, সোয়াগ নয়, মিষ্টি কথা নয়, শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া। একদিনে এমন অধঃপতন হইয়াছে শম্ভুর ? কে জানে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া লাগার জন্য সরলাকে হয়তো সে গালাগালি পর্যন্ত দিয়া বসিবে। সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ভুলই করিয়াছে।

ডাল পোড়া লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না, বরং মুখ ভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে। সরলা সজল সুরে বলিল, বকলে কেন ?

শম্ভু বলিল, না, বকিনি। ঘেমেটেমে এলাম কিনা—

খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল। সাজিয়া দিল, ফুঁ দিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না। আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে ফুঁ দিবার সময় বড় বিশ্রী দেখায় তার মুখখানা। শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল। সরলা বলিল, ঠাকুরপো যা বিক্রি-সিক্রি করেছে হিসাব নিও।

শম্ভু বলিল, নেব।

সরলা বলিল, রাখালবাবুর বাড়ি আধ মণ চাল নিয়েছে, ছিনাথ উকিলের বাড়ি আড়াই সের মুগের ডাল, আড়াই-পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান, তাছাড়া খুচরো জিনিস অনেক বিক্রি হয়েছে। ভাঁড়ে করে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ি নিয়ে গেছে কাল, আর আজ নিয়ে গেছে কতকগুলো লেবেঞ্চুস, আর কিসের যেন একটা কৌটো, অত নামটাম জানি না বাপু, জিজ্ঞেস ক'রো।।

শম্ভু বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন।

তারপর এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা একবার ও-বাড়িতে গেল। কেহ তাহাকে আসিতেও বলে না, বসিতেও বলে না, তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে। বড়-জা কালী শুইয়া আছে, ক্ষেন্তি সেলাই করিতেছে কাঁথা বৈদ্যনাথ ঘুমে অচেতন। শাশুড়ী উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলিয়াছে, কাছে চুপচাপ

বসিয়া আছে পুঁটি। ভাসুর এ-সময় কাজে যায়, নাম মাত্র ঘোমটা দিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই সরলা খানিকক্ষণ এঘরে খানিকক্ষণ ওঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষেন্তির কাছেই সে বসিল বেশিক্ষণ। ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা বলিল, ক্ষেন্তি একবার খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিল, আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে। বাড়ি আসিয়া পালঙ্কে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল। টাঙানো বাঁশে সাজানো জামা কাপড়গুলি জোর বাতাসে দুলিতেছে, ওর মধ্যে সরলার ডুরে শাড়ি দু'খানাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি। কাৎ হইয়া শুইয়া আছে শম্ভু, চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ। সরলা বিছানায় উঠিবার পর সে পাশ ফিরিয়াছে, সরলার দিকে নয়, ও দিকে। কে জানে এটা তার ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কি না! এরকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগে ভাগে করিয়া রাখে। শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য ভালো একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওয়ার সময় তার বাবা চৌকাঠে হোঁচট খাইয়াছিল, আগের বারের ছেলেটা তার পেটের মধ্যেই যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাঁচা ঘরের পিছনে আমগাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল।—সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায়, লম্বাটে হইয়া যায় তার মুখখানা। বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটা টিকটিকিও যে ডাকিয়া উঠিল আজ? মাগো, না জানি কি আছে সরলার কপালে!

বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আগের বারের সাজা তামাক টানার সুখটা মনে করিয়া শম্ভু বলিল, দাও না, এক ছিলিম তামাক সেজে দাও না।

সরলা বলিল, তুমি সেজে নাও।

শম্ভু গম্ভীর উদারতা বোধ করিতেছিল, জেলখানার কয়েদী যেন নিজের বাড়িতে তিনপুরুষের পুরোনো পালঙ্কে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে। নিজেই তামাক সাজিয়া সে দোকান খুলিল, কাঠের ছোট চৌকিটিতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল। ও-বাড়ির দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। বেলা পড়িয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরলা গা ধুইল না, রান্নার আয়োজন করিল না, খানিকক্ষণ ছটফট করিতে লাগিল অন্দরে আর খানিকক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকের আড়ালে। সন্ধ্যার পর দীননাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ি ঢোকার আগে আসিল শম্ভুর দোকানে। উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেয়েছিস?

—হ্যাঁ, বাড়ি যান আমি যাচ্ছি।

—এখানেই বসি না, ব'সে কথাবার্তা কই?

না না, এখানে নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি সব শোন।

দীননাথ এ-বগলের নথিপত্র ও-বগলে চালান করিয়া বলিল, বাড়িতে ছেলেপিলে-গুলো বড্ড জ্বালায়। বৌমা এলে মলের আওয়াজে —?

সরলার মল যে সব সময় বাজে না এ-কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে কেমন লোকের মেয়ে এ-বিষয়ে একটা মন্তব্য করিয়া দীননাথ বাড়ি গেল। খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে। ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার স্বহস্তে রোপিত তুলসী গাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবু-নিবু অবস্থায়, আর কোথাও আলো নাই। বেড়া ডিঙাইয়া ও বাড়ির আলো খানিকটা শোবার চালে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরে গিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সরলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল, একটা বিড়িও ধরাইয়া লইল। তারপর সরলাকে একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও-বাড়িতে।

তখন উঠিয়া বসিল সরলা। এ-বাড়িতে এক বছর রাণীর মতো যে মল বাজাইয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলিল। এমন হাল্কা মনে হইতে লাগিল পা দু'টিকে সরলার। লঘুপদে সে নামিয়া গেল উঠানে। বেড়ার ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও-বাড়ির একমাত্র কালিপড়া লণ্ঠনটা জ্বলিতেছে বড় ঘরে এবং ও-ঘরেই আসর বসিয়াছে তিন ভাই-এর, দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ীর শরীরটা রহিয়াছে আড়ালে, শুধু দেখা যাইতেছে মালা-জপ-রত হাত। রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়াই বেড়ার ওপাশে ও-বাড়ির উঠানের একটা প্রান্তে যাওয়া যায়। সরলা সেদিকে গেল না, একেবারে নামিয়া গেল ও-বাড়ির রান্নাঘর ও তার লাগাও ক্ষেন্তির ঘরের পিছনে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। কি অন্ধকার চারিদিক। ভয়ে সরলার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ছিটাল পার হওয়ার সময়ে পায়ে একটা মাছের কাঁটা ফুটিল। কিন্তু কি করিবে সরলা? ভয় করা আর মাছের কাঁটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন? একা মেয়েমানুষ সে, এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জুড়িয়াছে, রচনা করিতেছে ফাঁদ। কিসের ভয় এখন, কিসের কাঁটা ফোটা। আর যা হয় হোক, অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আর ছিটালে হাঁটার জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায়, পেটের ছেলেটা এবারও যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওয়ার আগেই। এলোচুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই, একটি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়াছে, এই যা ভরসা সরলার।

বড়ঘরের পিছনে কয়েকটা কলাগাছ আছে, ঘরের দুটো জানালাও আছে এদিকে। উঁচু ভিটার ঘর, জানালাগুলিও বেড়ার অনেক উঁচুতে। এত কষ্টে এখানে আসিয়া জানালার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল। তবে জানালার পাশে পাতা চৌকিতেই বোধহয় তিন ভাই বসিয়াছে, ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায়, শুধু বোঝা যায় না পুঁটি কালী শাশুড়ী ওদের মন্তব্য। কান্না এবং ঘরের

ভিতরের দৃশ্যটা দেখিবার ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

শম্ভুর গলা : কবার তো বললাম, এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢোকে না বদ্যি ? আমার দোকানে যা মনোহারী জিনিস আছে তার দাম একশ'র বেশিই হবে, ধরলাম একশ'। মাল না কেনার জন্যে হাতে জমেছে এক'শ দু'পাঁচ টাকা—ধরলাম একশ'। আর শ্বশুর-মশায় দিয়েছে তিনশ'। এই হল পাঁচশ', আমার ভাগ। তুই আর দাদা পাঁচশ' ক'রে দিলে দেড় হাজার। হাজার টাকার দোকান হবে ; হাতে থাকবে পাঁচশ'।

হাসি চাপিতে ক্ষেন্তির মুখের কাপড় গোঁজার আওয়াজ। দীননাথের গলা : বৌমা! বেহায়াপনা করো না বৌমা।

—কি জানিস শম্ভু, বড় বৌয়ের সব গয়না বেচে আর কুড়িয়ে-জড়িয়ে আমি না-হয় পাঁচশ' দিলাম, বদ্যি অত টাকা কোথায় পাবে। ছোটবৌমার গয়না বেচলে তো অত টাকা হবে না।

বৈদ্যনাথের গলা : শ'-তিনেক হয়তো ঢের। তবে আমার বিয়ের আংটি বেচলে—

শম্ভুর গলা : থাম বাপু তুই, সব সময় খালি ফাজলামি তোর।

দীননাথের গলা : যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোট বৌমার।

শম্ভুর গলা : যাক্ যাক্। কাজের কথা হোক। বদ্যি তবে আড়াইশ' দিক, লাভের আমরা যা ভাগ পাব ও পাবে তার আদ্দেক। ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে, আগে থেকে এসব কথা ঠিক করে না রাখলে পরে আবার হয়ত গোল বাধবে। যে যত দেবে তার তত ভাগ, ব্যস্ সোজা কথা ; সব গণ্ডগোল মিটে গেল।

একটু স্তব্ধতা। তার পর দীননাথের গলা : তবে আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু। তুই যে পাঁচশ' টাকা দিবি—

শম্ভুর গলা : পাঁচশ' নগদ নয়, একশ টাকার জিনিস, চারশ নগদ।

দীননাথের গলা : বেশ। চারশ'ই আমাদের একবার তুই দেখা। গয়নাগাঁটি সব বেচে ফেলবার পর শেষে তুই বলবি—

শম্ভুর গলা ক্রুদ্ধ : আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার ? ভাবছেন আমি ভাঁওতা দিয়ে—

চার-পাঁচটি গলার প্রতিবাদ। শম্ভুর গলা আরও ক্রুদ্ধ : সকলকে সমান সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস। আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না ! পাঁচশ' টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি, এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব, না আসতে চাও তোমরা না-ই আসবে। চাই না তোমাদের টাকা।

কোলাহল, কলহ, কড়া কথা, মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা। খানিকক্ষণ বাদে ব্যক্তিগত কথা। আবার ঝগড়া বাধিবার উপক্রম।

তারপর শম্ভুর গলা : বেশ কাল সকালে টাকা দেখাব।

দীননাথের গলা : গজেন স্যাক্‌রার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, সাড়ে উনত্রিশ দর দেবে বলেছে। কাল কাজে না গিয়ে গয়নাগুলোর ব্যবস্থা করব। যা লোকসানটাই হবে! এমনি সোনা হয় আলাদা কথা, তৈরি গয়না বেচার মতো মহাপাপ আর নেই। বৌমা বুঝি রাঁধে নি আজ? এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু। ও পুঁটি, ঠাঁই ক'রে দে তো আমাদের।

বাক্সে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু, কোথায় যে গেল সে টাকা। টাকার শোকে এবং ও-বাড়ির সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মতো চুল ছিঁড়িতে লাগিল। সরলা সান্ত্বনা না দিয়া বলিতে লাগিল, কি আর করবে বল? অদেষ্টের ওপর তো হাত নেই মানুষের। আমি ঘুমোচ্ছি, ঘরের দরজা খোলা, আর তুমি ও-বাড়িতে গিয়ে বসে রইলে রাত দশটা পর্যন্ত। আর ওই তো বাস্‌কে! শাবলের এক চাড়েই হয়তো ভেঙে গেছে। আমারই বা কি ঘুম, একবার টের পেলাম না।

দু-চোখে সন্দেহ ভরিয়া শম্ভু বলিল, টের পেয়েছ কি না পেয়েছ—

সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন করো না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি কর এখন, বাবাকে বলে আর কিছু টাকা—

—আর কি টাকা দেবে তোমার বাবা!

—সহজে কি দেবে? আমি কাঁদাকাটা করলে—

ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে এক বাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে? বাবা টাকা যদি না-ই দেয়—দেবে ঠিক, যদিও বলছি—আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।

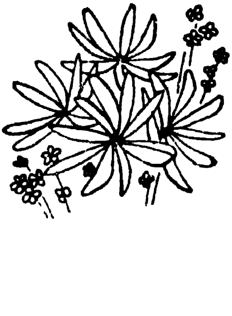

বিপত্নীকের বৌ

প্রতিমার বাবা নেহাৎ গরীব নন, প্রতিমাকে দেখিতে নেহাৎ খারাপ বলা যায় না। আরও কিছুদিন চেষ্টা করিলে বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো একটি কুমার বর তার জন্য অবশ্যই যোগাড় করা যাইত। তবু বিপত্নীক রমেশের হাতে তাকে সমর্পণ করাই বাপ-মা ভালো মনে করিলেন। একবার বিবাহ হইয়াছিল এবং বছর ছয়েক বয়েসের একটি ছেলে আছে এ দুটি খুঁত ছাড়া পাত্র-হিসাবে রমেশের তুলনা হয় না। মোটে একত্রিশ বছর বয়স, দেখিতে খুবই সুপুরুষ, তিনশ' টাকা মাহিনার চাকরি। উচ্চশিক্ষা, নম্রস্বভাব, সদ্বংশের গৌরব এ সবের অভাবও রমেশের নাই। এমন পাত্র হাতছাড়া করিবে কে?

রমেশ নিজেই মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল, বিবাহের আগে প্রতিমাও সুতরাং তাকে দেখিয়াছিল। দোজবরে শুনিয়া অবধি অদেখা ভাবী বরটির প্রতি প্রতিমার মনে যতখানি বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, রমেশের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তা কমিয়া যাওয়াই ছিল উচিত। তা কিন্তু গেল না। বিরুদ্ধভাবটা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। এ পর্যন্ত মনের বিরূপভাবটা ছিল একটি কাল্পনিক ব্যক্তির উপর, অতএব সেটা তেমন জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়াই, আর একটি মেয়ে যে চার পাঁচ বছর ধরিয়া তাকে ভোগ দখল করিয়াছিল, এ ব্যাপারটা প্রতিমার মনে ভয়ানক অশ্লীল হইয়া উঠিল। এ কারণটা জটিল। রমেশের আর কোনো পরিচয় তো সে তখনো পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াছিল। আগের স্ত্রীর সংগে বাহিরের এই রূপ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক কল্পনা করা প্রতিমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবী বরের কথা ভাবিতে গেলেই লোকটা তার মনে উদিত হইত দেদীপ্যমান কামনার মতো ঈষৎ স্থূলাংগী এক রমণীর আলিংগনাবদ্ধ অবস্থায়। বিতৃষ্ণায় প্রতিমার পবিত্র কুমারী দেহে কাঁটা উঠিত।

স্বামীর সম্বন্ধে প্রতিমার এই অশুচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল, স্বামীগৃহে মৃতা সতীনের একখানা বড় ফটো দেখিয়া। না, সেরকম মূর্তি বৌটার ছিল না যাকে দেখিলেই টের পাওয়া যায় রূপবান স্বামীকে ক্লেদাক্ত বাহুতে দিবারাত্রি বাঁধিয়া রাখা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। গোলগাল হাসিহাসি মুখখানা ভাসাভাসা চোখে সরল শান্ত দৃষ্টি, কোলে বছর দুয়েকের একটি ছেলে—নড়িয়া যাওয়ায় ফটোতে মুখখানা, ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। কাপড় পরিবার ভংগি, দাঁড়ানো ভংগি

সব মিলিয়া প্রমাণ করিতেছে বৌটি ছিল নেহাং গোবেচারী, ভালোমানুষ। রমেশের বৌ বলিয়া যেন ভাবাই যায় না।

ফটোখানা প্রতিমা দেখিল দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে গিয়া প্রথম দিন দুপুরবেলা, রাত্রে রমেশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই। বিবাহের পর প্রথম দফায় যে কদিন তাদের দেখাশোনা হইয়াছিল তার মধ্যে রমেশ একেবারেই স্ত্রীর কাছে ঘেঁষিবার চেষ্টা করে নাই তাই রক্ষা, সুন্দর স্বামীটির উপর যে নিবিড় ঘৃণার ভাব প্রতিমার মনে তখন ছিল, একটা সে কেলেঙ্কারি করিয়া বসিতে পারিত। এবার মানসীর ফটোখানা দেখিয়া মন একটু সুস্থ হওয়ায় রাত্রে রমেশ আলাপ করিবার চেষ্টা করিলে দু'চারটে প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিমা কার্পণ্য করিল না। রমেশের মৃদু কণ্ঠ, শান্তভাব ও উদাসীনের মতো কথা বলিবার ভঙ্গি ভালোই লাগিল প্রতিমার। জানে কি ভাবিতেছে লোকটা?—একেবারে অন্যমনস্ক! ভাবিতেও তাহা হইলে জানে? রং-করা সং-এর চেহারাটাই সর্বস্ব নয়! গালে ওই দাগটা কিসের? আহা, কামাইতে গিয়া গালটা এতখানি কাটিয়া ফেলিয়াছে!

রাত বাড়ে, প্রতিমার ঘুম পায়, শয়নের কথা রমেশ কিছুই বলে না। খাটের এক প্রান্তে সে এবং অপর প্রান্তে প্রতিমা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে তো বসিয়াই থাকে। কি রকম মানুষ? প্রতিমা যেরকম ভাবিয়াছিল সেরকম তো নয়। একটু যেন রহস্যের আবরণ আছে চারদিকে। রমেশ এক সময় বলিল, আগে থেকে এ সব বলে নেওয়াই ভালো, কি বল? তুমি তাহলে আমাকে বুঝতে পারবে আমিও তোমাকে বুঝতে পারব।

কি সব বলিয়া নেওয়া ভালো? প্রতিমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবু ঘাড় কাত করিয়া সে সায় দিল। শোনাই যাক স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণটা কি রকম হয়।

রমেশ বলিল, কেন আবার বিয়ে করলাম বলি। সহজে করতাম না। পাঁচ বছর একজনের সঙ্গে ঘরকন্না করে আবার আরেক জনের সঙ্গে—তুমি নিশ্চয় আমাকে অশ্রদ্ধা করছ। করছ না?

প্রতিমা ভদ্রতা করিয়া বলিল, না! তা কেন করব?

রমেশ বলিল, করছ বৈকি। সব শুনলে কিন্তু তোমার মায়াই হবে। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ও যখন মরে গেল, শোকে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকতে কখনো ভাবি নি এতখানি আঘাত পাব। সময়ে মনটা সুস্থ হবে ভেবে-ছিলাম, তাও হল না। কোনো কাজে মন বসে না, মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, কর্তব্যগুলি না করলে নয় তাই করে যাই, কিন্তু কি যে কষ্ট হয় তা কি বলব। কতদিকে আমার কত রকম দায়িত্ব আছে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে, আর কারো ওপর যে ওসব ভার দেব সে উপায়ও আমার নেই, আমি না দেখলে চারিদিকে অনিষ্ট ঘটবে। অথচ মনের অবস্থা এরকম যে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে বেশী। আগে বাড়িতে সকলের ছিল হাসিখুশির ভাব. এখন আমি মনমরা

হয়ে থাকি বলে কেউ আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, বাড়িতে কেমন একটা নিরানন্দের ভাব ঘনিয়ে এসেছে। মেজাজটাও গিয়েছে বিগড়ে, কথায় কথায় ধমকে উঠি, সেজন্যও বাড়িসুদ্ধ লোক কেমন ভয়ে-ভয়ে দিন কাটায়। ছেলেটা পর্যন্ত সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। প্রথমে অত খেয়াল করি নি, তারপর কিছু দিন আগে টের পেলাম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সুন্দর জীবনটা গড়ে তুলেছিলাম, আমার অবহেলায় তা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। বড় অনুতাপ হল। আমার একার শোক আর দশজনের জীবনে ছায়া ফেলবে এ তো উচিত নয়? এমন যদি হত যে সংসারে আমার কোনো কর্তব্য নেই, মনের অবস্থা আমার যেমন হোক কারো তাতে কিছু আসে যায় না, তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয়, শোক দুঃখ ভুলে আবার আমাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। তাই ভেবে চিন্তে আবার তোমাকে—

এমন করিয়া বুঝাইয়া বলিলে শিশুও বুঝিতে পারে। প্রতিমা বুঝিতে পারিল, বিবাহ উপলক্ষে রমেশ যে ফ্যাশন করিয়া চুল ছাঁটিয়াছে, গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া মুখখানা চকচকে করিয়াছে ওসব কিছু নয়। হাতকাটা শার্টটি পরায় ওকে যতই কলেজের ছেলের মতো দেখাক, আড়ালে মনটি সংসারী, সতর্ক, উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা কল্পনা প্রভৃতির বদলে সুবিবেচনায় ঠাসা। প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য নয়, ভোলা প্রয়োজন বলিয়া আবার সে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বছর যার সংগে ঘরকন্না করিয়াছিল তার জন্য শোক করিতে করিতে জীবনটা কাটাইয়া দিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু কি করিবে, আর দশজনের মুখ চাহিয়া শোকটা কমানো অপরিহার্য একটা কর্তব্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং এ তো জানা কথাই যে রমেশ বিশেষরূপে কর্তব্যপরায়ণ।

কিন্তু তাকে করিতে হইবে কি? ভিজা ন্যাকড়ায় শ্লেটের লেখা মোছার মতো রসালো ভালবাসায় স্বামীর মনের স্মৃতিরেখা মুছিয়া দিতে হইবে। ঘুমের ঘোরটা প্রতিমার কাটিয়া যায়। রমেশ গম্ভীর বিষণ্ণ মুখখানা এক নজর দেখিয়া সে ভাবিতে থাকে যে এসব কথা তাকে বলিবার কি প্রয়োজন ছিল, এ কোন্ দেশী বোঝাপড়া! তার যেটুকু রূপযৌবন আর মানুষ ভোলানোর ক্ষমতা আছে তার এক কণা কি সে বাপের বাড়ি ফেলিয়া আসিয়াছে? আস্ত মানুষটা সে আসিয়া হাজির, যে দরকারেই লাগাও বাধা দিতে বসিবে না। কে জানে রমেশ ভাবিয়া রাখিয়াছে কিনা যে মেয়েদের একটা গোপন রিজার্ভ ফন্ড থাকে স্নেহ মমতা ও মাধুর্য রচনা শক্তির, আগে হইতে বলিয়া রাখিলে ওখান হইতে প্রয়োজন মতো আমদানি করিয়া বিশেষ অবস্থায় একটি মানুষের শোকের তপস্যা মেয়েরা ভঙ্গ করিতে পারে।

এত প্রতিমা বুঝিতে পারে না যে দশজনের মুখ চাহিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অশ্রদ্ধার বদলে তার মায়া হওয়া উচিত কেন। আত্মীয়স্বজন, দায়িত্ব কর্তব্য এইসব যাকে ভুলাইতে পারে নাই, একটি স্ত্রী পাওয়া মাত্র সে আনন্দে ডগমগ হইয়া আবার বাঁচিয়া থাকার স্বাদ পাইতে

আরম্ভ করিবে, এ তো শ্রদ্ধা জাগানোর মতো কথা নয়। স্ত্রীর প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করার চেয়ে এ ঢের বেশী মানসিক দুর্বলতার পরিচয়!

আরও অনেক কথা রমেশ সে রাত্রে বলিয়া গেল; রাত তিনটার আগে তারা ঘুমাইল না। বাড়ির লোকে টের পাইয়া ভারি খুশি। এ পর্যন্ত নববধূর সঙ্গে সে ভালো করিয়া কথা পর্যন্ত বলে নাই জানিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়িতে অনেক লোক, অনেক কাজ, অনেক বৈচিত্র্য। হৃদয়ে হৃদয়ে রকমারি স্নেহের ফাঁদ পাতা আছে। প্রতিমাকে আটক করিবার চেষ্টার কেহ কসুর করিল না। বৌকে যে কোন বাড়িতে এত খাতির করে প্রতিমার তা জানা ছিল না। সকলের কাছেই সে যেন অশেষরূপে মূল্যবান। কাজ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় না, সংসারের গোলমাল হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখা হয়। রমেশের সৌখীন সেবাটুকু ছাড়া প্রতিমার কোনো কর্তব্য নাই। দিনে রাত্রে সব সময় সে যাতে স্বামী-দর্শনের সুযোগ পায় বাড়ির ছেলেবুড়ো যেন তারই ষড়যন্ত্র করিয়া মরে। প্রতিমার বুঝিতে বাকি থাকে না সকলে কি চায়। এক বছর আগে মরিয়া যে বৌ আজও এ গৃহে জড়বস্তুতে ও বিভিন্ন চেতনায় অক্ষয় অমর হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাড়াতাড়ি তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। সে যে বিপুল ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে শীঘ্র ভরাট হইয়া উঠা চাই। রান্না খাওয়া প্রভৃতি নিত্যকার তুচ্ছ সাংসারিক কাজে নিজেকে একবিন্দু ক্ষয় করিবার প্রয়োজন প্রতিমার নাই, যা কিছু তার আছে একমনে সব সে ব্যয় করুক মৃতা সতীনের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে। হাসি-গল্প-গানে-বাজনায় উথলিয়া উঠিয়া রমেশকে সে ভাসাইয়া লইয়া যাক, তার ভাঙা বুক জোড়া লাগিয়া দেখা দিক আনন্দ, উৎসাহ, প্রণয়ের প্রাচুর্য। হাসি চাই, হাসি। অম্লান, অপর্যাপ্ত হাসি।

হাসি প্রতিমার আসে না, মাধুর্য শুকাইয়া উঠে। এমন ছিল নাকি তার সতীন, এই ক্ষুদ্র পারিবারিক সাম্রাজ্যে এতবড় প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী? রমেশ হইতে বাড়ির দাসীটির মন পর্যন্ত এমনভাবে সে জুড়িয়া ছিল? এমন অসহ্য বেদনা সে রাখিয়া গিয়াছে যে মুক্তিলাভের জন্য বাড়িসুদ্ধ লোক এতখানি পাগল? সকলে যত ব্যাকুল হইয়া নীরবে তাহাকে প্রার্থনা জানায়, ভুলাও ভুলাও, সে মায়াবিনীকে ভুলাইয়া দাও, প্রতিমার তত মনে পড়ে সতীনকে। কী মন্ত্র না জানি জানিত সেই গোলগাল মুখওলা বৌটি।

নন্দা নন্দা বলে, কেন মুখ ভার করে আছ, বৌদি ভাই? বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে? বল ত আজকে তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দিই, দু'দিন থেকে মন ভালো করে এসো। তোমার শুকনো মুখ দেখলে আমাদের যে তাকে মনে পড়ে বৌদি? বাপের অসুখ শুনেও তাকে আমরা পাঠাই নি, দু'দিন ধরে চোখের জল ফেলেছিল। তাই না আমাদের এমন শাস্তি দিয়ে চলে গেল।

এ আরেকটা দিক। প্রতিমা মুখ ভার করিলে তার কথা সকলের মনে পড়িয়া যায়, প্রতিমা হাসিলে সকলে অবাক হইয়া বলে, ওমা এ যে অবিকল সেই আবাগীর হাসি গো? নানা লোকে মৃতা সতীনটির সঙ্গে প্রতিমার নানারকম সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। পিছন হইতে দেখিলে প্রতিমার চলন যে তার মতো দেখায় এটা আবিষ্কার করে ছোটবৌ বিমলা। তার বালা আর তার চুড়ি যে আশ্চর্য রকম মানাইয়াছে প্রতিমার হাতে, এটা আবিষ্কার করে আরেক মন্দা ননদা। বিধবা একজন পিসী থাকেন বাড়িতে, তার আবিষ্কারগুলি আরও ব্যাপক ও গুরুতর। প্রখর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিমার প্রত্যেকটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করেন, বলেন, ও নন্দা, ও নন্দা দ্যাখসে। বৌ-এর চিবুক দ্যাখ, গলা দ্যাখ, ছুঁচোলো কনুই দ্যাখ। বাঁকাও দিকি বৌ হাতখানা—দেখলি নন্দা ও নন্দা দেখলি!

কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, আলতা-পরা পায়ের গোড়ালি, ভ্রূ আর কানের মাঝখানের অংশটা সব প্রতিমা একজনের কাছে ধার করিয়াছে। সমগ্রভাবে দেখিলে প্রতিমা অবশ্য অন্যরকম, সে ছিল দিব্যি মোটাসোটা রাজরাণীর মতো জমকালো, প্রতিমা ক্ষীণাঙ্গী। তবু পিসীর মতো শ্যেন দৃষ্টিতে প্রতিমার দেহটা নানা অংশে ভাগ করিয়া একবার সকলে মিলাইয়া দেখ তো সেই হতভাগীর যে ছবি স্মৃতিপটে আঁকা আছে তার সঙ্গে। রমেশ যে এত মেয়ের মধ্যে প্রতিমাকেই পছন্দ করিয়াছে, সে কি এমনি? এই মিলের জন্য।

একদিন প্রতিমার হাত হইতে পান লইবার সময় রমেশ বলিল, জানো নতুন বৌ, তোমার আঙুলগুলি ঠিক তার মতো।

আঙুলগুলি পর্যন্ত তার মতো? রাগে প্রতিমার মন জ্বালা করিয়া উঠিল। রমেশের স্মৃতিময় আবেগকে রূঢ় আঘাত করিবার জন্য না বোঝার ভান করিয়া বলিল, কার মতো গো? আর কেউ আছে নাকি তোমার, ভালবাসার কেউ?

রমেশ চমক ভাঙিয়া বলিল, কি বলছ? ছি! তোমার দিদির কথা বলছি।

—আমার দিদিকে তুমি আবার দেখলে কোথায়? বিয়ের সময় সে তো আসে নি!

—সে নয়।—মানসী! তোমার নখগুলি যেমন ডগার দিকে ঢেউ তোলানো, মানসীরও এমনি ছিল।

এবার প্রতিমা মুখের কৌতুকোচ্ছলতার ছাপ মুছিয়া ফেলিল, বলিল, তোমার আগেকার বৌ? তাঁর নাম বুঝি মানসী ছিল?

রমেশ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—তুমি জানতে না? এ্যাদ্দিন এসেছ এখানে, তার নামটাও শুনে রাখ নি?

প্রতিমা মলিনমুখে বলিল, কে বলবে বল? দিদির কথা কেউ আমাকে কিছু বলে না।

রমেশ সাগ্রহে বলিল, শুনবে নতুন বৌ? শুনবে তার কথা?

—শুনব, বলো।

মানসীর কথা বলিতে বলিতে রমেশের গলা ধরিয়া আসে। প্রতিমার অপরিমিত ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এ বাড়ির সকলে তার সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিহাস জুড়িয়াছে। মানসীকে ভুলিবার ছলে তাকে আনিয়া মানসীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার মধ্যে। তার মৌলিকতা অচল এ বাড়িতে, সে মানসীরই নূতন রূপ—অচিন্ত্য অব্যক্ত দেবতার প্রতিকৃতির মতো সেও সকলের নিরাকার ব্যাপক শোকের জীবন্ত প্রতিমা। মানসীর সঙ্গে সে সব দিক দিয়াই পৃথক, তবু মিলের তাই অন্ত নাই। ব্যথায় পূজা নিবেদন করার জন্য সকলে তাকে মানসীর প্রতিনিধির মতো খাড়া করিয়া দিয়াছে!

একদিন প্রতিমা স্বামীকে বলিল, খোকা কোথায় আছে?

রমেশ বলিল, বড় পিসীর ওখানে।

—আনবে না তাকে?

—তুমি বললেই আনব!

প্রতিমা অবাক হইয়া বলিল, আমার বলার জন্যই কি অপেক্ষা করছিলে? তোমাদের ব্যবহারে আমি সত্যি থ' বনে যাচ্ছি। কাউকে একদিন খোকার কথা বলতে পর্যন্ত শুনলাম না এসে থেকে। কেন তা বুঝিনে কিছু।

রমেশ বলল, আমি বারণ করে দিয়েছিলাম নতুনবো'। এখানে তোমার মনটন বসবে তারপর—

—খোকার দিকে মন দেবার সময় পাব? কি চমৎকার বোঝ তোমরা মানুষের মন!

দু'দিন পরেই খোকা আসিল। বেশ মোটাসোটা লম্বাচওড়া ছেলে, কোলে করা কষ্টকর। তবু সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে দেখিয়া কোনো রকমে প্রতিমা তাকে একবার কোলে করিল। বড় লজ্জা করিতে লাগিল প্রতিমার। প্রসব না করিয়া সে এতবড় ছেলের মা? খোকাও নূতন লোকের কোলে উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। পরের বাড়ির ছেলের সঙ্গে ভাব করার মতো করিয়া ছেলেকে যদি প্রতিমা আপন করিবার সুযোগ পাইত, মাতা-পুত্রের প্রথম মিলনটা হয়ত এমন নীরস হইত না। কিন্তু সে যে মা এবং নতুনবো, হাসি আর ছেলেমানুষী কথা দিয়া শুরু করিয়া ধীরে ধীরে কাছে আগাইবার উপায় তো আর নাই, ছেলে কাছে আসিলে প্রথমেই বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আর ঘোমটার ফাঁকে তাকে চুমু খাওয়া চাই।

ছেলে তো আসিল, একটু মায়াও ওর দিকে প্রতিমার পড়িল, কিন্তু মৃতা সতীনের ছেলেও কম বিপজ্জনক পদার্থ নয়। একটা কঠিন সমস্যার মতো। আদর যত্ন ভালবাসা সব সতর্কভাবে হিসাব দিতে হয়, কম হইলে লোকে ভাবিবে, সতীনের ছেলে বলিয়া অবহেলা করিতেছে; বেশী হইলে ভাবিবে, সব লোক-দেখানো। আঠারো বছর বয়সের ভাবপ্রবণ মনে এ ধরনের সতর্কতা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন। হিসাবও সব সময় ঠিক হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে পদে পদে এমনি

অভিনয় করিয়া চলিবার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সে পাইবে কোথায় ? ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে বসিয়া প্রতিমা যদি একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যায়, চমক ভাঙিয়া সভয়ে সে চারিদিকে লক্ষ করে, কেহ তাকে বিমনা দেখিয়াছে কিনা। খোকার অসংখ্যা শিশুসুলভ অন্যায় আব্দার প্রতিমার অসংখ্য বিপদ কি করিবে প্রতিমা ভাবিয়া পায় না। আব্দার রাখিলে খোকার ক্ষতি, তাতে নিন্দা হয়। না রাখিলে খোকা কাঁদে, তাতেও নিন্দা হয়। ভরা পেটে খোকার হাতে সন্দেশ দিয়া প্রতিমা শুনিতে পায়, শাশুড়ী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, ওর সে বিবেচনা কোত্থেকে হবে নন্দা যে বলছিস্ ? নাড়ীর টান তো নেই।

পরদিন ভরা পেটে আবার সন্দেশের জন্য খোকা কাঁদে। প্রতিমা তাকে কাঁদায়, সন্দেশ দেয় না। মুখ ভার করিয়া পিসীমা আসিয়া খোকাকে কোলে নেয়, ভাঁড়ার খুলিয়া খোকাকে সন্দেশ দেন, তারপর করেন স্থান ত্যাগ। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া যায়।

খোকাকে উপলক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে টের পাইতে থাকে, অতিরিক্ত স্নেহ যত্নের তলে তলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাবও সকলের আছে। এ বাড়ির মনগুলি যতক্ষণ তাকে টানিকের মধ্যে ব্যবহার করিতে পারে ততক্ষণ কৃতজ্ঞ ও স্নেহশীল হইয়া থাকে কিন্তু যখনি প্রতিমার একটি বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সচেতন হইয়া উঠে যাহা এ বাড়ির কারো কোনো কাজে লাগিবার নয়, প্রতিমাকে তখন সে আঘাত করে। তখন সে প্রতিমার সমালোচক।

দিন কাটে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রতিমার ঘোমটা কমিতে থাকে, চলা-ফেরায় স্বাধীনতা বাড়ে, সুখ-সুবিধার অতিরিক্ত কতকগুলি ব্যবস্থা হয়, মানসীর সঙ্গে প্রতিমার মিল খুঁজিবার উৎসাহে সকলের ভাটা পড়ে, তবু না হয়, প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন, না দেয় কেহ তাহাকে বাঁচিবার জন্য একটি সহজ স্বাভাবিক জগৎ। আর একজন যে তার আসনে পাঁচ বছর বধূ-জীবনের বিচিত্র তপস্যায় ব্যাপৃত ছিল প্রতিমার জীবনকে এই সত্য অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এক-বার একমাসের জন্য বাপের বাড়ি ঘুরিয়া আসিল। খোকাকে সঙ্গে না আনা উচিত হইয়াছে কিনা, ভাবিয়াই মাসটা কাটিল প্রতিমার। বাপের বাড়িতেও মন খুলিয়া সকলের সঙ্গে সে মিশিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত জ্বালাভরা আনন্দ উপভোগের জন্য সত্যমিথ্যা জড়াইয়া প্রাণপণে শ্বশুরবাড়ির নিন্দা করিল এবং সেজন্য বিষণ্ণ ও উন্মনা হইয়া রহিল। কে কি ভাবিবে ভাবিয়া কাজ করার অভ্যাসটা প্রায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল, বাপের বাড়িতেও তাহাকে চলাফেরা অনেকটা পরের ভাবনাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, বিবাহের পর যেমন হয় প্রতিমা তেমনি হইয়াছে—পর হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা আর সে প্রতিমা নাই।

তবু, সব প্রতিমার সহ্য হইত রমেশকে যদি সে ভালবাসিতে পারিত। ঘৃণার ভাব

কোন্ কালে মুছিয়া গিয়াছিল, শ্রদ্ধা আসিতেও দেরি হয় নাই। রূপে গুণে মানুষটা অসাধারণ, সরল সহজ ব্যবহার, গাম্ভীর্যের অন্তরালে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, রাগী কিন্তু সুবিবেচক। এ ধরনের পুরুষের সাহচর্য মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর, এদেরি তারা স্বেচ্ছাদাসী। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনে রমেশ খুব যে বেশী ত্রুটি করে তা নয়, তবু স্বর্গীয়া সতীনের বিরুদ্ধে প্রতিমার অকথ্য ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনের সহজলভ্য সুখের পথেও কাঁটা দেয়। মানসীকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া রমেশের পক্ষে এখনো সম্ভব নয়, আজও সে অন্যমনে তার কথা ভাবে, কণ্ঠলগ্না প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া আজও সে তারই কণ্ঠবেষ্টন করিতে যায়, যে কোথাও নাই। এক একদিন রমেশের চুম্বন পর্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, প্রতিমা স্পষ্ট অনুভব করে দড়ি ছিঁড়িবার মতো স্বামীর বাহুবন্ধন হঠাৎ শিথিল হইয়া গেল, নিভিয়া গেল চুম্বনের আবেগ। তা যাক, তাও হয়তো প্রতিমা গ্রাহ্য করিত না। হয়তো এইজন্যই সে স্বামীর মনজয় করিবার তপস্যা তীব্রতর করিয়া তুলিত, একটা মৃতা রমণীর কাছে হার মানিবার অপমান এ বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু জয় করিতেই অনেক বাধা, অনেক লজ্জাকর বেদনাদায়ক অন্তরায়। রমেশকে যখন সে মুগ্ধ করে, অতীতের দিক হইতে তার দৃষ্টি যখন সে ফিরাইয়া আনে নিজের দিকে, রমেশের প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও মোহস্নিগ্ধ চাহনি আনন্দের বদলে তাকে যেন লজ্জা দেয়। সে যেন অনুভব করে এ ভাষা উচ্চারিত, এ চাহনি পুরাতন। যে কথা মানসীকে বলিত, যে চোখে মানসীকে দেখিত আজ সেই দৃষ্টিই রমেশ তাকে নিবেদন করিতেছে। এসব পুরানো অভিনয়, অভ্যস্ত প্রণয়। রমেশের জীবনের স্তব্ধ নিশুতি রাত্রে এসব বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুনরাবৃত্তি আর প্রতিধ্বনি। আর কিছু নয়।

আর জয় করিবার সাধ থাকে না, রমেশকে ক্ষুব্ধ করিয়া প্রতিমা সরিয়া যায়। ভিতরে কে যেন সরমে মাথা হেঁট করিয়াছে। ক্ষোভে প্রতিমার চোখে জল আসে, ছবিতে দেখা একটি নারীর প্রতিহিংসার অন্ত থাকে না। কত সাধ ছিল প্রতিমার, কত কল্পনা ছিল, সব পর্যবসিত হইয়াছে এক বিপন্ন বিস্বাদ আত্মনিয়োগে—কর্তব্যেও নয়, খেলাতেও নয়, জীবনযাপনের অপরিচ্ছন্ন প্রয়োজনে।

এরকম সময়ে স্বামীর প্রতি প্রতিমার সেই গোড়ার দিকের ঘৃণার ভাবটা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়া আসে। এত যদি অবিস্মরণীয় প্রেম তার মানসীর জন্য, একি অপদার্থ সে যে প্রতিমাকে সাময়িকভাবেও তার ভালো লাগিল? একজনের স্মৃতি-পূজায় আত্মহারা অবস্থাতেও আর একজন যাকে মুগ্ধ করিতে পারে, শ্রদ্ধা করিবার মতো কি আছে তার মধ্যে?

রমেশ জিজ্ঞাসা করে, এখানে তোমার মন টিকিল না কেন প্রতিমা?

প্রতিমা পাল্টা প্রশ্ন করে, আমার মনের খবর তোমাকে কে দিলে?

—অন্যলোকের দিতে হবে কেন, আমি নিজে টের পাই না? মন খুলে যেন

মিশতে পারছ না, কেমন স্ফূর্তি নেই। কেউ কিছু বলে না তো তোমাকে? আদর যত্ন করে তো সকলে?

প্রতিমা হাসে, মাগো, তা আর ক'র না। আদর যত্নের চোটে হাঁপিয়ে উঠলাম। আমায় নিয়েই তো মেতে আছে সবাই।

রমেশ বলে, তুমি সবাইকে নিয়ে ওরকম মাততে পারলে বেশ হত। আমি তাই চেয়েছিলাম।

প্রতিমার ইচ্ছা হয় একবার জিজ্ঞাসা করে, আমার মন বসছে না বলছ, আমাকে কেন মনে ধরছে না তোমার? শুধু ভদ্রতা না করে ভালবাসা দিয়ে দ্যাখো না মন বসে কিনা আমার!

সমস্ত বাড়িতে মানসীর স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো, সেগুলি প্রতিমাকে পীড়ন করে। খান তিনেক বাঁধানো ফটোই আছে মানসীর। একখানা তার শয়নঘরে, একখানা রমেশ যে ঘরে কাজ করে সেখানে, আর একখানা শাশুড়ীর ঘরে। ফটোয় মানসীকে দেখিয়া যদিও তার মনে হয় না সখ ও সৌখীনতায় তার কোনো বিশেষত্ব ছিল, হাতের যে রাশি রাশি শিল্পকর্ম রাখিয়া গিয়াছে সেগুলি অবাক করিয়া দেয়। পাঁচ বছরের নানা কাজের ফাঁকে এত বাজে কাজের সময় সে পাইত কখন? বাড়ির অর্ধেকের বেশী আসবাবও নাকি তারই পছন্দ করিয়া কেনা। গান জানিত না, তবু সখ করিয়া সে অর্গান কিনাইয়াছিল, তাই বাজাইয়া আজ প্রতিমাকে গান গাহিতে হয়। মানসীর ড্রেসিং টেবিলে তার প্রসাধন, মানসীর কয়েকটি বাছা বাছা গহনা তার আভরণ, মানসীর ব্যবহৃত খাটে তার শয়ন। মানসীর জামা-কাপড়ে বোঝাই বাক্স-প্যাটরায় বাড়ি বোঝাই। আরও কত অসংখ্য খুঁটিনাটি সে রাখিয়া গিয়াছে।

বধূত্বের নূতনত্ব কমিয়া আসিলে মানসীর গয়না ক'খানা প্রতিমা খুলিয়া রাখিল। সকলে তা লক্ষ্য করিল, শাশুড়ী খুঁতখুঁত করিলেন তবে বিশেষ কেহ কিছু বলিল না। কিন্তু কয়েকটি গয়না খুলিয়া রাখিলে কি হইবে। ব্যবহার্য, অব-হার্য পদার্থ যত কিছু মানসী রাখিয়া গিয়াছে চারদিকে, প্রকট হইয়া থাকা নিবারণ করিবে কে? মনের স্মৃতিচিহ্ন এ বাড়িতে সে মৃতা রমণীকে অমরত্ব দিয়াছে।

নন্দা বলে, জান বৌদি, ওই যে আলমারিটা সাফ করে বাজে জিনিস রাখছ, ওটা ছিল তার সখের সামগ্রী। ওপরের তাকে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি সাজিয়ে রাখত, রোজ সকালে উঠে প্রণাম করত।

—ঠাকুর-দেবতারা গেল কোথায় ভাই?

—কে জানে দাদা কোথায় রেখেছে। মূর্তিগুলোর ওপরে দাদা খড্ড রেগে গিয়ে-ছিল সে স্বর্গে যাবার পর।

প্রতিমা বলে, সেই থেকে তোমার দাদার স্বভাবটা রাগী হয়ে গেছে, না ভাই?

নন্দা বলে, কেন, দাদা রাগারাগি করেছে নাকি তোমার সঙ্গে?

প্রতিমা হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দেয়, বলে. বিয়ে হলে বুঝবে বরের রাগারাগিও কত মিষ্টি—শুধু মিষ্টি ব্যবহারের চেয়ে। একদিনও যদি রাগারাগি না হয় তবে বুঝবে বরের মনে কিছু গোলমাল আছে।

মৃতার জন্য স্বামীর মনের গোলমাল চিরস্থায়ী হইবে একথা প্রতিমা যে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিল সেটা আশ্চর্য নয়। স্বামী ভিন্ন যে কুলবধূর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের পদার্পণ ঘটে না, তার সরলতা অনিন্দ্য, সে বিশ্বাসী। বিবাহের পরেই স্বামীর ভালবাসার শুরুকে সে অনায়াসে ভালবাসার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে, প্রেমের পরবর্তী অগ্রগতি তার জীবনের অফুরন্ত বিস্ময়। মানসীর স্মৃতিতে রমেশকে মশগুল দেখিয়া কোনো জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় প্রতিমা ভাবিতে পারিত মৃত্যুই, স্মৃতি কর্পূরধর্মী, জীবনে জীবিত ও জীবিতাদের আকর্ষণই সবচেয়েই জোরালো, যাকে মনে করিলে কষ্ট হয়, চিরকাল কেহ তাহাকে মনে করে না? ঈর্ষায় প্রতিমা যে মনের দল মেলিয়া ধরিল না তাতে রমেশের কাছে তার একটি রহস্যময় আবরণ রহিয়া গেল, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছোট বড় প্রকাশ রমেশকে তার সম্বন্ধে যত সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিল, এই রহস্যের অনুভূতি তার মনের গোলমালের তত বেশী জোরালো প্রতিষেধক হইয়া উঠিতে লাগিল।

বছর ঘুরিয়া আসিতে আসিতে জন্মিয়। গেল কত অভ্যাস, সৃষ্টি হইল কত অভিনব রসাস্বাদ। মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য আসিয়া থাক, প্রতিমা তো একটি নিজস্ব জগৎ সঙ্গে আনিয়াছে। মানসীর ফাঁকটাতে খাপে খাপে তাকে বসানো অসম্ভব। কোথাও প্রতিমা আঁটে না, কোথাও সে ছোট হয়। মানসীর সঙ্গে তার যত পার্থক্য সব দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। প্রতিমার দোষগুণ যে বিরক্তি ও ভালবাসার সৃষ্টি করে তার অভিনবত্ব বিচলিত করিয়া করিয়া সকলকে শেষে আর বিচলিত করে না, প্রতিমার দোষগুণের মতো করিয়াই সকলের মানিতে হয়। তা'ছাড়া মানসীর মতো করিয়া পাইতে চাহিলে প্রতিমাকে কেহ পায় না, মানুষকে পাইয়া চাহিতে না পারিলে ভালো লাগিবার কথা নয়। অথচ প্রতিমার স্বামীর আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া কাছে গেলে বড় সুন্দর একটি হৃদয়ের পরিচয় মেলে।

যেভাবে মানসীর সঙ্গে সকলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইভাবেই প্রতিমাও সকলকে বাঁধিতে ও বাঁধা পড়িতে থাকে। খোকা 'মা' বলিয়া ডাকিলে প্রতিমার আর একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে না, মোটামুটি ভালোই লাগে যদিও ছেলেটার জন্য তার যে মায়া তাকে বাৎসল্য বলা যায় না। শাশুড়ী ননদ জা' এদের সঙ্গে বাড়ির বৌএর যে সম্পর্ক আধখানা মন দিয়েই সুষ্ঠুভাবে তা

বজায় রাখিতে পারা যায়, প্রতিমা সেটা দিতে পারে।

সবই যেন একরকম সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, শুধু রমেশকে প্রতিমা নিজের জীবনে মানাইয়া লইতে পারে না। প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মতো রমেশের মন হইতে মানসীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তাহার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে গভীর বিষাদ ঘনাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে।

তা তো সে করে নাই? কতদিন মানসীর ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে তার সাধ গিয়াছে ফটোখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেখানে যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে সে মায়াবিনীর, ভাঙিয়া সব গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু যাচিয়া রমেশের মন হইতে তাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা সে আর কতটুকু করিয়াছে?

দেবীপক্ষে প্রতিমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের রাত্রি একদিন ঘুরিয়া আসিল। গোপনে রমেশ সেদিন ফুল আর সোনার উপহার কিনিয়া আনিল। গম্ভীর চাপা লোকটির মধ্যে একটা সুগভীর উত্তেজনা, আজিকার বিশিষ্ট রাত্রিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার উৎসুক প্রত্যাশা সবই প্রতিমার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। খুশি কিন্তু হইতে পারিল না। বোধ করিল মৃদু একটি বিস্ময়, একটা গ্লানিকর অস্বস্তি।

কি ভাবিয়া রমেশের আনা ফুলের মালা একটি প্রতিমা মানসীর ফটো বেষ্টন করিয়া টাঙাইয়া দিল। দীর্ঘকালের তীব্র উত্তপ্ত ঈর্ষায় প্রতিমার মন জুড়িয়া ওর স্থায়ী স্থানলাভ ঘটিয়াছে। ওর কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছে যে নিজের বিবাহের রাত্রেও ওকে ভুলিবার তার উপায় নাই। এমনি আশ্চর্য যোগাযোগ যে প্রতিমাকে চুম্বন করিয়া মুখ তুলিতেই মানসীর ফটোর দিকে রমেশের চোখ পড়িল। সে বলিল, ওর ফটোতেও মালা দিয়েছ? তুমি তো বড় ভালো প্রতিমা? প্রতিমা অনুভব করিল, তীক্ষ্নধার ছুরির ফলায় দাঁড় কাটিবার মতো মানসীর স্মৃতি ক'মাস আগেও রমেশের যে বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া দিত, জীবন্ত সাপের মতো সেই বাহু দুটি আরও জোরে তাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। রমেশের যে চুম্বন ছিল শুধু ওষ্ঠের স্পর্শ, আজ তা প্রেমের আবেগে অনির্বচনীয়।

সহসা প্রতিমা কাতর হইয়া বলিল, 'ছাড় ছাড়, শিগ্‌গির ছাড় আমায়!'

কি হল?—রমেশ ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

'দম আটকে গেল আমার। ছাড়ো।'

স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিয়া গেল। ঘরে পর্যন্ত থাকিল না। বিদ্যুতের আলো মানসীর ফটোর কাচ প্রতিফলিত হইয়া চোখে লাগিতেছিল, প্রতিমার মনে হইয়াছিল সে যেন মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

প্রতিমা ছাদে পলাইয়া গেল। ছাদ ছাড়া বৌদের আর তো যাওয়ার স্থান নাই। অপরিবর্তনীয় আকাশ ছাদের উপরে, তাবার আলো মেশানো অপরিবর্তনীয় রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে। দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে? এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনোরাজ্যের সেই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে?

মানুষ হাসে কেন

পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রসময় ডাক্তারের বৈঠকখানা ডিসপেনসারিতে হাসি গল্পটা একটু বেশি জমিয়াছিল। হাসি গল্প রোজই চলে, পাড়ার দু'পাঁচজন ভদ্রলোক প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে আসিয়া জড়ো হয় তবে পাড়ার বিপিন সরকার যেদিন উপস্থিত থাকে, হাসি আর গল্প দুয়েরই মাত্রা চড়িয়া যায়। বিপিন বাড়ায় গল্পের পরিমাণ, হাসিটা বাড়ায় অন্য সকলে।

কেবল হাসে না রসময় আর তার কুড়ি টাকা বেতনের ছোকরা কম্পাউন্ডার রতন। ছোট ঘরোয়া ডিসপেনসারি, শিশি বোতল, সাজানো বুক-শেলফটি ধরিলে ওষুধের আলমারি হইবে সাড়ে তিনটি, সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ সাড়ে তিন শিশি ওষুধও বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ। বিরাট ডিসপেনসারি হইলেও এ-পাড়ায় এ-রাস্তার ধারে তার চেয়ে বেশি ওষুধ বিক্রয় হইত না। ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার দুজেনেই তাই হাসি গল্প শুনিবার অবসর পায়। রসময়ের তবু মোটামুটি পশার আছে, কখনো বাহিরে ডাক আসে। কখনো রোগী আসে, আগাগোড়া বন্ধুদের সশব্দ আনন্দে ভাগ বসানোর সুযোগ সে প্রায়ই পায় না, কোনোদিন একেবারেই পায় না। রতন কিন্তু আলমারির পিছনে তার ওষুধ তৈরির খোপে ঢুকিবার সরু পথটির সামনে সমস্তক্ষণ টুলে বসিয়া থাকে, রসময়ের রোগী দেখিবার খোপটির কাঠের দেওয়ালে আরামে হেলান দিয়া সকলের প্রত্যেকটি কথা শোনে। কিন্তু একটু মুচকি হাসিও কখনও হাসে না।

রসময়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারা, একটু ভুঁড়িও আছে। মাথার অর্ধেকের বেশি চুল তার সাদা, গোলগাল তেলতেলা মুখে চ্যাপ্টা চিবুকের উপরে চোখা নাক। সকলের হাসিতে যোগ না দিলেও তার ঠোঁটে একটু টান পড়ে, মুখের স্বাভাবিক মৃদু অমায়িক ভাব গভীর ও স্পস্ট হইয়া ওঠে। মুখের এই পরিবর্তনকে মুচকি হাসি নাম দিলেও দেওয়া যাইতে পারে। তবু, রতন যে আগাগোড়া মুখ গোমড়া করিয়া চাহিয়া থাকে, কেউ তা এক রকম খেয়ালও করে না, রসময়ের হাসির অভাবটাই সকলের নজরে পড়ে।

নিজের রসিকতায় বিপিন নিজে কদাচিৎ হাসে, তবু সে মাঝে মাঝে চটিয়া যায়। আড়ালে বন্ধুদের বলে, 'হাসবে কি, লোকটা বড় ভোঁতা। রসজ্ঞান নেই।'

পেনসনভোগী উমাচরণ রসিকতা করিয়া বলে, 'ভোঁতা? রসজ্ঞান নেই? এই বয়সে যে অমন একটি সুন্দরী তরুণীর পাণিগ্রহণ করতে পারে, তার মতো চোখা আর

রসে টইটম্বুর কে আছে? বলিয়া শীর্ণ গলায় জীর্ণ আওয়াজ চরমে তুলিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়াই সশব্দে হাসিতে আরম্ভ করে। হাসিতে হাসিতে উৎসুক দৃষ্টিতে রাস্তার আলোয় সঙ্গীদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া দ্যাখে। কারও মুখে হাসির চিহ্ন না দেখিয়া হঠাৎ নিজেও থামিয়া যায়। বিপিনের প্রায় প্রত্যেকটি রসিকতায় সকলে হাসে কিন্তু তার আরও জোরালো আরও যোগ-সই রসিকতাগুলিকে কেউ আমল দেয় না কেন উমাচরণ বুঝিতে পারে না। ঈর্ষায় তার বুক জ্বলিয়া যায়। সকলকে হাসানোর কত চেষ্টাই যে সে করে।

রোগী আসিলে সকলে হাসি থামায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সহজে থামায় যে নিজের নতুন গাড়িটার কথা রসময়ের মনে পড়িয়া যায়। রসময়ের হাসি পায়। ঠোঁট তার ফাঁক হইয়া যায়, কিন্তু সে হাসে না, রোগী আসিয়াছে বলিয়া গম্ভীর মুখেই রোগীর দিকে তাকায়।

পূর্ণিমার আগের সন্ধ্যায় রসময় বাড়ির ভিতর হইতে সকলের হাসি শুনিতেছিল। হঠাৎ হাসি থামিয়া যাওয়ায় বুঝিতে পারিল রোগী আসিয়াছে। বাড়ির ভিতরে রোগীও ছিল, হাসিও ছিল। রসময়ের মেয়ের নলিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, নলিনীর সাত বছরের ছেলে পল্টুর পোকায় ধরা দাঁতে ব্যথা হইয়াছে, বাড়ির পুরানো ঝি বুড়ীর পা ফুলিয়াছে এবং রসময়ের বড় ছেলে হেমন্তের বৌ সরস্বতীর মাথা ধরিয়াছে। হাসি চলিতেছিল রসময়ের নিচের ঘরে। হাসিতে হাসিতে তার বিধবা বোন সুহাসিনীর দম থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া আসিতে-ছিল। রসময়ের বৌ রাণী আর সুহাসিনীর মেয়ে অরুণা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল আর মিনিট খানেক গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ মিনিট খানেকের জন্য খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল রাণীর সখি উমাচরণের মেয়ে পূর্ণিমা।

মেয়েদের হাসানোর জন্যই গ্রামোফোনের হাসির রেকর্ড তৈরি, রসময় তা জানিত। তবু এদের এমন করিয়া হাসানোর মতো রেকর্ডে কি আছে আবিষ্কার করার জন্য ঘরের বাইরে বারান্দায় বসিয়া সবে গড়গড়াটি টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি করিয়া যে ঘরের মধ্যে সকলে তার উপস্থিতি টের পাইয়া গেল। সুহাসিনীর হাসির আওয়াজ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হইয়া গেল নিচে ডিসপেনসারির হাসি।

রতন আসিয়া বলিল, 'আপনাকে ডাকছে' বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

রসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে? হাসছ যে?'

রতনের হাসি যেন থামিতে চায় না। রসময়কে সে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে গেলে মুখে কথা আটকাইয়া যায়। কিন্তু কি যেন এক কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে, যার ফলে রসময়ের ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টির সামনেও বেয়াদপের মতো না হাসিয়া যে পারিতেছে না! তবে রসময় ধমক দিতেই সাউন্ড-

বক্ষের স্পর্শ বঞ্চিত রেকর্ডের মতো হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল, সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক বাতি নেভানোর মতো মুখে কৌতুকের দীপ্তি ঘুরিয়া দেখা দিল কালো ভয়ের ছাপ। আমতা আমতা করিয়া সে বলিল, 'আজ্ঞে না, এমনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় পা-টা হঠাৎ এমন পিছলে গেল—'

'তাতে হাসবার কি আছে?'

অন্য সময় রতন হয়তো কোনো কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা না করিয়াই চম্পট দিত, এখন একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ায় বোকার মতো বলিল, 'প্রথমে বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল, তারপর নতুন কাকিমার বাবার কথা মনে পড়ে হঠাৎ কি যে হল—'

রতন করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। একি কখনো মানুষকে বুঝানো চলে, ব্যাখ্যা করা চলে, কেন সে হাসিয়াছে? কারণটাই যে অর্থহীন, যুক্তিহীন, খাপছাড়া। রসময়ের মনে পড়িয়া যায়, আজ সকালে রাণীর বিপুলদেহ পিতৃদেব, তার নতুন শ্বশুরমশায় মেয়েকে দেখিতে আসিয়া পা-পিছলাইয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। নিচে পড়িয়া সেই বয়স্ক স্থূল মানুষটির কী কান্না! রতন তাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে আনিয়াছিল, তার হাস্যকর পতন ও ক্রন্দন দেখিয়াছিল হাত পা ধরিয়া টানিয়া দিয়া কপালের ফুলায় মলম মালিশ করিয়া শুশ্রূষাও করিয়াছিল। তখন রতনের মোটেই হাসি পায় নাই। দৃশ্যটি স্মরণ করিয়াই এখন হাসি পাইয়া গেল কেন?

নিচে নামার আগে রসময় একবার শয়নঘরের দরজায় উঁকি দিয়া গেল। রাণী মাথার ঘোমটা ইঞ্চি দুই বাড়াইয়া দিল, সুহাসিনী স্মিতমুখে বলিল, 'একটু শুনে যাও না দাদা? বড় মজার রেকর্ড। হাসতে হাসতে মরি আর কি! একজনের সোয়ামী অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে এসেছে, স্ত্রী তাকে চিনতেই পারল না। ভাবল, চোর ডাকাত হবে বুঝি! সোয়ামী যেই আদর করার জন্য স্ত্রীর দিকে দু'পা এগিয়েছে—'

রসময় চলিয়া গেলে হাসিমুখেই সুহাসিনী সকলকে শুনাইয়া নিজের মনে বলিল, 'দাদা যে এমন মুখ গোমড়া করে থাকে কেন বুঝি না বাপু। ছেলেবেলা থেকে এমনি স্বভাব। লরেল হার্ডির ছবি দেখে পর্যন্ত একবারটি হাসে না, যেন হাসা পাপ।'

রাণী তা জানে। সখি পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া সে শুধু মুচকিয়া একটু হাসিল। সুহাসিনীর মুখে দু'জন নাম করা ফিল্ম অভিনেতার নামের অদ্ভুত উচ্চারণ শুনিয়া পূর্ণিমা আগেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণিমা একটু তোতলা। কথা বলার চেয়ে কথায় কথায় হাসিতে সে বেশি ভালবাসে। তার হাসিতে তোতলামি ধরা পড়ে না।

রোগী আসে নাই, প্রতিবেশীর বাড়ি হইতে ডাক আসিয়াছে—পাশের বাড়ির প্রতিবেশী। দুটি বাড়ির মধ্যে ব্যবধান কেবল হাত তিনেক চওড়া একটা গলির।

কয়েকদিন আগে পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন রাত প্রায় ন'টার সময় এ্যাসপিরিন কিনিতে আসিয়া রসময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ও করিয়া গিয়াছে। নাম পরেশ, ছাব্বিশ সাতাশের বেশি বয়স হইবে না। রোগা লম্বা অতি সুদর্শন চেহারা, টুকটুকে ফর্সা গায়ের রঙ। কেবল হাতলহীন নাক-কামড়ানো চশমার জন্য একটু কেমন দেখায়।

পরেশ নিজেই রসময়কে ডাকিতে আসিয়াছিল, অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রসময়কে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিল, 'শীগগির আসুন ডাক্তারবাবু। আমার স্ত্রীর বুক ধড়ফড় করছে।'

রসময় কয়েকটি প্রশ্ন করিল, কিন্তু পরেশের স্ত্রীর যে ঠিক কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরেশ নিজেও জানে না। ব্যাপার এই, দুজনে তারা কথা বলিতেছিল হঠাৎ বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হওয়ায় পরেশের স্ত্রী বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, বলিয়াছে, 'শীগগির ডাক্তার ডাকো। আমার বুক ধড়ফড় করছে।'

পরেশের বিবর্ণ মুখ আর অধীরতা দেখিয়া আর বেশি কিছু রসময় জিজ্ঞাসা করিল না, রতনকে ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষার যন্ত্রটা আনিতে বলিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া পরেশের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

প্রতিবেশী—একেবারে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী। তবে নতুন আসিয়াছে, বিশেষ আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা একরকম নাই বলিলেও চলে, ফি'টা সম্ভবত ফাঁকি দিবে না। ফাঁকি দিলে অবশ্য কিছু বলা চলিবে না, পাশের বাড়িতে যারা থাকে তারা তো ধরিতে গেলে একরকম আধা ঘরের লোক। বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীর জন্য ডাক্তারি করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দোতলায় রোগিণীর ঘরে ঢুকিবার সময়ও রসময় এই কথাগুলি ভাবিতেছিল, বোধহয় সেই জন্যই ঘরে আর কেউ না থাকিলেও বুঝিতে পারিল না যে খাটে শায়িতা মহিলাটিই পরেশের স্ত্রী। অবশ্য অন্যমনস্ক না থাকিলেই সহজে কথাটা অনুমান করিতে পারিত কি না সন্দেহ। খাটের মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায় বয়স তার ত্রিশের অনেক ওপারে চলিয়া গিয়াছে। গায়ের রঙ পরেশের চেয়েও টুকটুকে, একটু মোটা বলিয়া বোধহয় রঙটা তার ফুটিয়াছে আরও বেশি। মুখখানা সুন্দর। রসময় ভাবিল, সে নিশ্চয় পরেশের দিদি।

'আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

রসময়ের প্রশ্নের আসল অর্থ অনুমান করা কঠিন নয়, পরেশের মুখখানা লাল হইয়া গেল।

'এই যে শুয়ে আছেন। শান্তি, ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

শান্তি চোখ মেলিয়া এতক্ষণ ডাক্তারবাবুকেই দেখিতেছিল, একটু অভ্যর্থনার হাসি হাসিয়া বলিল, 'আসুন। বসতে একটা চেয়ার দাও ডাক্তারবাবুকে। রসময় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে ?'

শান্তি বলিল, 'বুকটা হঠাৎ কেমন ধড়ফড় করে উঠলো। হঠাৎ ভয় পেলে যেমন হয় সেই রকম। এমন ভয়ানক ভয় করতে লাগল আমার—'

শান্তি অনেক কিছুই বলিয়া গেল, অনেক বর্ণনা, লক্ষণ, উপমা ও বিবরণ। না, তার কোনোদিন হার্টের ব্যায়রাম হয় নাই, সিঁড়ি দিয়া উঠিলে বুক ধড়ফড় করে না।

'আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ডাক্তারবাবু, কেবল বিয়ের পর তাড়াতাড়ি একটু মোটা হয়ে পড়েছি। আপনি তো পাশের বাড়িতে থাকেন, না? জানালায় দাঁড়িয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছি আগেই।'

গলির দিকের খোলা জানালাটি দিয়া রসময়ের ঘরের বন্ধ জানালাটি দেখা যাইতেছিল। মুখোমুখি জানালা, এইঘরে দাঁড়াইয়া অন্য ঘরের প্রায় সবটাই নজরে পড়ে। এ বাড়িতে আগে যারা ভাড়াটে ছিল এ ঘরটা তাদেরও শয়ন-ঘর ছিল। তারা নিজেদের জানালাটি খোলা রাখিত বলিয়া রসময় নিজের জানালা সব সময় বন্ধ করিয়া রাখিত। তার জানালা সব সময় বন্ধ থাকে দেখিয়াই হয়তো এরাও নিজেদের জানালাটি খুলিয়া রাখিয়াছে।

নাড়ি দেখিয়া রসময় স্টেথস্কোপ কানে লাগাইয়া শান্তির বুক পরীক্ষা করিল। তারপর বলিল, 'একবার পাশ ফিরুন তো, পিঠটা একটু দেখব।'

'পিঠ দেখবেন?'

শান্তির ভাব দেখিয়া মনে হইল হঠাৎ সে যেন মহা বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। জোরে একটা ঢোঁক গিলিয়া বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া সে পাশ ফিরিল। রসময় একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। এইমাত্র সে যার বুক পরীক্ষা করিয়াছে, পিঠ পরীক্ষা করিতে দিতে তার বিব্রত বোধ করার কোনো অর্থ হয় না।

পিঠের বাঁপ্রান্তের পাঁজরের উপর স্টেথস্কোপেব মুখটা বসানোমাত্র শান্তির সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। স্টেথস্কোপের মুখটা রসময় যেই একটু মেরু-দণ্ডের দিকে সরাইয়াছে রোগিণীর দেহে একটা ভূমিকম্প ঘটিয়া গেল। প্রচণ্ড হি হি হাসির শব্দে ফাটিয়া পড়িয়া ধড়ফড় করিয়া শান্তি উঠিয়া বসিল, চোখের পলকে খাট হইতে নামিয়া একেবারে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। পরে গম্ভীর মুখে বলিলঃ, 'উঃ পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি।'

রসময় বলিল, 'তাই দেখছি।'

কিন্তু রসময় দেখিতেছিল অন্য জিনিস। লুটানো শাড়ির আঁচল টানিতে টানিতে পালানোর সময় শান্তির যে অবস্থা হইয়াছিল তাতে ভদ্রলোকের তার দিকে তাকানো চলে না, রসময় তাই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া খোলা জানালা দিয়া নিজের ঘরের জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল। ইতিমধ্যে কখন একটি খড়খড়ি উঁচু হইয়া গিয়াছে এবং কে যেন ভিতর হইতে উঁকি দিতেছে।

পরেশ শান্তির খোঁজ নিতে যাইতেছিল, রসময় তাকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখুন,

আপনার স্ত্রীর হার্ট ভালোই দেখলাম, ভয়ের কিছু নেই। খুব সম্ভব নার্ভাস-নেসের জন্য বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। ব্লাডপ্রেসারটা নেওয়া দরকার, তা সেটা কাল সকালে এক সময় নিলেই চলবে। রাত্রে ভালো ঘুম হয় ?'

'কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না।'

আরেকবার আশ্বাস দিয়া রসময় উঠিল। ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষার যন্ত্রটি লইয়া রতন ঘরের মধ্যে দরজার কাছে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়াছিল, সমস্ত গন্ডগোলের জন্য সেই যেন দায়ী। রসময় তাকে ফিরিয়া যাইতে বলামাত্র যন্ত্রের মতো পাক দিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

রসময় সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, পরেশ দু'টি টাকা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আপনার ফি'টা ডাক্তারবাবু।'

রসময় মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব হয়েছে, আর কি ফি নেওয়া চলে ? একদিন বরং নেমন্তন্ন খাইয়ে দেবেন, ব্যস, তাতেই হবে।'

ডিসপেনসারিতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে রসময়ের ঠোঁট টান করা মৃদু হাসি মুছিয়া গেল। নিজের ঘরের খড়খড়ি উঁচু হইতে দেখিয়া তার বড় রাগ হইয়াছিল। এভাবে পরের বাড়িতে উঁকি দেওয়ার মানে ? সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মনে হইয়া-ছিল, খড়খড়ি হয়তো রাণীই উঁচু করিয়াছিল। রাণী উঁকি দিয়া ডাক্তারি দেখিতে-ছিল মনে করিয়া তখন রসময়ের দুই ঠোঁটে মৃদু হাসির টান পড়িয়াছিল। ফি প্রত্যাখ্যান করার ভদ্রতার হাসি সেটা নয়।

ডিসপেনসারিতে সকলেই উপস্থিত আছে কিন্তু হাসিগল্প একেবারেই বন্ধ। বিপিন পর্যন্ত মুখ বুজিয়া আছে। নিজের চেয়ারে বসিয়া রসময় জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে সবাই চুপচাপ যে ?'

উমাচরণ বলিল, 'দেবেনবাবু মারা গেছেন। রমণীবাবুর ভাই যাচ্ছিল, সে-ই খবরটা দিল। একেবারে ডুবিয়ে গেল সংসারটাকে।'

রসময় বলিল, 'আমায় ডেকেছিল পরশু। দেখেই বুঝেছিলাম টিকবে না, কোনো আশা নেই। ওরকম একটা রোগ হয়েছে, মর মর অবস্থা, তবু আমায় বলে কি, এরাই আমায় ডোবাবে ডাক্তারবাবু—একটু জ্বর হয়েছে, দু'দিন শুয়ে থাকলেই সেরে উঠব, কি যে সব খরচপত্রের শুরু করে দিয়েছে।'

মৃদু একটু হাসিতে গিয়া রসময় থামিয়া গেল। রমেশ সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়াছে। মরিবার দু'দিন আগে মরণাপন্ন রোগী ভাবে দু'দিন বিছানায় শুইয়া একটু বিশ্রাম করিলেই সে সারিয়া যাইবে। এর কৌতুকটা এরা উপভোগ করিতে পারে না। বরং গাম্ভীর্য আর হতাশার ভাবটাই ঘনীভূত হইয়া আসে। কি বিকার-গ্রস্তই হইয়া গিয়াছে এদের মন! ক্ষুব্ধ হইয়া রসময় ধমক দেওয়ার মতো হঠাৎ বলিল, 'রতন, সাত কাপ চা দিতে বলো।'

উমাচরণ বলিল, 'অত বড় সংসারটা এবার একেবারে ডুবল। অ্যাদ্দিন কোনো

রকমে তবু চালিয়ে যাচ্ছিল, এবার সব না খেয়ে মরবে।'

রসময়ের হঠাৎ মনে হইল, এদের প্রত্যেকে বোধহয় ভাবিতেছে, সে মরিয়া গেলে তার মস্ত সংসারটার কি অবস্থা হইবে। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্কেত তো এমন স্পষ্টভাবে আসে না। সকলে হয়তো ভাবিতেছে দেবেনের সংসারের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতেরই কথা, কিন্তু অনুভব করিতেছে নিজের নিজের সংসারের সম্ভবপর ভবিষ্যৎ কল্পনার আতঙ্ক ও বিষাদ।

আলোচনা ও কল্পনার প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় রসময় বলিল, 'কত রকম রোগীই দেখলাম। কেউ রোগ হলে ভাবে কিছুই হয় নি, আবার কেউ রোগ না হলেও ভাবে জগতে যত রোগ আছে সব তাকে ধরেছে।

নিজেকে বিশেষভাবে রোগী মনে করে এরকম কয়েকজন সুস্থ ও সবল মজার রোগীর গল্প রসময় বলিতে লাগিল, সকলে মন দিয়া শুনিতে লাগিল। চা আনিলে কাপে চুমুক দিয়া একজন বলিল, 'তা ঠিক, রোগকে সবাই ডরায়।'

তখন রসময় বলিল, 'আরও কত মজার রোগী আছে। সেদিন একজনকে দেখতে গিয়েছিলাম, তার সারা গায়ে সুড়সুড়ি। পালস্ দেখতে যাই হেসে গড়িয়ে পড়ে, থার্মোমিটার দিতে যাই, হাসতে হাসতে দম আটকে আসে—আধ ঘণ্টা ধরে কি ধস্তাধস্তিই চলল।'

সকলে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, 'পুরুষ না মেয়েলোক হে?'

'মেয়েলোক।'

সকলের হাসি চরমে উঠিয়া গেল। বিপিন সকলকে হাসায়, নিজে কদাচিৎ হাসে, সে হাসিতে লাগিল সবচেয়ে বেশি। প্রথমটায় রসময় খুব খুশি হইয়া উঠিল, তারপর তার মনে হইল, সকলে যেন দেবেনের মৃত্যু সংবাদের পীড়নটা এড়ানোর জন্য হাসিতেছে। একটি স্ত্রীলোক, তার ষষ্ঠাঙ্গে অস্বাভাবিক সুড়সুড়ি বোধ, রোগ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার লড়াই করিতেছে আর হাসিতে হাসিতে তার দম আটকাইয়া আসিতেছে—এ দৃশ্য কল্পনা করিলে হাসি পায় কিন্তু দেবেনের মরণের জন্য মনের মধ্যে যাতনা ভোগ করিতে না থাকিলে তার গল্প শুনিয়া কেউ এ দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টাও করিত না, হাসিতও না।

কে জানে, সংসারের পীড়নের হাত এড়ানোর জন্যই হয়তো সকলে প্রতি সন্ধ্যায় এখানে গল্প করিতে আর হাসিতে আসে।

রসময় গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকে। সকলের হাসির শব্দের মধ্যেও সে শুনিতে পায়, ঠিক পিছনে ঘড়িটা টিক টিক করিতেছে। একটা খাপছাড়া শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিতে পায়, রতন কাঁদ কাঁদ মুখে মাথার পিছনে হাত বুলাইতেছে! ব্যাপারটা সে অনুমান করিতে পারে। টুলে বসিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে রতন পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিল, চমক দেওয়া জাগরণের আতঙ্কে সবেগে

সোজা হইতে গিয়া পার্টিশনে মাথাটা ঠুকিয়া গিয়াছে।

রসময়ের দৃষ্টিপাতে রতন অপরাধীর মতো একটু হাসিল।

একটু দূরে আরেকটা ডাক আসয়াছিল। রোগী দেখিয়া ফিরিয়া রাত্রি এগারোটার পর শুইতে যাওয়ার সময় রসময়ের মনে হইতে লাগিল, দুঃখময় হাসির জগতে সে বাস করে, কিন্তু জগতের কোনো হাস্যকর ব্যাপারের সঙ্গে তার যোগ নাই। হয়তো একদিন যোগ ছিল, অল্প বয়সে যখন প্রাণখোলা হাসি হাসিবার জন্য বাহিরের কোনো উপলক্ষ দরকার হইত না, নিজের ভিতরের প্রেরণায় হাসিতে হাসিতে অনায়াসে নিজেই নিজের দম আটকাইয়া আনিতে পারিত। সেদিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। কত কাল সে যে পাগলের মতো হাসে নাই।

কেন হাসে নাই? বড় কোনো দুঃখ পায় নাই বলিয়া? 'দুঃখের লাঙলে মন চষা না হইলে হাসির ফসল ফলিবে না?' এ তো উচিত কথা নয়। তার জীবনে যে জমকালো শোকদুঃখ আসে নাই, তাই বা কে বলিল। যদি তাই হয় যে তার জীবনের শোকদুঃখগুলি অন্যের তুলনায় কিছুই নয়। এরকম হইল কেন? কেন সে শোকদুঃখে কাবু হইয়া পড়ে নাই? কোনো কিছুকে ভালবাসে নাই বলিয়া? সে যে কোনো কিছুকে ভালবাসে নাই, তাই বা কে বলিল? যদি তাই হয় হৃদয়ের মায়ামমতাগুলি অন্যের তুলনায় একেবারে জলো অনুভূতি, এরকম হইল কেন? তার হৃদয় মন অসাড় বলিয়া? মানুষ হিসাবে সে অস্বাভাবিক বলিয়া? অসাধারণ বলিয়া···?

দার্শনিক চিন্তার পীড়ন তো সহজ নয়, দুর্বল রোগীর মধ্যে কড়া ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতো। বিছানায় বসিয়া রসময়ের মনে হইতে লাগিল, এতকালের শূন্য জীবনটা আজ যেন জঞ্জালে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাঁ হাতটি বুকের উপর রাখিয়া রাণী ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইতেছে। তা ঘুমাক, এ বয়সে ঘুম বেশি হয়। কিন্তু ওকে কেন সে নিজের জীবনে টানিয়া আনিয়াছে? কতটুকু মেয়ে! তার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট! পাড়ার কুমারী মেয়ের সঙ্গে সখিত্ব পাতায়, বয়সে বড় ছেলেমেয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে, নাতিনাতিনীকে আদর করে ছোট ভাই-বোনের মতো ঝগড়াও করে, চুরি করিয়া নভেল পড়ে। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজানোর জন্য সর্বক্ষণ উৎসুক হইয়া থাকে; জানালার খড়খড়ি তুলিয়া পরের বাড়িতে উঁকি দেয়—

জানালাটা খোলা পড়িয়া আছে। হয়তো ঘুমাইয়া পড়ার আগে শান্তির সঙ্গে জানালায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথা বলিয়াছিল, বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। রসময় জানালাটা বন্ধ করিতে উঠিয়া গেল। শান্তিদের ঘরের জানালাও খোলা, কিন্তু ঘর অন্ধকার। দু'জনের মৃদু স্বরে কথা বলার আওয়াজ কানে আসিতেই রসময় তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠোঁটে তখন তার একটু টান পড়িয়াছে। ওদের বয়সের পার্থক্য বেশি নয়, বড়

জোর সাত আট বছর। রাণী আর তার বয়সের তফাতটা ত্রিশ বছরেরও বেশি!
শান্তিকে দেখিয়া পরেশের দিদি বলিয়া তার ভুল হইয়াছিল। রাণীকে দেখিলে অন্যের—শান্তি যদি আজ বলিত, আপনি পাশের বাড়িতে থাকেন, না? জানালায় দাঁড়িয়ে আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি।
রাণীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করার সময় শান্তি হয়তো তাই ভাবিয়াছিল, হয়তো বলিয়াছিল, 'তুমি ডাক্তারবাবুর মেয়ে না?'
রাণী হয়তো সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলিয়াছিল, 'না, উনি আমার স্বামী।' রসময় হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করিল। সে কি প্রচণ্ড হাসি। জগতের একটি হাস্যকর ব্যাপারের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ আবিষ্কার করামাত্র তার এতকালের গুদামজাত সশব্দ হাসির সমস্তটাই যেন একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চায়।
ঘুম ভাঙিয়া রাণী বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চাহিয়া থাকে। তাতে তার হাসি যেন আরও বাড়িয়া যায়। হাসিতে তার ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু সে পাগলের মতো হাসিতে থাকে। হাসি পাইলে মানুষ না হাসিয়া পারিবে কেন?

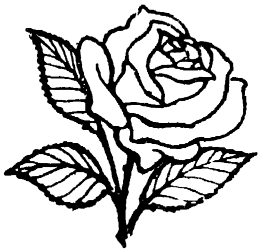

গুণ্ডা

হাকিম হুকুম দিলেন একদফায় সাত বছর এবং আরেক দফায় তিন বছর ফেলনার জেলে বাস করা প্রয়োজন। তবে দু'দফার দণ্ডটা এক সঙ্গেই চলিবে। হুকুম শুনিয়া ফেলনার চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল। এজলাসের আর সকলকে উপেক্ষা করিয়া সে চাহিল শ্যামলালের দিকে। শ্যামলাল তার উকিল। দাও দাও করিয়া ফেলনাকে প্রায় ফতুর করিয়া ফেলিয়াছে। ফেলনার দৃষ্টির মানে খুব স্পষ্ট 'দাঁড়াও শালা, তোমায় দেখে নেব।'

উকিলরা চিরকাল মক্কেলকে ভরসা দিয়া থাকে, দেওয়াই নিয়ম। শ্যামলালের সঙ্গে ফেলনার ঠিক উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক নয়। শ্যামলালের ভরসা দেওয়াটাও প্রথার পর্যায়ে পড়ে না। এইজন্য ফেলনার রাগ হইয়াছে। শ্যামলাল দুঃখিত হইয়া ভাবিল, 'এসব লোক নিরেট মূর্খ, গুণ্ডা কি না!'

'ভয় নাই। আপিল ঠুকে দিচ্ছি?'

'আরও মারবার মতলব আছে নাকি?'

শ্যামলাল নির্বিকারভাবে বলিল, 'তা আছে। তবে খালাস পাবি। নইলে ব্যবসা ছেড়ে দেশে গিয়ে পাট বুনব। মা কালীর নামে দিব্যি করলাম।'

নূতন যুক্তি আর প্রমাণে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় ফেলনা খালাস পাইল। আইন সত্যই উদার ও নিরপেক্ষ। সাধারণ আইন এমন নিরপেক্ষ বলিয়াই তো বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য বিশেষ আইন দরকার হয়।

শ্যামলাল বলিল, 'দেখলি?'

ফেলনা তার পায়ের ধুলা নিয়া বলিল, 'আজ্ঞে দেখলাম বৈকি। আপনি সব পারেন। তা আপিল করিয়ে যা পেলেন, আগে বললে নয় এমনিই দিয়ে দিতাম? মিছে ভোগালেন কেন?'

শ্যামলাল মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিল, 'তা কি আর তুই দিতিস রে হনুমান, তখন বলতিস 'কে কার কড়ি ধরে।' আমিই বা চাইতাম কোন্ মুখে? 'ভিখ মাগা তো পেশা নয়।'

শ্যামলালের শরীরের হাড়ের ফ্রেমটা লম্বা চওড়া, গায়ে মাংস নাই, শুকনো কটা মুখে কামান চোয়াল উদ্ধত প্রতিবাদের মতো স্পষ্ট, আর স্পষ্ট নিবিড় কালো মোটা ভুরু। রগের চুলে পাক ধরিয়াছে। কানে একরাশি চুল। মুখের দিকে চাহিতে হইলে বেঁটে ফেলনাকে মুখ তুলিতে হয়।

ফেলনার হাতে একটিও পয়সা নাই, শ্যামলাল তাকে তিনটি টাকা দিল। উপদেশ দিল এই বলিয়া ঃ 'সাবধানে থাকবি কিছুদিন, কিছু জমাবি। ধরা পড়বি দুচার ছ'মাসের মধ্যে, পয়সা না দিলে কিন্তু কেস ছোঁবো না, বলে রাখছি আগে থেকে।'

মুখের ভারি মোটা চামড়া কুঁচবাইয়া সাদা ধবধবে দাঁত বাহির করিয়া ফেলনা হাসে। জেল হইলে ফেলনার রাগ হইত, দিন মাস বছর ধরিয়া রাগটা বাড়িত এবং জেলের বাহিরে আসিয়া সকলের আগে বুঝাপড়া করিত শ্যামলালের সঙ্গে। খালি গায়ে শ্যামলালের পাঁজরের নিচে যে হৃৎপিন্ডটা ধুক্ ধুক্ করিতেছে দেখা যায়, খুব সম্ভব সেটাই একদিন সুযোগ মতো ফুটা করিয়া দিত। এখন আর রাগের কোনো কারণ নাই। বিপজ্জনক প্যাঁচ কষিয়া বেশি টাকা সে যে আদায় করিয়াছে সেটা শ্যামলালের বাহাদুরির পরিচয়। ফেলনার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাতে বাড়িয়াই গিয়াছে। সে শুধু বুঝিতে পারে না, বিলকুল জমা করার জন্য লোকটার এত টাকার খাঁকতি কেন।

আগে খুব কষ্ট পাইয়াছে—বৌ-এর মাথা একটু খারাপ হইয়া যাওয়ার মতো কষ্ট, বিনা চিকিৎসায় ছেলে মরিয়া যাওয়ার মতো কষ্ট। চিরদিনের মতো তার দেহ ভাঙিয়া গিয়াছে। পালোয়ানের খোরাক দরকার ছিল, অজীর্ণ রুগীর পথ্য জুটিত না। শুধু জল খাইয়া দিনের পর দিন তার জলখাবারের প্রয়োজন মিটিত। বলিতে বলিতে শ্যামলাল দাঁতে দাঁত ঘষিতে থাকে। হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বলে, 'আয় পাঞ্জা।' ফেলনা লোহার মতো আঙুলগুলি সরু সরু আঙুলে চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'গায়ের জোরের বড়াই করিস, ডাম্বেল মুগুর ভেঁজে শরীরটা যা করেছিলাম দেখিস নে তো। তোকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতাম তখন।'

এসব ফেলনা বুঝিতে পারে না। অতীতের দুঃখ দুর্দশার জন্য এখন ফোঁস ফোঁস করা কেন? ফুটপাতে ফেলনার কত রাত কাটিয়াছে, ছোঁ মারিয়া খাবারের দোকান হইতে খাবার তুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পেট ভরার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, সে তো এসব কথা ভাবিয়া কখনো মাথা গরম করে না।

শ্যামলাল বলিল, 'রাসিকে বলিস গিয়ে, বালাটা শুধু বাঁধা রেখেছি, আংটিটা আছে। কাল পরশু পাঠিয়ে দেব।'

'আমায় দ্যান না?'

'তোকে দেবার জন্য আংটি পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি না?'

ফেলনা সকৌতুকে হাসিল। শ্যামলালের পকেটেই হয়তো আংটি আছে, তাকে বিশ্বাস করিয়া দিবে না। এ অবিশ্বাস অন্যায় নয়। আংটি হাতে পাইলে ঘরে গিয়ে পেঁছানোর আগেই সে বেচিয়া দিত। তার মনের কথা এমনভাবে টের পাইয়া যায় বলিয়াই তো মানুষটাকে সে এত পছন্দ করে।

আজ নিজেকে ফেলনার শ্রান্ত মনে হয়। মুক্তিলাভের আনন্দ ও উত্তেজনা কড়া-

পড়া মনে কখন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সাত বছরের জন্য জেলে গেলেও যেন তেমন কিছু আসিয়া যাইত না। বাধা ঠেলিয়া গায়ের জোরে তার স্বাধীনভাবে বিচরণ, স্বাদগন্ধ বৈচিত্র্যহীন তার জীবন। জেলে গেলে যা কিছুর অভাব হয়, সে সমস্তের দাম বড় কম তার কাছে। সন্ন্যাসী শান্তি দিয়া মায়া কাটায়, ফেলনা মায়া কাটাইয়াছে উত্তেজনায়। মমতা অনুভব করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে, হিংসাও তার নাই। মানুষ তাকে পশুর মতো নির্মম ও হিংস্র মনে করে। পশুর মতোই নিষ্ঠুর-ভাবে সে হিংসাত্মক কাজ করে। নির্মমতার উল্লাস আর হিংসার জ্বালা এতটুকুও অনুভব করে না। ছোরা দেখাইয়া পকেট খালি করা নিছক তার পেশা, ক্ষুধা মিটানো আর হৈ চৈ করা তার শুধু বাঁচিয়া থাকা। ফুটপাতে দলে দলে যারা ফেলনার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, তার জীবনের একটি দিনের দুরন্ত উপভোগ তাদের সাতদিন শয্যাশায়ী করিয়া রাখিবে। কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে এক-ঘেয়ে জীবন যার, ফেলনার কাছে এ-ফেলনার জীবনের চেয়ে তার কাছে তার জীবন অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। ফেলনা কখনো রোমাঞ্চ অনুভব করে না। জীবন তাকে এলানো চুলের মৃদু স্পর্শ দেয় না, নখ দিয়া আঁচড় কাটে।

বড় রাস্তায় জল দেওয়ার সময় গলির মুখের কাছে খানিকটা ভিজাইয়া দিয়াছিল। রোদ আর বাতাসে বড় রাস্তার জল শুকাইয়া গিয়াছে, গলির ভিতরের অংশটুকু এখনো ভিজা। চেনা মানুষের কাছ হইতে ফেলনা প্রথম অভিনন্দন পাইল সেই-খানে। কাদেরের পানবিড়ির দোকানের পাশে রোয়াকে বসিয়া সাত-আট জন বিড়ি বানাইতেছিল, ফেলনাকে দেখিয়াই তারা এক সঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল। ধারের জন্য কাদেরের সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছিল, দু'পয়সা প্যাকেটের একটি সিগারেট দিয়া কাদের তাকে খাতির করিল! নাসিম সাগ্রহে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ক'দিন আগে ফেলনা যে তার নাকটা থেঁতলাইয়া দিয়াছিল, সে যেন তা ভুলিয়াই গিয়াছে।

অপরাহ্নেই গলির মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে মনে হয়। কোনো কোনো বাড়ির ভিতরে কলতলায় স্ত্রীলোকদের সোরগোল কানে আসে, তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া প্রসাধন সারিয়া শহরে হাটের জীবন্ত পণ্যগুলি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবে। নিধু মালী মালাই বরফের হাঁড়ি মাথায় পথে বাহির হইল। কিষণলাল তার পানের দোকানের একপাশে বিক্রির জন্য টাটকা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে। পাশে দেশী মদের দোকানে একে দুয়ে মানুষ ঢুকিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। রাত্রে এ গলি জীবন পায়, এখন হইতেই চারিদিকে তার সূচনা। প্রতি পদক্ষেপে ফেলনার বিচিত্র অভিনন্দন জুটিতে থাকে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কেউ উৎকট তামা-শার মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করে, ছবির ফ্রেম বাঁধিতে বাঁধিতে কেউ মুখ তুলিয়া দাবি জানায়, সম্মুখ হইতে আসিয়া কেউ গাঁজার ছাপ মারা হাতে নীরবে তার হাত চাপিয়া ধরে, তীক্ষ্ন কণ্ঠের আহ্বানে তার মুখ ফিরাইয়া কেউ জানালার

ফাঁকে হাসিভরা মুখখানা সামনে মেলিয়া ধরে। দিগ্‌বিজয়ী বীর যেন জয়গৌরবে মণ্ডিত হইয়া তার রাজধানীতে ফিরিয়াছে।

রাসির কাছে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনাই পাওয়া গেল।

'এক মাসের মধ্যে আমার বালা এনে দেবে বলে রাখলাম।'

'বালা নাকি দিতে চাস নি শুনলাম?'

'চাই নি তো। কেন দেব? সাত বছর শ্বশুর ঘর গেলে কে আমায় পুষত শুনি? আমি বলে তবু দিয়েছি।'

ফেলনাও তাই ভাবিতেছিল। তার জগতে এ একটা অতি খাপছাড়া অনিয়ম। রাসির এ কাজের কোনো মানে হয় না। প্রথমে সে বালা দিতে চায় নাই, তাই ছিল স্বাভাবিক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে যার মৃত্যুর চেয়ে বেশি ভয় করিতে হয়, নিজের যতটুকু আছে তাকে তাই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, স্বার্থ-বিলাসিতা তার জন্য নয়। একটি কাঁসার বাসনের জন্য তার কত মমতা, এক জোড়া বাংলা আংটি সে ফেলনার জন্য কি করিয়া দিল?

মোটা কাঁচের গ্লাসে রাসি চা আনিয়া দেয়, এনামেল-চটা লোহার বাটিতে দেয় মুখরোচক পেঁয়াজবড়া। কথা সে বেশি বলে না, টুকিটাকি কাজ করিয়া বেড়ায়। কার সাধ্য অনুমান করিবে সে খুশি হইয়াছে। শ্যামলাল ভরসা দিয়াছিল, তবু কি ভয়ে ভয়ে যে তার ক'টা দিন কাটিয়াছে। ফেলনা তো গিয়াছে, বালা আর আংটিও বুঝি তার গেল। এখন ফেলনা ফিরিয়া আসিয়াছে, গয়না বাঁধা রাখিয়া তাকে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছে। এবার তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিবে। বালা আর আংটি তো অল্পদিনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবেই, আর কিছু কি দিবে না সে তাকে? তার এতবড় স্বার্থত্যাগের কোনো পুরস্কার।

পিঁড়িটা রাসি মাটির দেওয়ালে ঠেসান দিয়া রাখে, ছেঁড়া কাপড়খানা কুঁচাইয়া ফেলে, গামছাটি মেলিয়া দেয়, বাতি সাফ করিতে বসিয়া বলে, 'কেরোসিন আনতে হবে দু'পয়সার।'

গলির ওপারে তারাপদর কারখানায় জোরালো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া কাঠের মিস্ত্রিরা কাজ করে, দুটি জানালা দিয়া রাসির ঘরে আলো আসিয়া পড়ে। বাতি না জ্বালিয়া সেই আলোতেই ক'দিন রাসির চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা একে একে ফেলনার খবর নিয়া যায়। সকলেই তাকে ভয় করে, পুলিশকে হার মানাইয়া জেলের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসায় ভয়টা সকলের বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়িওলা ভূষণ ধনুকের মতো বাঁকা পিঠের ডগায় বসানো নড়বড়ে মাথাটি নিয়ে খানিকক্ষণ বসিয়া যায়, ফোকলা মুখের অজস্র অর্ধোচ্চারিত শব্দে অতীত অভিজ্ঞতার গল্প বলে। জীবনে সবশুদ্ধ সতের বছর সে জেলে কাটাইয়াছে। অভিজ্ঞতার পুঁজি তার কম নয়।

কিন্তু ফেলনার শুনিতে ভালো লাগে না। বড় একঘেয়ে মনে হয়। তার জীবনে

যেমন একই ঘটনা বার বার ঘটিয়া আসিতেছে, ভুষণও যেন তেমনি বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছে একই গল্প। অন্ধকার, চকচকে ছোরা, মদ, মেয়েমানুষ, পুলিশ আর জেল। এই শুধু ভুষণের কাহিনীর উপকরণ।

শ্রান্তি যেন বাড়িয়া চলিতেছে ফেলনার। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবসন্নতায় গভীর আলস্য জাগিতেছে। ভুষণ চলিয়া গেলে সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। মস্ত হাই তুলিয়া বলিল, 'আরেকটু চা বানা দিকি রাসি।'

রাসি আশ্চর্য হইয়া গেল। 'চা ?' এখন চা খাবে ?'

'তাই দে। কেমন ধারা লাগছে যেন, মাল রুচবে না।'

লন্ঠনের লালচে আলোয় জানালা দিয়া সাদা আলো আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটা যেন একটু জ্বালা করিতেছে মনে হয়। মুখের বিস্বাদ ভাবটাও স্থায়ী হইয়া আছে। রাতভোর হৈ চৈ করিয়া পরদিন ঘুম ভাঙিবার পর এ রকম লাগে, আজ সন্ধ্যারাত্রেই অকারণে সেইরকম লাগিতেছে। শুধু তীব্র ঝাঁঝালো বিরক্তির বদলে এখন কেমন একটা ঘুমধরা আবেশ আসিয়াছে, চুপচাপ শুইয়া নানা কথা ভাবিতে ভালো লাগিতেছে। রক্তশোষা লোভের সঙ্গে শ্যামলালের দরদের কথা, হৃদয়হীন স্বার্থপরতার সঙ্গে রাসির উদারতার কথা, আর তার মুক্তিতে সকলের খুশি হওয়ার কথা। চা আনিয়া দিয়া রাসি বলিল, 'দুধ একটুকুন কম হল। এক পয়সার দুধ দিইছে এ্যাত্তোটুকুন, সেবারে চা বানাতেই প্রায় শেষ।'

রাসি একটু বসে। ফেলনা যেন কেমন ভাবে তাকে দেখিতেছে। সাদা চোখে এমন ভাবে তাকায় কেন ? চোখ কিন্তু ফেলনার একটু লাল মনে হইতেছে।

ব্যাপারটা রাসি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনেকদিন আগে সাদা চোখেই যখন তখন ফেলনা এমনিভাবে তার দিকে তাকাইয়া থাকিত, শরীরে কেমন একটা শিহরণ বহিয়া গিয়া আপনা হইতে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। আজ হাসিটা দেখা দিতেছিল, পরবর্তী অভ্যাসে সেটা রাসি চাপিয়া গেল।

রাসির কপালে একটা দাগ আছে। একদিন ফেলনা তাকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, কপালটা ঠুকিয়া গিয়াছিল জানালার পাটে। রাসি তার চেয়েও বেঁটে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া তবে জানালা দিয়া রাস্তা দেখিতে পায়। খুব নামাইয়া পাতা কাটিলেও রাসির কপালের দাগটা ঢাকা পড়ে না, তবু এতকাল একবারও দাগটা ফেলনার চোখে পড়ে নাই। রাসির ফ্যাকাসে মুখে দাগটা চোখে বেমামান ঠেকিতেছিল। বালার অভাবে রাসির হাত দুটিও ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছে।

ফেলনার একটু দায়িত্ব বোধের অনুভূতি জাগে। মনে হয়, কি একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে সে যেন আটকা পড়িয়া গিয়াছে। রাসির আংটি শ্যামলাল তার হাতে দিলে আসিবার পথে নয়ান স্যাঁকরার দোকানে সেটা বিক্রি করিয়া দিত, কিন্তু এখন যেন আর ওসব চলিবে না। শুধু আংটি নয়, রাসির বালাটিও যেন যত শীগ্‌গির পারে আনিয়া দিতে হইবে রাসিকে।

রাসি সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ব্যাপার কি বল দিকিন তোমার ? আসবার সময় সেটা চালিয়ে এসো নি তো—সেই সাদা গুঁড়ো ?'

'দূৎ। আমার ওসব নেই।'

'ওদিকে ঘেঁষোনি, সাবধান। দু'দিনে কাবু করে ফেলবে, মানুষটি থাকবে না আর। নিজের ছায়া দেখে ডর লাগবে। কি ছিল পরশা কি হয়েছে দেখেছ তা নিজে ?'

ফেলনা তার মোতির মতো সুন্দর দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—'একটা কিছু দে দিকি রাসি, গায়ে জড়াই। শীত শীত লাগছে।'

রাত প্রায় ন'টার সময় রাসির ঘরে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিল। তার নাম ম'বুব। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা। পাতলা ফুলকাটা পাঞ্জাবির নিচে গোলাপী গেঞ্জি দেখা যায়। মোটা কব্জির কাছে পাঞ্জাবির হাতা টাইট করিয়া বোতাম লাগানো। মুখখানা গোল, ভাঁজ পড়ার উপক্রম করার মতো দু'টি গালের গড়নের জন্য মুখ দেখিলে ভয় করে।

'কাদের খবর দিলে। চটপট আগে খবর না দিয়ে ব্যাটা খচ্চর আছে কিনা, এত্না দেরিতে গিয়ে খবর জানালে। জানতে পেরে ছুটে এলাম।'

ফেলনার উঠিয়া বসিতে কষ্ট হইতেছিল। চোখ দু'টা আরও বেশি জ্বালা করিতেছে। ম'বুবকে চৌকির একপাশে বসিতে দিয়া জোরে একবার সে মাথাটা ঝাঁকি দিয়া নিল। রাসি নীরবে ঘরের দরজায় চৌকাট ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। হঠাৎ কেউ আসিয়া পড়িয়া কিছু শুনিতে না পায় ম'বুব বলিল, 'একটা দাঁও আছে, মস্ত দাঁও ! ঝুঁকি একদম কিছু নেই। আমি, ওসমান আর শিউ সিং সলা করছিলাম।'

শুনিতে শুনিতে ফেলনার চোখ জ্বল জ্বল করিতে থাকে। শীত করিয়া তার যে জ্বর আসিতেছে, জিভ্ বিস্বাদ লাগিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতেছে, সব যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সে কিন্তু ঝিমাইয়া গেল। আজ রাত্রেই যদি কাজটা শেষ করিতে হয়, তার পক্ষে যোগ দেওয়া কি সম্ভব ? কেবল শরীর খারাপ বলিয়া নয়, এসব বড় কাজে ঝুঁকি বেশি, নিজে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা না করিয়া এসব ব্যাপারে সে হাত দেয় না। তা'ছাড়া, তার আস্তানার বড় কাছাকাছি হইয়া যাইতেছে। সে একটা মস্ত বিপদ। পুলিশ প্রথমেই তাকে সন্দেহ করিবে।

ফেলনা রাসির দিকে তাকায়। রাসি মাথা নাড়ে।

ম'বুব অনেক তোষামোদ করিল, অনেক লোভ দেখাইল। তারপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া রাসির দিকে চাহিয়া ফেলনা বলিল, 'বড় দাঁও ছিল রাসি তোর বালাটা আনা যেত।'

'বালা পরে আনা যাবে।'

কাছে আসিয়া ফেলনার কপালে হাত দিয়া রাসি চমকাইয়া গেল। 'এই জ্বর নিয়ে দাঁও মারতে যাবে! মাথা ঘুরে পড়ে যাবে না রাস্তায়?'

রাত প্রায় এগারোটায় ম'বুব, ওসমান আর শিউ সিং তিনজনেই আরেকবার ফেলনাকে বুঝাইয়া রাজি করিতে আসিল। কিন্তু ফেলনার জ্বর আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাকে রাজি করানোর প্রশ্নই ওঠে না। অপ্রস্তুত হইয়া তিনজনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আপসোস জানাইয়া চলিয়া গেল।

ফেলনা বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'গেলে হত রাসি। মস্ত দাঁও ছিল। বালাটা আনা যেত।'

কপালে জলপটি দিয়া বাতাস করিতে করিতে রাসি বলিল, চুপটি করে ঘুমাও বলছি, হাঁ। মরতে বসেছে, দাঁও মারবার শখ।'

শেষ রাত্রে, প্রায় তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, পুলিশ আসিয়া ফেলনাকে টানিয়া তুলিল। জ্বর একটু কমায় সারারাত ছট্‌ফট্ করিয়া সে তখন শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিল।

রাসি কাতরভাবে বলিতে লাগিল, 'দেখছো না জ্বর? ঘর ছেড়ে রাতে একটিবার বাইরে যায় নি। শুধোও বাড়ির পাঁচটা লোককে সত্যি কি মিথ্যে?'

কাছাকাছি একটা খুন-জখমের ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। যারা ধরা পড়িয়াছে, তাদের অনেকবাব ফেলনার কাছে যাতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে। ফেলনা নাম-জাদা গুন্ডা তাকে কি এত সহজে রেহাই দেওয়া যায়।

যাওয়ার সময় ফেলনা বলিয়া গেল, 'শ্যামলালবাবুকে একটা খবর দে রাসি।'

দিশেহারা হরিণী

মৃগনয়নার চোখ দুটি সত্যসত্যই হরিণীর চোখের মতো। মানুষের অবিকল হরিণীর মতো চোখ থাকলে অবশ্য অকথ্য বিশ্রী দেখায়। কিন্তু ওটা তুলনা মাত্র; কোনো মেয়ের যদি বড়, টানা, সদাচকিত অথচ ধীর ও গভীর দৃষ্টিওয়ালা চোখ দুটি দেখে হরিণীর চোখ মনে পড়িয়ে দেয়, সেই মেয়েটিকে মৃগনয়না বলা যায়। মৃগনয়নার মনটি বড় কোমল। বিশেষ এ ধরনের সরলতা তার আছে, তার নিজস্ব সত্যপালন নীতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে। একটু খাপছাড়া তার স্বভাব, কিন্তু অগোছাল নয়, চোদ্দ পনের বছরেই তার চপলতা উপে গেছে, কিন্তু কোনো ভাবেই তাকে ভারাক্রান্ত মনে হয় না। শান্ত রেশালো নৃত্যছন্দের গতিতে তার চলাফেরা নড়াচড়ার অন্ত নেই, মুখে মৃদু একটু হাসির সঙ্গে মিষ্টি সুরে সব কথাতেই কথা বলে যায়। এখন, মোটে সতের বছর বয়সে যৌবনকে নিয়ে কি করতে হয় সে যেন জানে, দেহ যতই উথলে উঠুক মনে নির্মল স্বচ্ছ রসের মতো জীবনের উত্তাপ শুধু আস্তে আস্তে ফোটে। ছাতের শান্ত জ্যোৎস্নায় একা সে ভগবানের আদুরে মেয়ে হয়ে আছে, কোনো অভাব তার নেই। কোনো ভাবনা নেই। আবেগ অদম্য হলে হাঁটু পেতে বসে হাতে মাথা ঠেকিয়ে সে অনেক-ক্ষণ ভগবানকে প্রণাম করে, ভক্তি আর ভালবাসার কত মানুষ যে বিরাট মহান রূপ নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়—তার দাদার একবছরের শিশুটি পর্যন্ত আকাশ-পাতাল জুড়ে কোমল চামড়ার দ্যুতিকে নীলাভ করে তোলে, দুটি দাঁতের ফোকলা মুখে তার দিকে চেয়ে শুধু হাসে।

এই অবস্থায় বাড়ির লোক তাকে মাঝে মাঝে আবিষ্কার করে: ডাকলেই সে ধীরে ধীরে উঠে বসে বলে, 'মাগো, কি প্রকাণ্ড একটা আগুন আকাশ দিয়ে চলে গেল।'

মা আর মায়ের সম্পর্কিতা মাসি বলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে, এসময় তোর ছাতে উঠবার দরকার!'

দাদা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ওটা হল ধূমকেতু। শূন্য থেকে পৃথিবীর বাতাসে এলে জ্বলে ওঠে। ওসব দেখে ভয় পাসনি মিগু।'

'ভয় পাব কেন?'

যতীন শোবার ঘরে গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল, প্রায় নিঃশব্দে

বলল, 'বোস, মিগু।'
বসবার চেয়ারটাও সে দেখিয়ে দিল, পাঁচ সাত হাত তফাতে। মৃগনয়না হেসে তার চেয়ারের হাতলে বসে বললে, 'তোমার যে কি এক বাতিক। আগে দূরে চেয়ারে বসে নানা ছলে একটু একটু করে কাছে আসতে হবে। আজ আমার অত সময় নেই, মুখের ভাত ফেলে এসেছি।'
'তোমার নাকি আজ ফিট হয়েছিল ?'
'কে বললে। ছাতে একা একা ভগবানকে প্রণাম করছিলাম, সবাই ভাবল কি যেন হয়েছে। বৌদি ডাকতেই উঠে বসলাম, ফাজলামি করে বললাম, আকাশে একটা আগুনের গোলা দেখে ভয় পেয়েছি। আসলে কি দেখেছিলাম জানো ?' বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে চিন্তার চাপে ভুরু কুঁচকে বললে, 'কি দেখেছিলাম? কিছুই তো দেখি নি।'
যতীনের কাঁধে হাতের ভর দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'দেখিনি তো দেখিনি। বয়ে গেল।'
যতীন অনুভব করল, সে কাঁপছে। সমতল পথে খুব স্পীডে চালালে তার গাড়িটা যেমন কাঁপে।
যতীন স্বাভাবিক গলায় বললে, 'যাকগে ওসব বাজে কথা, এমনি ভাবে ঘুরিয়ে কাঁধে মাথা রাখো। তারপর মিন মিন করে সেই গানটা শোনাও তো। তুমি গাইবে আর আমি শুনব, আর কেউ না। বড় ভালো মেয়ে তুমি মিগু, বড় ভালো মেয়ে।'

বাড়ি ফিরে মৃগনয়না সবে ভাত খেয়ে ওপরে তার ঘরে গেছে, ঝড়ের বেগে বিশু এসে হাজির। এ বাড়িতে তার ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত, মৃগনয়নার সঙ্গে অনেক দিনের ভাব। এখন সে এম-এ পড়ে ও মৃগনয়নাকে পড়ায়। কি করে যে এ বন্দোবস্তটা স্থির হল বাড়ির লোকেরা কেউ খেয়ালও করেনি। মৃগনয়নার জন্য একজন মাস্টার রাখার প্রশ্ন উঠেছিল। একদিন দেখা গেল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।
বিশু ব্যগ্র কণ্ঠে মৃগনয়নার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে ?'
মা বললেন, 'ভালো আছে। তেমন কিছু হয় নি। এই তো ভাত খেয়ে ওপরে গেল।'
বিশু যখন ওপরে গেল, মৃগনয়না ঘরের দরজার ভারি পর্দাটা দু'পাশে ভালো করে টেনে দিচ্ছে। বিশুকে ধরে ভেতরে ঠেলে দিয়ে পর্দাটা ঠিক করে সে মুখ ফেরাল।
'এত রাতে সবার শেষে উনি খবর নিতে এলেন। কী দরদ!'
'আমি কি জানতাম ? এইমাত্র খবর পেলাম।'

'অন্য সবাই খবর পেল কি করে? খবর যে রাখতে চায়, খবর তার জোটে।'
বিশু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমাকে শোনাবার জন্য বাঁশি বাজাচ্ছিলাম।' মনে হল ছাতে তুমিই ঘুরছ, তাই একটু বাজালাম। শোন নি?'
মৃগনয়না চুপ করে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ তাই তো। তোমার বাঁশি শুনতে শুনতেই ভগবানকে প্রণাম করলাম। এমন করে বাজাও, তুমি, এমন অস্থির করে আমায়!'
বিশু মুখ ভার করে বলল, 'ও' তামাশা হচ্ছে!'
মৃগনয়না বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ নাকি? তামাশা নয়—সত্যি সত্যি সত্যি।'
মৃগনয়না চট করে পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দু'হাত সামনে তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তেমনি ভাবে হাত তুলে দাঁড়িয়ে বিশুর হাসি ফুটে উঠল। কলহই হোক বা কথাকাটাকাটিই হোক, এই হল তাদের সন্ধিস্থাপনের বহুকালের পুরানো রীতি। মৃগনয়না হিস করামাত্র দু'জন একসঙ্গে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ফেলল। একটি চুম্বনও এই রীতির অন্তর্গত। কোনোরকমে সেটা শেষ করেই মৃগনয়না বিছানায় বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি একটু অসভ্য, গুণ্ডা, বিশু।'
শুনে বিশু একেবারে নিভে গিয়ে বলল, 'কেন? আমি কি করেছি?'
'কি করেছ, তাও বলে দিতে হবে। তুমি এখনও পুরুষ মানুষ হওনি বিশু। কত জোরে ধাক্কা দিয়েছ জানো। কি রকম লেগেছে জানো?'
'সত্যি লেগেছে? মৃগনয়নার সামনে হাঁটু পেতে বসে বিবর্ণ মুখে বিশু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন মৃগনয়নার মুখে দেখা গেল হাসি। বিশুর মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে মিষ্টি সুরে বলল, 'সত্যি লেগেছে। তোমার দোষ নেই, তুমি তো কিছু জানো না। তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখেছ, আর এইটুকু শেখনি যে ছুটে এসে আমাকে তোমার ধাক্কা দিতে নেই? আমি ছুটে যাব, তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলবে। ষাঁড়ের মতো গুঁতো দিলে মেয়েদের লাগে না?'
বিশু-প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'আমারও তো লেগেছে।'
'পুরুষ হলে লাগত না।'
পাঁচ মিনিট পরে দু'জনের জোরালো হাসি কানে যেতে মা হাঁক দিয়ে বললেন, 'ও বাবা বিশু, রাত যে অনেক হয়ে গেল বাবা।'
যাওয়ার আগে বিশু বলল, 'সেখানে যাবে?'
'না। আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে।'
বিশু বাড়ি পৌঁছবার আগেই মৃগনয়না ঘুমিয়ে পড়ল। মা এসে মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন না, পেটের মেয়েকে! মেয়ে তার ভক্তিমতী। কিন্তু মায়ের মতো মন্দিরে গিয়ে কোনো

দিন প্রণাম করে না, দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত বাপের সঙ্গে উপাসনায় বসত, এখন তাও বসে না। ছাতে গিয়ে একা ভগবানকে প্রণাম করে। আকাশে জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছুটে যেতে দেখতে পায়। চলাফেরা কথাবার্তায় কিছুই ধরা যায় না। কোমল মন তার এমন মিষ্টি স্বভাব, কোন্ ঘরে সে যাবে ভেবে বুকটা তার ধুক্‌পুক্ করে। তবু মেয়েটাকে তিনি বুঝতে পারেন না। পেটের সন্তানকে যেন ভিন্ন মনে হয়।

মৃগনয়নার স্তন্যপানের ধরনটা পর্যন্ত যে তার মনে আছে! সে কেন পর হয়ে না গিয়েও অজানা হয়ে গেল!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন, কি করে অনুমান করে তাঁর স্বামী তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এঘরে তিনি একলা থাকেন, যখন ইচ্ছা ঘরে যাবার অনুমতি স্ত্রীর আছে। কিন্তু যিনি সর্বদাই আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকেন অথবা বই পড়েন, তাঁর কাছে বেশি যাবার ইচ্ছা লোকের হয় না। ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এক হাতে জড়িয়ে তাকে আরও কাছে টেনে নিলেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার অবজ্ঞায় তুমি কাঁদছ বড় বৌ? তুমি তো ইচ্ছে করলেই আসতে পার, যখন খুশি আসতে পার!'

মৃগুর মা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'সেজন্য নয়।'

মৃগুর বাবার মুখখানা একটু শ্লান হয়ে গেল, জড়ানো হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এল।

'মেয়ের জন্য বড্ড ব্যাকুল হয়েছে মনটা।'

মৃগুর বাবা সহসা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, 'মিগুর জন্য? কেন, কি হয়েছে?' রাত দুটো পর্যন্ত সেদিন তাঁদের কথা চলল।

ইতিমধ্যেই একটি সুপাত্র পাওয়া গেল। শিক্ষিত, সুশ্রী, বড়লোকের ভালো ছেলে। একটা দিনও স্থির হয়ে গেল, যেদিন পাত্র এসে মৃগনয়নাকে দেখে শুনে পছন্দ করে যাবে। না, ঠিক প্রাচীন যুগের মেয়ে দেখার অসভ্যতা তারা করবে না। বাড়িতে দু'তিনটি ভদ্রলোক পরিচয় করতে এসেছেন এমনি সাধারণভাবে আগমন ও এবিষয়ে ওবিষয়ে অল্প আলোচনা হবে। বিয়ের পরেও মৃগনয়না যতদূর খুশি পড়তে পাবে। সত্য কথা বলতে কি, পাত্র নিজেই তা চায়। মৃগ-নয়না বাবার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলল, 'আমি যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারব না বাবা।'

'কেন, ছেলেটি তো সবদিক দিয়ে ভালো?' পরক্ষণে নিজের ভুল সংশোধন করে বললেন, 'ও! যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারবে না বলছ। বেশ, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনেও তো কেউ এল না আমার কাছে।'

'আজকালের মধ্যেই আসবে বাবা।'

'বেশ। কিন্তু যাদের ডাকা হয়েছে তাদের একটু অভ্যর্থনা করবে না মিগু?'

'করব বৈকি ভদ্রলোক হলে নিশ্চয় করব।'

মৃগনয়না অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। বিয়ে না করলেও তার চলে—পারিবারিক শক্তির সমবেত আক্রমণ প্রতিরোধ করার হাঙ্গামাটা শুধু তার পোয়াতে হবে। হাঙ্গামা যখন করতেই হবে, বিশেষ একজনকে বিয়ে করার জন্য হাঙ্গামাটা ঘটতে দিতে দোষ কি? যতীন অথবা বিশুকে বিয়ে করা সহজ দ্বিতীয়পক্ষ হলেও বিশু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কিন্তু ওদের দু'জনকে তার পার্টিতে সমর্পণ করার কথা, নিকগে পার্টি ওদের। হাবুলকে হলেই তার চলবে। পার্টি আপত্তি করবে না, হাবুল আগে থেকেই পার্টির মেম্বার। দু'জনে মিলে তারা কাজ করতে পারবে। বাড়িতে কেবল হুলস্থূল পড়ে যাবে হাবুলকে সে বিয়ে করতে চায় শুনে! বাবাও সহজে মত দেবেন না! কিন্তু সেজন্য মৃগনয়নার বিশেষ ভাবনা নেই। বাড়িতে একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত হাবুলকে সে বিয়ে করতে পারবে।

হাবুল ছাড়া আর কাউকে বিয়েও করা যায় না। অত তেজ, অত আগুন কার মধ্যে আছে? যতীন আর বিশু দু'জনেই বড় বেশি ভালোমানুষ আর ছেলে-মানুষ!

ওদের মনে ব্যথা লাগবে। পার্টির কাজে জীবন উৎসর্গ করেও হয়তো ব্যথাটা সম্পূর্ণ উবে যাবে না। মৃগনয়না ওদের জন্য যতদূর সম্ভব করবে। সর্বদা তাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার সুযোগ ওরা পাবে।

সন্ধ্যার পর পার্টির পাঁচজন প্রধানদের মধ্যে চারজনের কাছে মৃগনয়না তার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল। মিসেস বসাককে আজ বিশেষ করে আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েদের তিনি বোধ্য বিষয় চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারেন। সেক্রেটারি ধরণীবাবুর মুখ প্রতিদিনের মতো একান্ত নির্বিকার, কালা ও বোবা মানুষের মতো তাঁকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র মনে হয়। কিন্তু কথা যখন তিনি বলেন, মনে হয় একজন পরমাত্মীয় এতক্ষণ ছদ্মবেশ ধরে ছিলেন। ধীরেন বড়লোকের ছেলে, কলেজে পড়ে এবং একজন স্টুডেন্ট-লীডার, পার্টির কোনো মেয়েকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। রহমন প্রপাগান্ডা সেক্রেটারি। নরেশ আগে চুপচাপ মানুষ ছিল, পার্টির একটি সমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করার পর আজকাল বড় বেশি কথা কয়।

মৃগনয়নার কথা শুনে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'বিয়ে করবে? কনগ্র্যাচুলে-শান্স! বিয়ের সাধটা শেষ পর্যন্ত উপে যাবে ভেবে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম ভাই। যে কাজের ভারটাই নিয়েছ!'

মিসেস বসাক বললেন, 'আঃ, আপনি চুপ করুন। কিন্তু মৃগনয়না, তোমার কাছে

যে আরও অনেক কিছু পার্টি আশা করছে। আরও কয়েকবছর তুমি আরও কয়েকজনকে পার্টিতে আনতে পারবে, এখনো তোমার সরলতা, সহজ ছেলেমানুষী ভাব আরও কয়েক বছর থাকবে। তুমি বলেছিলে পার্টির জন্য জীবন দেব। এত শীগগির একজনকে হৃদয় দান করে ফেলা তোমার উচিত হয় নি। সাধারণ বাজে মেয়েরা এরকম করে, পার্টির চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তাদের বড় হয়ে দাঁড়ায়। তুমি তাদের মতো নও। যতীনবাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা কোনো মেয়ে যোগাড় করতে পারে নি, তুমি তাঁকে পার্টির মেম্বার করেছ, তাঁকে দিয়ে প্রেস কিনিয়ে দিয়েছ। বিশুকে তুমি পার্টিতে এনেছ, কয়েক বছর ট্রেনিং পেলে ও দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—বিশেষত, তোমাকে পেলে পার্টির জন্য ও করবে না এমন কাজ নেই। তোমার মতো ওয়ার্কার পার্টিতে একজনও নেই। বিয়ের বয়স তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে না, ক'টা বছর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পার না ?'

ধরণীবাবু বললেন, 'তাছাড়া, আমরা ভাবছিলাম সামনের বছর তোমাকে কমিটিতে নেওয়া হবে। এখন পার্টি ছেড়ে যাওয়া—'

মৃগনয়না মৃদুস্বরে বললে, 'পার্টি ছাড়ব কেন ? আমি একজন পার্টির লোককে বিয়ে করছি—দু'জনে আমরা পার্টির কাজ করব।'

মিসেস বসাক সভয়ে বললেন, 'যতীনবাবুকে ? না বিশুকে ? দফা সেরেছ তুমি। যাকে তুমি বিয়ে করবে, তাকেই পার্টি হারাবে। শুধু নামটা হয়তো লেখা থাকবে খাতায়।'

'আমি হাবুলমামাকে—মানে, প্রশান্ত দত্তকে বিয়ে করব।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নরেশ প্রশ্ন করল, 'হাবুলমামা বলছ—?'

'না, সম্পর্ক কিছু নেই। মাকে দিদি বলেন, তাই হাবুলমামা বলি। ওর মনের জোরের তুলনা হয় না। সারাদিন খেটে সকলকে খাটান, তারপর এতটুকু বিশ্রাম না করে পার্টির কাজ করেন। অমন স্বাস্থ্য তাই, অন্যলোক হলে মরে যেত।'

মিসেস বসাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা বিয়ে যদি করতে চাও, বাধা দেবার অধিকার আমাদের নেই। শুধু ভাবছি, বিয়ের পর যতীনবাবু, বিশু এদের মতো কাউকে কি পার্টিতে আনতে পারবে।'

মৃগময়না চুপ করে রইল। ঘরে স্তব্ধতায় তার বক্তব্য যেন মুখর হয়ে রইল শব্দহীন কথায়, পার্টির জন্য সে প্রাণ দেবে কিন্তু তার চুম্বক ধর্মকে আর কাজে লাগাতে পারবে না। দু'জনকে টানতেই তার হাঁফ ধরে গেছে।

মৃগনয়না খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল। হাবুল সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে সবে স্নান শেষ করেছে, মৃগনয়না তাকে গ্রেপ্তার করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সব শুনে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল মৃগনয়নার হাবুলমামা।

'আমি তোমাকে বিয়ে করব ? পাগল নাকি। আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য

বড়লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা—'

'বড়লোকদের বিরুদ্ধে নয়।'

'ওসব কূটতর্ক রাখ। গরীবের মেয়ে হলেও তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না মিগু। বিয়ে যদি কোনোদিন করি, পার্টির কোনো খাঁটি ওয়ার্কারকে করব, যাতে দু'জনে একসঙ্গে কাজ করতে পারি।'

মৃগনয়না বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করল, 'আমি কাজ করি না ?'

'তুমি ?' হাবুলের চোখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি দেখা গেল, 'তুমি পার্টির যতীনবাবুদের মোটরে ঘুরে বেড়াও, হোটেলে খানা খাও, বিশুর সঙ্গে সিনেমায় যাও—পার্টির কাজ কর বৈকি।'

যে বাঁচায়

দশ বছর পরে মাধব দেশের গাঁয়ে ফিরল। রিলিফ ওয়ার্ক চালাবার জন্য। গাঁয়ের নাম বাংগাতলা। গাঁয়ের গৌরব ধনঞ্জয় সরকার। কলকাতায় ব্যবসা ক'রে বড়লোক হয়ে তিনি বাঙ্গাতলাকে ধন্য করেছেন। প্রতিবছর তিনি একবার গাঁয়ে আসেন, সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে এবং একদিনের জন্য। বাংগাতলা ও আশেপাশের আরও কয়েকটা গাঁয়ের লোক তাঁকে অজস্র সম্মান দেয়। দু'চারশো টাকা দান করে তিনি ফিরে যান। সম্মানের বিনিময়ে নয়, এমনি। সম্মান তাঁর পাওনাই আছে। বাংগাতলায় যে অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসা, টিউব ওয়েলের জল ইত্যাদি পাওয়া যায় সে সব সরকার মশায়েরই কীর্তি।

তাঁরই আপিসে মাধব চাকরি করে। নির্ভরযোগ্য হাসিখুশি ভালোমানুষ, গুছিয়ে কাজ করতে পারে এবং কাজ করিয়ে নিতে জানে। আদর্শবাদী অথচ বেশ হিসেবী। প্রচুর বিনয় ও ট্যাক্ট আছে। মাঝে মাঝে বই পড়ার সখ চাপে, আবার কেটে যায়। স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে। ছেলেটিকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে আদর ক'রে অবর্ণনীয় সুখ পায়। ধনঞ্জয় তাকে পছন্দ করেন এবং দেড়শো টাকা মাইনে দেন।

বাংগাতলায় লোকে না খেয়ে মরছে শুনে ধনঞ্জয়ের ভাবনা হয়েছিল। গাঁয়ের লোকের ভালোমন্দের দায়িত্ব তো তার। গাঁয়ের একত্রিশ জনকে তিনি সম্প্রতি আপিসে কাজ দিয়েছেন। ধনঞ্জয় নিজেই যে ফাঁপছিলেন তা নয়, তাঁর জানাশোনা আরও অনেকে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছিল। লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল সেই অনুপাতে—আপিসে, কারখানায় এবং মফস্বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা ওটা গড়ে তোলবার স্থানে। শুধু বাংগাতলা নয়, আশেপাশের আরও কতগুলি গাঁয়ের হাজার খানেক লোককে কাজ দেবার সাধ ধনঞ্জয়ের ছিল। কেশপুরে মস্ত কাজ হচ্ছিল, সকলকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। সবাই খাওয়া পেত, থাকার ঘর পেত, মজুরি পেত—তিনটিই ভালো পেত। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রকাশ পাওয়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নামে কুৎসা রটে গেল, তিনি নাকি কুলি চালানোর দালালি নিয়েছেন। যত চাষী মজুর হতে রাজী ছিল তাদের একজনকেও তিনি তাই কাজ দেন নি। নিন্দেটা তাতে প্রমাণ হয়ে যেত। তারপর ধনঞ্জয় স্থির করেছেন বাংগাতলায় দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করবেন। না করে উপায়ও তাঁর ছিল না। নানা দিক থেকে চাপ পড়ছিল। তার মতো বড়লোক অনেকে বিতরণ করছে, এ একটা চাপ। কনট্রাক্ট দেবার কর্তারা ইঙ্গিত করছেন, সে আরেকটা চাপ। বাংগাতলা হিতৈষিণী

সমিতি (প্রেসিডেন্ট—ধনঞ্জয় সরকার) গাঁয়ের লোকের প্রত্যাশাকে আবেদন নিবেদনের রূপ দিচ্ছে, সেও চাপ। তাছাড়া পূর্বোক্ত কুৎসাটির প্রতিকার করার বাসনার চাপ এবং হৃদয় নামক অঙ্গটির দয়াদাক্ষিণ্য ও উদারতার চাপ তো আছেই।

কাজের ভারটা তিনি দিয়েছেন মাধবকে ; সেই দরকারী উপদেশও দিয়েছেন। মাধবকে বেশি বলা বাহুল্য, কি ভাবে কি করতে হবে তার পলিসিটা বাৎলে দিলেই সে সব সমঝে নেয়। মাধবের নীতিজ্ঞান অতি তীক্ষ্ন।

'একটু সামলে চোলো হে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় লোকারণ্য কেন ? ফুটপাতে মানুষ মরতে আসছে কেন ? কলকাতায় খাবার আছে। বেশি খেতে দিলে চাদ্দিকের লোক বাঙ্গাতলায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামলাতে পারবে না। কি অবস্থা।'

'ছোট মগের মাপে দেব ভাবছি। বেশি সইতেও পারব না, পেট খারাপ হয়ে যাবে।'

'অন্নই আসল জীবন। ব্যঞ্জন নয়, স্বাদগন্ধ নয়।'

'নিশ্চয়ই। ভিক্ষের চালের আবার কাঁড়া-আঁকাড়া।'

এমন অবস্থা আর হয় নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোথা লাগে। ভালো কথা মাধব, অক্ষয়ের বোনটা নাকি নিখোঁজ হয়েছে ?'

নিখোঁজ মানে ওই আর কি যা হয় বুঝলেন না ?'

'তা, দোষ কি করে দি ? যুবতী মেয়ের খিদে একটু বেশিই হয়। আহা, এদিকে খিদের জ্বালা, ওদিকে বদ্‌লোকের প্রলোভন, যুবতী মেয়ে তো যতই হোক। গাঁয়ের কেউ ওকে দু'টি খেতে দিতে পারল না ? ভদ্র ঘরের বাড়ন্ত যুবতী মেয়ে, চাইতে পারে না বলে কি দিতে নেই ? ছি ছি ! এ গাঁয়র কলঙ্ক, আমার কলঙ্ক। বিপাকে পড়লেও ভদ্রঘরে ভিক্ষা নেবে না। লুকিয়ে কিছু কিছু চাল ডাল ঘরে দিয়ে এলে ওদের মানটাও বাঁচে, প্রাণটাও বাঁচে।'

'আমার দোষ নেই। অক্ষয়ের বিধবা মা আর যুবতী বোনটা যে গাঁয়ে পড়ে আছে কেউ আমায় জানায় নি। তবু আমিই দোষী। জেল থেকে বেরিয়ে অক্ষয় ভাববে কি না বলো যে সরকার মশায় থাকতে তার এই সর্বনাশ হল ?'

'তা ঠিক। দেখি কি করতে পারি।'

স্টেশনে ভিড় করেছিল একদল নরনারী যাদের দেখলেই মরণাপন্ন গাছের কথা মনে পড়ে যায়। মাধব তাদের জন্য কলকাতা থেকে চাল ডাল আটা ময়দা নিয়ে আসছে খবর শুনে তারা স্টেশনে ছুটে এসেছে। না, ঠিক ছুটে তারা আসে নি, ধীরে ধীরে হেঁটেই এসেছে। বাঙ্গাতলা থেকে স্টেশন মোটে তিন মাইল পথ, দশ পনের মাইল হলেও তারা আসত। কারণ, দান এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নিতে হয়,

নইলে ফুরিয়ে যায়। জগতে চিরকাল চাওয়ার তুলনার দাম কম পড়ে এসেছে সবার আগে হাত পাতবার প্রয়োজনটা তাই সবাই জানে।

বেলা তিনটের গাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যা সাতটায়। স্টেশনের গ্রাম্যতা তখন অন্ধকারের রূপ নিচ্ছে। লোক দেখে মাধব প্রথমে ভেবেছিল, সরকার মশায় আসবে শুনে সবাই বুঝি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসে ভিড় জমিয়েছে, তারপর আসল ব্যাপার টের পেয়ে তার বেশ একটু উল্লাস ও গুরুত্ববোধ জাগল কারণ যাই থাক, তারই প্রতীক্ষায় এতগুলি লোক জমা হয়েছে এ চিন্তা মানুষকে উল্লাস দেবেই, নয়তো কোনো চাপরাসী কোনোদিন খাতির পেয়ে খুশি হত না। গুরুত্ববোধ জাগল দায়িত্বের হদিস পেয়ে। এদের প্রত্যাশা যে কত অধীর এই ভিড় তার প্রমাণ। তাকে কারবার করতে হবে এদের নিয়েই।

মাধবের সংগে শুধু বিছানা আর সুটকেস নামতে দেখে জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ্য উপলব্ধি করে মাধবের গা ছমছম করতে লাগল। খালি হাতে স্টেশনে নেমে সে যেন হৃদয় মনের একটু বিরাট অভিযানকে বিপথে চালিয়ে দিয়েছে; পাক দিয়ে এসে সেটা রক্তমাংসের আক্রমণে পরিণত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

হেডমাস্টার ভূপতি চক্রবর্তী বললেন, 'আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি বলেছিলাম, বিশ্বাস করে নি।'

মাধব কি আর করে, দু'বার খুক্ খুক্ করে কেশে নিয়ে চিৎকার আরম্ভ করল: সকলে শোন—

সকলে শুনল। সেই ভয়ানক স্তব্ধতা ভেঙে গেল। উন্মুখ ভিক্ষুক বোধহয় মরে গেলেও আশ্বাসের মন্ত্রে বেঁচে ওঠে। নয়তো পৃথিবীতে এত মানুষ আজও বেঁচে আছে কেন? ভিড় যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে সশব্দ উত্তেজনায় জীবনের গুঞ্জন তুলে গাঁয়ের দিকে রওনা হল। আজ আসে নি কিন্তু তাদের জন্য অন্ন আসবে। খেতে তারা পাবেই। স্বয়ং ধনঞ্জয় সরকার তাদের সকলকে খাওয়াবেন। স্টেশনে আসা তাদের সার্থক হয়েছে। ঝোপে আর গাছে ছড়ানো জোনাকিগুলি যেন টেপা টেপা সংকেতে সায় দিতে লাগল।

স্কুলের ঘরে মাধবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল আজ মাস দুই বন্ধ আছে। ছেলে হয় না বলে ধনঞ্জয় পুজোর ছুটি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। স্কুলের লাগাও হেডমাস্টারের বাড়ি, মাধবের জন্য তিনি খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন ভালোই। হেডমাস্টারের স্ত্রী নিজে পরিবেশন করে তাকে খাওয়ালেন, পান এনে দিল তার মেয়ে। অতিথিকে ঘরের লোক করে নেওয়াটা গ্রাম্য ব্যবহার। তবে এক্ষেত্রে সেটা একটু খাতির করায় দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলের মাস্টারের বেতন এক পয়সা বাড়ান হয় নি, এই দুর্দিনে তাদের দিন চলে না। এদিকে মাধব ধনঞ্জয়কে

একটু বললেই এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। এটুকু উহ্য থাকলে ভূপতির বাড়ির পারিবারিক আদর-যত্নে মুগ্ধ হয়ে যেতে পারত।

স্কুলের কেরাণী শ্যামল এ বাড়িতেই থাকে। খাওয়াদাওয়ার পর আড়াল থেকে স্বার্থের কথাটা সেই সামনে টেনে আনল। শ্যামলের বয়স ত্রিশের নিচে, অজীর্ণের চেহারা। বিনিয়ে-বিনিয়ে শোভাযাত্রার মতো কথা বলে।

'আমাদের দিকে একটু না তাকালে আমরা আর বাঁচিনে, মাধববাবু। বাবার অপিসের পিয়ন পর্যন্ত রেশন পাচ্ছে, আমার ইদিকে—শ্যামল প্রায় কখনোই মুখের কথা শেষ করে না। যেটুকু বলা হলে বক্তব্য বোঝা যায় সেইটুকু বলেই সে হাসির ভঙ্গিতে নীরবতার জের টানে।

মাধব হেসে বলল, 'আপনারা তো সুখে আছেন মশায়। ছুটিও ভোগ করছেন, মাইনেও পাচ্ছেন।'

ভূপতি বিমর্ষভাবে বললেন, 'সরকার মশায় হঠাৎ যে কেন স্কুলটা বন্ধ করলেন। প্রায় নব্বুইটি ছেলে অ্যাটেন্ড করছিল—'

'নব্বুই ? বলেন কি স্যার !' মাধবের পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিজে অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টার দেখে অ্যাভারেজ কষে পাঠিয়েছি। বাবু বুঝি বিশ্বাস করেন নি ?' ভূপতি শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

আবার পান চিবোতে আরম্ভ করে মাধব বলল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না মাস্টার মশায়। বাবুকে জানেন তো, কখন কি খেয়াল চাপে কেউ টেরও পায় না। উনি মাসিক পিয়নকে পাঠিয়েছিলেন ছেলে গুণতে। ও ব্যাটা এক নম্বর ধূর্ত। গিয়ে বলে কি, নিমতলায় গামছা কাঁধে ঠায় বসে থেকে এক এক করে, গুণে দেখেছে, তেত্রিশটি ছেলে স্কুলে এল।'

শ্যামল হাত কচলাতে লাগল। ভূপতি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেদিন —হয়তো কিছু কম ছিল। মানে, কি জানেন, মেলা-টেলা থাকলে ছেলেরা আসে না।'

স্কুলের ঘরে শুতে গিয়ে ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য উদারতার কথা ভাবতে ভাবতেই মাধব সে রাত্রে ঘুমোল। তাকে পর্যন্ত ধনঞ্জয় জানান নি যে ভূপতি ছেলের সংখ্যা বাড়িয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন, মিথ্যাটা তিনি ধরে ফেলেছেন। মিথ্যাকে তিনি মিথ্যা বলে গ্রহণ করেন নি, ভূপতির প্রবঞ্চনা ক্ষমা করেছেন, চেপে গেছেন। এদের আতঙ্ক তিনি টের পেয়েছিলেন। স্কুল বন্ধ হলে মাইনেও বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মরিয়া হয়ে অন্যায়টা করে ফেলেছেন অনুমান করে রাগ হওয়ার বদলে তাঁর অনুকম্পা জেগেছে। কী মহৎ তিনি। ফিরে গিয়ে সর্বাগ্রে মাধব তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবে। তিনি যে জেনেছেন একথা জানিয়ে ভূপতিকে লজ্জা দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা পর্যন্ত দমন করার মহত্ত্বেই ধনঞ্জয় মাধবের কাছে দেবতার চেয়ে বড় হয়ে যান। ভক্তির উত্তাপে মাধবের মোহ ঘন আঠালো হয়ে আসে।

দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে তার দু'বার ঘুম ভেঙে গেল। দু'বারই শেয়ালের ডাক শুনে প্রায় আধঘণ্টা করে সে জেগে রইল।

সকালে চা খেতে গিয়ে দিনের আলোয় মাধবের খেয়াল হল ধনঞ্জয় যাদের যুবতী বলেন ভূপতির মেয়েটি সেই পর্যায়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য মাধবের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল। এর জন্যই কি ভূপতির প্রতি ধনঞ্জয়ের এত দয়া? স্বাদগন্ধহীন গেঁয়ো চা-টুকু গিলতে গিলতেই মানসিক বিশ্বাসঘাতকতার প্রক্রিয়াটি সে সামলে নিল। ওসব দোষ ধনঞ্জয়ের নেই। তিনি শুধু অধ্যবসায়ী কৃতী পুরুষ নন, চরিত্রবানও বটে। তাঁর শত্রুও একথা স্বীকার করবে। ভূপতির মেয়েকে হয়তো তিনি কোনোদিন চোখেও দেখেন নি। হয়তো শুধু শুনেছেন যে ভূপতির একটি যুবতী মেয়ে আছে। যাদের বাড়িতে যুবতী বোন বা মেয়ে আছে তাদের ধনঞ্জয় একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। চাকরি দেবার সময় প্রত্যেকের পরিবারের খবর তিনি খুঁটিয়ে জেনে নেন। কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে এসে খালি হাতে ফিরে যায় নি। মাধব জানে ধনঞ্জয়ের এই সদা-জাগ্রত সহানুভূতি সূর্যের আলোর মতো নির্মল। যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোনো দুর্বলতা নেই, তাঁর সবটুকু সহানুভূতি শুধু যুবতী মেয়ের বাপ ভায়ের জন্য।

'অক্ষয়ের বোনটার খবর জানেন মাস্টার মশায়? নলিনীর?'

'সে সদরে আছে।'

'সদরে নাকি! শুনেছিলাম একেবারে নিখোঁজ?'

'না, সদরে নৃসিংহবাবুর রিলিফ ওয়ার্ক করছে।'

'বটে? তবে যে শুনলাম নৃসিংহবাবুর ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে খেতে না পেয়ে?'

'ঠিক পালিয়ে যায় নি, চলে গেছে। বলা হল অনেক, কারো কথা শুনল না। ওর মা তো ওকে গাল দিয়ে কিছু রাখে নি। শিবুবাবু, ভোলা নন্দী এঁরা সবাই কিছু টাকা সাহায্য দিতে চাইলেন, সরকার মশায়কে বলে সব ঠিক করে দেওয়া হবে জানান হল, ও তা গ্রাহ্যও করল না। খালি বলতে লাগল, 'যান্, আপনারা যান্।' মাকে ফেলেই চলে গেল।

শেষ কথাটায় মাধব মুচকে হাসতে থাকে। ওটা যেন বলাই বাহুল্য ছিল।

শ্যামল বলে, 'সে এক কাণ্ড মাধববাবু। মা টেনে হিঁচড়ে মেয়েকে আটকাতে চায়, মেয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাকে। বুড়ী কেন গায়ের জোরে পারবে অমন জোয়ান মেয়ের সঙ্গে! টানতে টানতে বেলতলা তক্ নিয়ে গেছল। বুড়ী তখন হাঁউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। আমরা মেয়েটাকে ধমকে ছাড়িয়ে দিলাম।'

ভূপতির মেয়ের মুখখানা বিবর্ণ ম্লান দেখাচ্ছিল। তিনবার সে ঘরে এসেছে, গেছে। এসব কথা শুনে সে যেন সইতে পারছে না থাকতেও পারছে না না-শুনে।

হঠাৎ সে বলল, 'নলিনী আমায় চিঠি লিখছে বাবা। পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে ওর মার জন্য।'

ভূপতি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আন তো চিঠিটা, দেখি কি লিখেছে।'

চিঠিখানা প্রথমে দেখল মাধব, সে উপস্থিত থাকতে প্রথম কিছু করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে না। মস্ত লম্বা চিঠি, মনকে ঢেলে দেবার সবচেয়ে উপযোগী ব্যক্তিগত সস্তা ভুল ভাষায় লেখা বলে স্পষ্ট পরিষ্কার মানেতে আগাগোড়া ঠাসা। সবাই কি ভাবছে আর তার কি হবে ভেবে নলিনীর কান্না পাচ্ছে। বাগানতলায় পড়ে থেকে মরে গেলেই তার ভালো ছিল। নলিনী আর বাঁচতে চায় না, কিন্তু বেশ আছে সে দিনরাত খাটতে খাটতে মরে যাওয়ার মতো কাজের মধ্যে, তবে কিনা বুক ফেটে যায় মানুষের দুর্দশা দেখলে। নলিনীর দাদা তাকে বলত যে ভিক্ষে করা আর ভিক্ষে দেওয়া দুটোই সমান পাপ। কারো কাছে ভিক্ষে নেবে না বলেই তো সে চলে গেছে, ভিক্ষে দেবেও না। তবে ভিক্ষে দেওয়ার কাজ যে সে করছে সেটা ভিন্ন। নিজে তো আর সে ভিক্ষে দিচ্ছে না, সে শুধু কাজ করছে। কাজ তো তাকে করতে হবে, তাই সে কাজ করছে। কি কাজ করতে হচ্ছে তা সে ভাবতে যাবে কেন? মানে, নলিনী শুধু কাজটাই করছে, আর কিছু নয়। যাদের সে খেতে দিচ্ছে ইচ্ছে করে দিচ্ছে না। ক্ষমতা থাকলে সে কিছুতেই দিত না। সবাই মরলেও দিত না। দাদার কথা নলিনী পালন করছে।

চিঠি পড়ে বোঝা যায় এই কথাটা বুঝিয়ে লিখতে নলিনী বেশ ফাঁপরে পড়েছিল। দু'লাইনে তার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা তার বোধগম্য হয় নি, সম্ভব বলে ভাবতেও পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লিখেও তার মনে সন্দেহ রয়ে গেছে যে মনের আদর্শ মনে রেখে কাজের জন্য কাজ করার নীতি-কথাটা সে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে কিনা এবং ভূপতির মেয়ে বুঝবে কিনা।

চিঠি পড়ে মাধব বা ভূপতি কেউ কোনো মন্তব্য করল না। শ্যামল টেনে টেনে বলল, 'ফাজিল মেয়ে। যেমন ভাই তার তেমনি বোন। ভর্তি হতে চায়নি আমাদের এই স্কুলে। এ যেন মেয়ে স্কুল, ধেড়ে মেয়ে নিলেই হল। বলে কিনা মেয়েদের একটা সেকসান করুন। ওর হুকুমে মেয়েদের সেকসান খোলা হবে! ছেলেদের স্কুলেই ছেলে হচ্ছে না—'

'আমার চিঠি দিন?' ভূপতির মেয়ে ফোঁস করে উঠে শ্যামলের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।— 'আপনি তো যেচে পড়াতে চেয়েছিলেন ওকে। রোজ গিয়ে পড়িয়ে আসবেন বলেছিলেন।'

ভূপতি শ্যামলের হয়ে অপরাধীর মতো বললেন, 'লেখাপড়া শেখার খুব ঝোঁক আছে মেয়েটার। বড় উত্যক্ত করে তুলেছিল। শেষে কি আর করি, আমার মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে পড়াতাম।' ভূপতি একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখা। ছেলেরাই এডুকেশন পাচ্ছে না, মেয়েরা কি করবে এডুকেশন

দিয়ে ?’
মাধব বলল, ‘দাঁড়ান, মেয়েদের একটা স্কুল খুলিয়ে দিচ্ছি।’
ভূপতি চমকে গেলেন। শ্যামল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চলে যেতে যেতে ভূপতির মেয়ে থমকে দাঁড়াল।
‘সরকার মশায় রাজী হবেন ? কিন্তু মেয়ে তো বেশি হবে না !’
‘দশটি মেয়ে তো হবে ? তাই ঢের।’
ধনঞ্জয়ের ছোঁয়াচ লেগে মাধবের কি হয়েছে, হঠাৎ সৎকর্মের অদম্য প্রেরণা জাগে। মেয়ে স্কুল খোলবার চিন্তায় সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাকে যে কমিটি গড়ে, ভলান্টিয়ার যোগাড় করে, সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা ঠিক করে, স্কুলের একটা অংশ ঘিরে এবং আরও বহু হাঙ্গামা করে অন্নসত্র খুলতে হবে সে ভাবনা প্রায় চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো। ধনঞ্জয় রাজী হবেন। খুবই সহজেই মাধব তাঁকে মেয়ে স্কুল খুলতে রাজী করাতে পারবে। পড়ানোর কাজ দিয়ে তিন চার জন যুবতী মেয়ের উপকার করার সুযোগ ধনঞ্জয় ছাড়বেন না।
মাধবের কাছে এই নতুন পরিকল্পনা পেয়ে তিনি খুশি হবেন। ধনঞ্জয় খুশি হলে মাধবের হবে সুখ।
বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সভার কয়েকজন মাতব্বর সভ্য এবং স্কুলের অন্য মাস্টাররা এসে পড়ায় মাধবকে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত হতে হল। মনটা তার একটু আনমনা হয়ে রইল।
গাঁয়ের চারদিক ঘুরে আসবার ইচ্ছা মাধবের ছিল। দুপুরে বিশ্রাম করে বিকালের দিকে ভূপতি, শ্যামল এবং আরও দু’জন হিতৈষিণী সভ্যের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে ভূপতির মেয়ের কাছ থেকে নলিনীর মার পাঁচটা টাকা চেয়ে নিল। নিজেই সে টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসবে।
‘আর গোটা তিনেক টাকা দিয়ে আট টাকা করে দেব। বলব’খন মেয়েই সব টাকা পাঠিয়েছে।’
‘ভালোই তো।’
মুখে সায় দিলেও সকলে একটু শঙ্কিত হলেন। আট টাকাকে বারো চোদ্দ টাকা করতে মাধব আবার চাঁদা না চেয়ে বসে। মাধব সিনেমার স্বাদ পাচ্ছিল। গোপনে পাঁচ টাকাকে আট টাকা করে মা’র হাতে তুলে দিয়ে বলা তার মেয়ে পাঠিয়েছে ?
‘ছেলেবেলা খুব আদর করতেন। কত মোয়া আর তিলুড়ি যে খেয়েছি। হ্যাঁ, চন্দ্রপুলিও খাওয়াতেন। এখনো জিভে স্বাদ লেগে আছে মনে হয়। কি কপাল দেখুন মানুষের, উপযুক্ত ছেলে থাকতে কেউ দেখবার নেই।’ সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা গেল। নলিনীর মার উপযুক্ত ছেলে যে থেকেও নেই, এটা বড় খাপছাড়া সত্য।
ধনঞ্জয় দাতব্য ঔষধালয়ের কিছু দূরে নন্দীদের বাড়ির কাছে নলিনীর মার বাড়ি।

ঘর তিনখানা ভাঙাচোরা, উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ান। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে লাগছিল, উঠোনে পা দিতে গন্ধটা ঘন ও গাঢ় হয়ে উঠল।

দক্ষিণের ঘরে দরজা খোলা। পায়ের শব্দে একটা শেয়াল খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের কানাচ দিয়ে ডোবার পাশে বাঁশবনে চলে গেল।

বিলামসন

স্টিফেন এফ বিলামসনের মনটা সরল, কেবল বুদ্ধিটা একটু প্যাঁচালো, জাত বেনের যেমন হয়। দরকার না হলে অকারণে কখনো সে প্যাঁচ কষে না এবং প্যাঁচ যাতে গভীর হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকে। মিথ্যাকে সে আমল দেয় না। সাদাকে যদি বা কালো বলে, এমন জোরের সঙ্গে বলে এবং এতখানি তেজ আর আন্তরিকতা থাকে তার বলার মধ্যে, যে লোক থতমত খেয়ে ভাবে তারই বোধহয় ভুল হয়েছে। বিলামসনের সাহস দুর্জয়। যেখানে ভয়ের কিছু নেই, যেখানে প্রতিপক্ষ তার চেয়ে দুর্বল, সেখানে সে দুঃসাহসী। শঙ্কার কারণ থাকলে শঙ্কিত না হয়ে সে উদারভাবে সাহস দেখাতে বিরত থাকে, তাতে তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অন্যায় সে কখনো করে না, অন্যায় করতে হলে আগে ঈশ্বরের কর্তব্যের, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে সে বিশ্ব জগতের কাছে ঘোষণা করে নেয়, সেটা অন্যায় নয়, অতিশয় ন্যায়। সাতান্ন বছর বয়স হয়েছে বিলামসনের। মেহেদি রঙের চুলে সাদার ছোপ ধরেছে। মিসেস বিলামসনের বয়স হবে ছেচল্লিশ, তবে বয়স গোপন করার কৌশল ভদ্রমহিলা এত ভালো জানেন এবং ওই সাধনায় প্রতিদিন এত সময় ব্যয় করেন যে মনে হয় তিরিশ বছরের যৌবনে যেন ভাটা ধরে নি। তবে জোয়ারের জল প্রাচীর তুলে আটকে দিলে তাতে যেমন শ্যাওলা জন্মায়, জল খারাপ হয়ে পচাপচা দেখায়, মিসেস বিলামসনের রূপেও তেমনি হয়ে গেছে। বিশ বছরের মেয়েটির পাশে বিশেষ করে বদ দেখায়। মেয়েটির নাম অরেল্যো। অরেল্যো যে খুব বেশি রূপসী তা নয়, চোখ, গালের উঁচু হাড় আর বৈচিত্র্যহীন ছিপছিপে গড়নে রূপ সৃষ্টি হয় না, তবু ছেচল্লিশের সঙ্গে কুড়ির তফাৎ অনেক।

একটি ছেলে আছে বিলামসনের, আর্থার। অরেল্যোর চেয়ে আর্থার কিছু বড়। আর্থারের তেতাল্লিশটা বিভিন্ন রকমের টাই আছে।

বিলামসন সম্প্রতি সপরিবারে নগরগড়ে মহীধর রায়ের বাড়িতে বাস করছে। বাস করেছে অনেকদিন, যদিও মহীধর তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল দিন কয়েকের জন্য। মহীধর অত্যন্ত অতিথিবৎসল, তাদের বংশে চিরদিন এই বাৎসল্যের প্রবল প্রকোপ দেখা গিয়াছে বিলামসন নড়বার নামও করত না, তবু মহীধর প্রত্যেক সপ্তাহেই দু'চারবার তাকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করত। বিলামসনেরা সপরিবারে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলত, 'অত করে বলবার দরকার

নেই রায়। আমরা নিশ্চয় থাকব।'

কয়েক সপ্তাহ অতিথি হয়ে বাস করবার পর বিলামসন ম্যানেজার হয়ে বাস করছে। সেকেলে বিশাল তিনমহাল বাড়িটার গায়ে লাগিয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে মহীধর যে একেলে ধাঁচের নতুন বাড়িটা তুলেছে, তাতে। বাড়িটিতে শোবার ঘরের সংখ্যাই হবে ডজনখানেক। অতিথি পরিবারটিকে প্রথমে মহীধর তিনখানা শোবার ঘর আর একটি বসার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর বিলামসন নিজে কাজ করবার জন্য একটি অফিস ঘর, আর্থারের জন্য একটি পড়ার ঘর এবং অরেল্যের জন্য বসবার ঘর চেয়ে নিয়েছে। তারপর আরও একটি বাড়তি ঘর তার কি কারণে দরকার হয়েছে মহীধর ঠিক বুঝতে পারে নি। তারও পরে মহীধরের বাড়ির এই আধুনিক অংশটির সমস্তটাই বিলামসন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

মহীধরের এক বন্ধুর সপরিবারে আসবার কথা ছিল, নতুন বাড়ির একাংশেই তারা থাকবে। এ বাড়িতে পাঁচ সাতটি পরিবার একসঙ্গে আরামে বাস করে গেছে।

মহীধরের বন্ধু পরিবার এসে পেঁছিবার আগে বিলামসন বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে রায়। অন্য কোথাও ওদের যদি থাকবার ব্যবস্থা করে দাও বড় ভালো হয়। ভেবো না, দেশীলোক বলে আপত্তি করছি। মোটেই তা নয়। তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার বনে না। তা ছাড়া তোমার ও বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই।'

তারপর আরও অনেকবার মহীধরের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিন্তু বাড়ির নতুন অংশে কেউ স্থান পায় নি। কয়েকবার বিলামসন নতুন নতুন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আব্দার ধরেছে তার অংশে সে যেন একলা থাকতে পায়। এখন আর বিলামসনকে যুক্তি দেখাতে হয় না, কিছু বলতেও হয় না। অতিথি যারা আসে পুরানো বাড়ির সাতান্নটি ঘরের সব চেয়ে ভালো খান দশেক ঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়, বিলামসনের শান্তি ভঙ্গ করার কথা মহীধর মনেও আনে না।

জেলার কালেক্টর জ্যাকসন সাহেব যখন সস্ত্রীক তিনদিন মহীধরের অতিথি হয়েছিলেন, তখন পুরানো বাড়িতেই তাদেরও থাকতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, বিলামসন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'মিস্টার জ্যাকসনের সঙ্গে আমার সর্বদা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে বুঝতে পারছ না, রায়? নতুন রাস্তা, স্কুল, কারখানা আরও কত বিষয়ে কত কথা বলতে হবে। ওরা আমার বাড়িতেই থাকবে।'

এই প্রথমবার বিলামসন মহীধরের নতুন বাড়িকে আমার বাড়ি বলে ঘোষণা করল। কিন্তু কথাটা যেন মোটেই খাপছাড়া শোনাল না তার মুখে।

জ্যাকসন সাহেবের পর এসেছিলেন স্মিথসাহেব ও বেনেট সাহেব। এঁদের দু'জনেরই পত্নীরা মিসেস বিলামসনের এবং ছেলেমেয়েরা আর্থার ও অরেল্যের প্রাণের বন্ধু। সুতরাং এরাও যে বিলামসনের বাড়িতে বাস করে যাবে সেটা খুবই স্বাভা-

বিক মনে হয়েছিল সকলের।

একটা রাজ্যের সমান মহীধরের জমিদারী—বিলামসনের তত্ত্বাবধানে দিন দিন জমিদারীর উন্নতি হতে লাগল।

লোকটা বিলক্ষণ কর্মঠ এবং উৎসাহী সন্দেহ নেই। নাইবা হবে কেন। পুষ্টিকর, উত্তেজক খাদ্য ও পানীয়ের অভাব নেই, বিশ্রাম সে কাজের অংগ হিসাবে নেয়, অবসর বিনোদন তার অপরিহার্য নিত্যকর্ম, সুপিরিয়রটি কমপ্লেক্স দিয়ে মনকে সর্বদা তাজা রাখে, তার উপর বেনের মতো বাস্তববাদী বলে মানসিক কর্মের মানেই সে বোঝে না। মহীধরের বাড়িতে ও এস্টেটে সে যে কত কি করেছে এবং করছে তার বিবরণ সত্যই চমকপ্রদ। পথঘাটের সংস্কার দিয়ে কাজ শুরু হয়। আশেপাশের গাঁয়ের লোক আজ নগরগড়ে নতুন পিচ ঢালা পথে উঠবার আগে ভালো করে পায়ের কাদা ধুয়ে নেয়। গরুর গাড়ি চলে চলে এতকাল সদরে যাবার বড় রাস্তার দফা নিকেশ করে দিত, মাইল পাঁচেক রাস্তায় এখন গরুর গাড়ির যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। ওপথে এখন মহীধরের, তার অতিথি অভ্যাগতদের এবং বিলামসনের মোটরগাড়ি হুস্ হুস্ করে চলে—খানা ডোবার জন্য টিপে টিপে সাবধানে চালাতে হয় না। গরুরগাড়িগুলি চলাচল করে অন্য পথে। একটু ঘুর হয়, সময় বেশি লাগে; আর কোনো অসুবিধা নেই। রামপুর গাঁ থেকে হানাতিয়া আগে ছিল ক্রোশখানেকের পথ, এখন তিন ক্রোশের সামান্য বেশি কি কম হবে। নগরগড় থেকে সদরের দূরত্ব গরুর গাড়িতে সাত মাইল বেড়ে গেছে। তবে বিলামসনের বন্ধু স্মিথের কোম্পানী নগরগড় থেকে মালপত্র সদরে নিয়ে যাবার জন্য আট দশটি লরি কাজে লাগিয়ে দেওয়ায় অনেক গাড়ির এখন আর খ্যাটর খ্যাটর করে সদরে যাবার দরকার হয় না।

মহীধরের বাড়ির কাছাকাছি নদীর ধারে একটা বিদ্যুৎ তৈরির কল বসানো হয়েছে। মহীধরের বাড়িতে ঝাড়বাতি লণ্ঠন আর টানাপাখার পাট গেছে উঠে। ত্রিশবছর প্রতি সন্ধ্যায় আলো জ্বালার ভার যে লোকটির ছিল, তাকে ছাড়ানো হয় নি। পাখা টানার এগারটি ছেলেবুড়োর কাজ গেছে। বিদ্যুতের কলচালানোর খরচ উঠেও যাতে কিছু লাভ থাকে সে ব্যবস্থা বিলামসন করেছে। নগরের অধিবাসীদের নিজের নিজের কাঁচা-পাকা বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে রাজী করানোর সমস্যাটা তাকে মোটেই কাবু করতে পারে নি। অর্ধেক লোক বুদ্ধিমানের মতো নিজেরাই রাজী হয়েছিল। কাজেই, রাজী করাতে হয়েছিল মোটে বাকী অর্ধেককে। নগরগড়ের যে বাড়িতে সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টার মধ্যে বাতি নিভিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, এখন রাত বারটা পর্যন্ত বালব জ্বালিয়ে সে বাড়িতে সকলে জেগে থাকে।

আলো জ্বলুক বা না জ্বলুক, টাকা মাসে মাসে দিতে হবে। আলো না জ্বালিয়ে টাকা দেবার কথা ভাবতে অনেকের গা জ্বালা করে।

তিনটে কারখানাও বিলামসন বসিয়েছে। তার মধ্যে কাঁচের কারখানাটিই সবচেয়ে বড়—স্যামুয়েল, পিটার অ্যান্ড ডেভিড্সন কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্টস। অন্তত একটা কোম্পানীর মূলধন মহীধরের দেবার ইচ্ছা ছিল। তার এস্টেটে তার জমিতে কারখানা বসাতে বিলামসনের বন্ধুরা শুধু পকেট থেকে টাকা ঢালবে, সহায়তা করা ছাড়া সে কিছুই করবে না, এটা তার কাছে কেমন লজ্জাকর মনে হয়েছিল। কেমিকেলের কারখানার সমস্ত মূলধন, অন্তত অর্ধেক, দেবার জন্য মহীধর উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যা হবার নয় তো আর হয় না। বিলামসন তাকে বুঝিয়ে বলল, 'সত্য কথা বলি রায়, এতবড় দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কি দরকার তোমার অত হাঙ্গামায়? তোমার যথেষ্ট লাভ থাকবে। তোমার এস্টেটের কত উন্নতি হয়েছে, আর কত উন্নতি হবে ভাব তো!'

আরও অনেক কিছু বিলামসন করছে। এস্টেটের বিলি বন্দোবস্ত আদায়পত্র হিসাবনিকাশ ইত্যাদি ব্যবস্থায় যেখানে যতটুকু ঢিল ছিল সব এমন আঁট করে দিয়েছে যে সমস্ত এস্টেট সে টানের চোটে টন্ টন্ করছে। নিয়ম হয়েছে অসংখ্য এবং নিয়মানুবর্তিতার কড়াকড়ি হয়েছে বিস্ময়কর। দেড় আনার গোলমাল নিয়ে দেড় ডজন চিঠি লেখালেখি হয়, প্রশ্ন, কৈফিয়ৎ, মন্তব্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি স্টেটমেণ্টে দেড় দিস্তা কাগজ লাগে, দেড়দিন খেটে একজন কেরানী স্থায়ী ফাইল তৈরি করে। কারও প্রতি বেআইনী অন্যায় হবার উপায় নেই, আইন ছাড়া এক পা চলা নিষেধ। সামান্য বলে কোনো ব্যাপারকে তুচ্ছ করা হয় না, বিচারের জন্য সোজা আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক ধমকেই সাড়ে চার টাকা খাজনা আদায় হয় বটে কিন্তু ধমক দেওয়া তো আইনসঙ্গত নয়। দু'টো মিষ্টি কথায় আপোসে অনেক ব্যাপারের মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো প্রেস্টিজ থাকে না।

বিলামসন বলে; 'প্রেস্টিজ বজায় থাকার ওপব সব নির্ভর করে রায়, এটা কখনো ভুলো না। প্রেস্টিজ বজায় রাখা চাই, প্রেস্টিজ!'

এত কাজ ও দায়িত্বের বিনিময়ে বিলামসন মাসে মাসে মোটে দেড় হাজার টাকা নেয়। মহীধর অবশ্য তাকে থাকবার বাড়ি দিয়েছে, চাকর-বাকর দিয়েছে, খাদ্য এবং পানীয় যোগাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে যে পার্টি দেয় তার খরচটাও দিচ্ছে, তবু ধরতে গেলে বিলামসন যত কিছু করেছে এবং করছে তার তুলনায় মাসে দেড় হাজার টাকা কিছুই নয়। দূর থেকে তাকে আসতে দেখলে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত বলে গোড়ার দিকে বিলামসনের বড় আপসোস ছিল। পালিয়ে যাবে কেন? কি দরকার পালিয়ে যাবার? যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক, সে কাছাকাছি গেলে সেলাম করুক, পালিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়ার মতো অসভ্যতা করা কি উচিত? মাঝে মাঝে দু'চারজনকে ঘরের ভেতর থেকে টানিয়ে এনে বিলামসন তাদের সঙ্গে আলাপ করত।

সঙ্গের আর্দালিকে বলত, 'সেলাম করনে বোলো। বাত্‌লা দো।' সেলাম করা হলে কয়েকবার মাথা হেলিয়ে বলত, 'ডরতা কাহে ? ডরো মৎ।' বলে আলাপ সাঙ্গ করে এগিয়ে যাবার আগে হাতের সরু বেতগাছা দিয়ে সপাৎ করে পথের ধারের আগাছার ডগাটি উড়িয়ে দিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখত, অভয় পাওয়া লোকটি কেমন চমকে উঠে ভড়কে যায়।

খুব বেশি রকম বেয়াদবি না করলে বেতগাছা সহজে মানুষের পিঠে পড়ত না। দীনু বাগ্দী একদিন অরেল্যের ঘোড়ায় চড়া দেখে বোকার মতো হাসছিল, লম্বা লাঠিটা দু'হাতে মুঠো করে ধরে সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁদারামের মতো হাসছিল। বিলামসন কি আর জানত না এরকম করে হাসাটা যে অপমানকর অসভ্যতা দীনু জানে না। তাই, রাগ করে নয়, দীনু যা জানে না তাকে শুধু সেটা জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ওর নিকষ কালো চামড়ায় বিলামসন চার পাঁচটা লম্বা দাগ এঁকে দিয়েছিল। দাগগুলি থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ার আগেই দীনু বাগ্দী গিয়েছিল পালিয়ে।

আরেকদিন বিলামসন সপরিবারে নদীর ধারে বেড়াতে আর পাখী শিকার করতে গেছে বিকালের দিকে। পাঁচু গোয়ালার ছেলে মধু মাঠের গরু নিয়ে ফিরছে বাড়ি। কালি নামে পাঁচুর একটি গরু ছিল একটু বেশি রকম চপল, মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময় তার ঢং যেত বেড়ে। এদিকে যেত, ওদিকে যেত, থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে রুখে দাঁড়াত, হঠাৎ শিং নেড়ে চার পা তুলে ছুট দিত দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে। তবে গুঁতানোর স্বভাব তার ছিল না, দু'বছর বয়সের মধ্যে একটি মানুষকেও সে গুঁতোয় নি। শিং নেড়ে যেদিক লক্ষ করে সে ছুটছিল তাতে বিলামসনদের হাত দশেক তফাৎ দিয়েই সে বেরিয়ে যেত। কিন্তু মিসেস বিলামসন আর অরেল্যে ভয় পেয়ে এত জোরে আর্তনাদ করে উঠল যে বিলামসন ও আর্থার দু'নলা দুটি বন্দুকের চারটি টোটার ছররাগুলি কালির গায়ে ঢুকিয়ে দিল। মধু হাঁউমাউ করে ছুটে এলে এমন বিপজ্জনক হিংস্র জন্তুকে দড়ি ছাড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাতের বন্দুক দিয়ে বিমালসন কয়েক ঘা এবং আর্থার কয়েক ঘা মারল। আর এমনি ক্ষীণজীবী যুবক ছিল মধু যে সেই কয়েকটা ঘায়েই সেইখানে সে পড়ে গিয়ে হয়ে গেল অজ্ঞান।

ত্রিলোচন তরফদারের ছেলে ধূর্জটিকে বিলামসন একদিন খালি হাতেই মেরে বসেছিল। ধূর্জটি শহরে কলেজে পড়ে, সিগারেট খায়। নদীর ধারে বাঁধানো নালায় বসে বিলামসন-পরিবার আশ্বিনের স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করছে; বলা নেই কওয়া নেই একহাত তফাতে বসে পড়ে ধূর্জটি ফুস ফুস করে সিগারেট টানতে লাগল, ধোঁয়া উড়ে আসতে লাগল মিসেস এবং মিস বিলামসনের মুখে। আর্থার টানছিল সিগার, বিলামসন টানছিল পাইপ। ছেলের হাত থেকে সিগারটা টেনে নিয়ে বিলামসন তার জ্বলন্ত প্রান্তটি চেপে ধরেছিল ধূর্জটির গলায়।

এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট হবে ভেবেছিল বিলামসন, হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলেজে বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রমাণ করতে ধুর্জটি বিনা দ্বিধায় সজোরে বিলামসনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল!

বাপ ব্যাটায় তখন চার হাতে ধুর্জটিকে মারতে লাগল কিন্তু একালের বাবু ছেলে শুধু বেয়াদব হওয়া নয় গায়েও যেন তারা কি ভয়ানক জোর বাগিয়ে ফেলেছে, ঘুষি মারার কৌশল শিখেছে অকাট্য। দু'জন তাকে যত মারল, একা সে ফিরিয়ে দিল তার দ্বিগুণ।

বিলামসনের সঙ্গে সেদিন বন্দুক ছিল না।

ধুর্জটি কোঁচার খুঁটে নাকমুখের রক্ত মুছতে লাগল আর বিলামসন নাকে রুমাল চেপে ধরে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। বিলামসনের দুটি দুর্ধর্ষ কুকুর ছিল, চাকরের সঙ্গে তারাও প্রতিদিন হাওয়া খেতে বার হত। একটু এগিয়ে কুকুর দুটির সঙ্গে বিলামসনদের দেখা হয়ে গেল।

বিলামসন চিরদিনই চটপটে। কুকুর দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের বাঁধন খুলে একটু তফাৎ থেকে ধুর্জটির দিকে লেলিয়ে দিল। তীরের মতো সেই কুকুর ধুর্জটিকে একেবারে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

বিলামসন ভেবেছিল ছোকরাটাকে একটু নাস্তানাবুদ করে কুকুর দু'টিকে ডেকে নেবে। ধুর্জটি মারাত্মক রকমের নাস্তানাবুদ হ'ল বটে, কুকুর দু'টিকে বিলামসনের আর ডেকে নেওয়া হ'ল না। এখান থেকে গোয়ালপাড়া বেশি দূরে নয়। নদীর ওপারেই বাগ্দীদের এক বস্তি, অগ্রহায়ণের গোড়ায় এখন হাঁটু ডুবিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করা চলে। চারিদিকে কাছে ও দূরে ত্রিশটি দর্শকের সমাগম বিলামসনদের সঙ্গে ধুর্জটির হাতাহাতির সময়েই হয়েছিল। এইবার তারা হৈ হৈ করে ছুটে এল। দশ বারো জনের হাতে ছিল লাঠি, লাঠির ঘায়ে বিলামসনের কুকুর দুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।

কুকুর দুটিকে না মেরেও ধুর্জটিকে বাঁচান যেত। কুকুর অতি প্রভুভক্ত জীব। কিন্তু বিলামসনের কুকুর বলেই বেচারিদের সেদিন প্রাণটা দিতে হল।

বিলামসন কিন্তু অস্বীকার করে বলল, 'ওসব মিছে কথা। ভয়ে ওরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।'

বিলামসনের ভাবগতিক দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে তার কুকুরপ্রেম সত্যই বড় গভীর ছিল। কুকুরের শোকে সর্বদা মুখে সে গরর্ গরর্ আওয়াজ করতে লাগল পাগলা কুকুরের মতো। যখন তখন যাকে তাকে সপাং সপাং বেত মারছে, কথায় কথায় পাইকপেয়াদা বরখাস্ত হচ্ছে, জরিমানায় জরিমানায় মাইনে. কেউ পাচ্ছে না অর্ধেকের বেশি। চাপ দিয়ে কাবু করে লোক ঢুকিয়ে ঢুকিয়েও কারখানাগুলিতে কিছুতেই লোকের অভাব মিটছিল না, এবার একেবারে সোজাসুজি ধরে বেঁধে কারখানায় নির্বিচারে লোক ঢোকানো শুরু হয়ে গেল—নিজে না

চষলে ক্ষেতে যার চাষ হবে না তাকে পর্যন্ত।

গোয়ালপাড়া উঠে গেল এক মাইল তফাতে একটা জলার ধারে, ওখানে ছাড়া অন্য কোথাও তাদের ঘর তুলতে অনুমতি দেবার উপায় বিলামসন খুঁজে পেল না। নদীর ওপারের সেই বান্দীপাড়ার সকলকে পুরো একমাস ফেলে নদীর ধার উঁচু করার কাজে লেগে থাকতে হ'ল।

অতি ক্ষুদ্র সে নদীতে কোনোদিন বন্যা হয়েছে বলে কেউ স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু বিলামসনের ধনুকভাঙা পণ, একটা মাস বেগার খেটে বন্যার হাত থেকে নিজেদের তারা বাঁচাবেই বাঁচাবে।

দিন এনে দিন কিনে তারা আধপেটা সিকিপেটা খেত, তিনদিন বিনা পয়সায় মাটিকাটার পর তাদের উপোস শুরু হয়ে গেল। যে হাতে লাঠি ধরে বিলামসনের কুকুর ঠেঙিয়ে মেরেছিল সেই হাতে কোদাল ধরার জোরও আর রইল না। তখন বিলামসন একটা কারখানা থেকে অগ্রিম মজুর' আনিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল কিন্তু মাটিকাটা বন্ধ হ'ল না। গুর্খা দারোয়ানেরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুরো একটি মাস তাদের দিয়ে তাদের নিজেদেরই মঙ্গল করাল।

একমাস শয্যাশায়ী হয়ে থেকে ধূর্জটি সেরে উঠল। মনে হল, বিলামসনের কুকুরের কামড় খেয়ে তার মাথাটাও বিগড়ে গেছে। শোভায় বিচিত্র এই যে একটা সুন্দর জগৎ আছে, সুখ শান্তি আরামের মতো অপূর্ব আশীর্বাদ আছে, জীবনে একশ' দেড়শ' টাকার চাকরি আর সুন্দরী বৌ প্রভৃতি বিস্ময়কর সম্ভাবনা আছে অদূরে ভবিষ্যতে, এসব সে যেন স্রেফ ভুলে গেল। দিবারাত্রি টো টো করে ঘুরে ঘুরে অন্য সব মাথাগুলি বিগড়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া তার যেন আর কাজ রইল না।

মাথা প্রায় সকলেরই কমবেশি খারাপ হয়েছিল, তবু সে মাথাগুলি বিগড়ে দিতে কী পরিশ্রমটাই যে করতে হল ধূর্জটির। এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল মাথাগুলি।

কয়েকজন শিষ্য জোটায় অতিকষ্টে মাথাগুলিকে ধূর্জটি কাছাকাছি এনে ফেলল। কি যেন ঘটে গেল তখন নিরীহ গোবেচারী মানুষগুলির মধ্যে, চারিদিকে অভিশাপ শোনা যেতে লাগল, বিলামসন নিপাত যাও।

ব্যাপার দেখে মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'তুমি বরং কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসো বিলামসন।'

বিলামসন মৃদু হেসে বলল, 'ভেবো না রায়। দু'চারজন অকৃতজ্ঞ বদমায়েশ যদি চেঁচাতে চায়, চেঁচাতে দাও। বেশির ভাগ লোক আমাকে পছন্দ করে, আমাকে চায়।'

'তবে একটু নরম হও।'

'ক্ষেপেছ ? এই তো শক্ত হওয়ার সময়।'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যো তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের

নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে কৌচে বসিয়ে পিছন থেকে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মাথায় রাখল। মহীধরের রঙ কালো, রীতিমত কালো। তাকে অরেল্যো এইভাবে পিছন থেকে আদর করে। কারণ, মহীধর তার মুখ দেখতে পায় না বলে মুখের ভাব গোপন করার কষ্টটা তাকে করতে হয় না।

'আমায় দেখলেই এইটুকু বাচ্চা ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মারছে। কত বিস্কুট আমি খাইয়েছি ওদের? সেদিন যে ক'জনকে চাপা দিয়েছিলাম, সেটা কি আমার দোষ? রাস্তার মাঝখানে ওরা খেলা করবে, দূর থেকে হর্ন দিলে সরবে না, কাছাকাছি এসে অত স্পীডের মাথায় কেউ গাড়ি থামাতে পারে? তাই বলে আমাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারবে; কি ব'লে তুমি বাবাকে চলে যেতে বলছ, ওদের অত্যাচার চুপ-চাপ সইতে বলছ?'

মহীধরের মাথা ঘুরতে থাকে। অরেল্যো তার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব, রুচি, কৃষ্টি ক্লাব, হোটেল, সিনেমা, ট্রেন, মোটর, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ, বেতার, সিভিল-কোড, পেনাল-কোড, ডেমোক্রেসি প্রভৃতির অভ্যস্ত চেতনার মতো। মনে হয়, অরেল্যোর অভাবে সে অচেতন হয়ে যাবে। বিলামসনের ভয় তো আছেই, অরেল্যোকে হারা-বার ভয়ও তার কম নয়। ভয়টা কমতে চায় না কিছুতেই; মহীধর কাবু হয়ে থাকে।

মহীধর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও বিলামসনেরা কিন্তু যা কিছু ঘটতে লাগল সমস্তই তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে লাগল। গুলি করে, লাঠি মেরে, বেঁধে রেখে, লুট করে, আগুন দিয়ে, বিলামসন জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্ট করতে লাগল। উৎসাহ উদ্দীপনা ও উত্তেজনার নেশায় সে যেন হয়ে গেল নতুন মানুষ। মুখে শুধু তার ফুটে উঠতে লাগল, আতঙ্ক ও আপসোসের কতগুলি রেখা।

একদিন রাত্রে খবর এল, পরদিন সকালে নিষিদ্ধ পথে পাঁচশো গরুরগাড়ি চলবে। সাধারণের রাস্তা সেটা নয়, দয়া করে সে রাস্তায় সাধারণের পায়ে হেঁটে অথবা রবার টায়ারের গাড়িতে যেতে দেওয়া হয়, বিলামসনের সেই পথে বিলামসনের হুকুম তুচ্ছ করে কাঠের চাকাওলা পাঁচশো গরুর গাড়ি একসঙ্গে সদরে রওনা হবে।

মহীধর কাতর হয়ে বলল, 'যাক না বিলামসন?'

বিলামসন বলল, 'ক্ষেপেছ? তাই কখনো যেতে দেওয়া যায়?'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যো তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় পরপর পাঁচশোখানা গরুর গাড়ি বিপুল ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে নগরগড় থেকে সদরে রওনা হল। বিলামসনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, মাইল দুই এগিয়ে যাবার পর গাড়িগুলি থামিয়ে প্রত্যেক গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। গাড়িপিছু গুড়পড়তা পেট্রোল

খরচ হল তিন গ্যালন। আরও কম পেট্রোলে কাজ হত কিন্তু এসব ব্যাপারে কার্পণ্য করা বিলামসনের স্বভাব নয়।

গোয়ালারা ক'দিন থেকে তাদের পুরোনো ভিটেয় ছোট চালা তুলতে আরম্ভ করেছিল। বিলামসন ভেবেছিল ঘরগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আজ আগুনের নেশা চেপে যাওয়ায় গাড়ির পর সমাপ্ত ও অর্ধ সমাপ্ত চালাগুলিতেও সে আগুন ধরিয়ে দেবার হুকুম দিল।

এই বিরাট অগ্নিকান্ডে মানুষ মরল মোটে একজন। ধুর্জটি সামনের গরুর গাড়িটিতে ছিল। গাড়োয়ানেরা পালাবার অবসর পেল কিন্তু ধুর্জটিকে বেঁধে রাখায় গাড়ির সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই গাড়িটাতে পাঁচ ছ গ্যালন পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। গাড়োয়ান ও দর্শকদের কারো শরীরে একটু ছ্যাঁকা লাগল এবং গোয়ালাদের কয়েকজনের মাথা একটু ফেটে গেল। আর কিছুই হল না।

অপরাহ্নে নগরগড়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মহীধরের কাছে দরবার করতে গেলেন। বললেন, 'এবার আপনি বিলামসনকে বিদায় দিন।'

মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'কি করে বিদায় দেব ?'

'চলে যেতে বলুন।'

'যেতে বললে কি যাবে ?'

কথাটা তার নিজের কানেই একটু অদ্ভুত শোনাল বৈকি। তার জমিদারী, তার বাড়ি তার লোকজন, তার পয়সা—যেতে বললে বিলামসন যাবে না একথার যেন সত্যসত্যই কোনো মানে হয় না।

ভদ্রলোকেরা বললেন, 'আজকেই যেতে বলুন। ওর সঙ্গে আপনিও কেন মারা পড়বেন ?'

মহীধর সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, দেখি বলে কি হয়। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না, একটু সময় দিন আমাকে।'

বিলামসনেরা বৈকালিক চা পান করছিল, মহীধর সেখানে গিয়ে চা খেতে অস্বীকার করে গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'এবার সত্যি তোমার মাস ছয়েকের বিশ্রাম নেওয়া দরকার বিলামসন। তুমি কালকেই যাও। আমি এখুনি ঢাঁটারা দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি কাল থেকে ছয় মাসের ছুটিতে বেড়াতে যাবে।'

বিলামসন শুধু বলল, 'ক্ষেপেছ ? এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে কি আমি যেতে পারি। আমি গেলে কি অবস্থা দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ? সবাই মারা পড়বে।'

মহীধর ভীরু নয় কেবল মনের গড়নটা তার খাপছাড়া। জীবনে কোনদিন যে কথা উচ্চারণ করতে পারবে ভাবে নি, আজ অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেই কথাগুলিই বলে ফেলল, 'তা হোক, তোমায় আমি আর থাকতে দিতে পারি না বিলামসন। তোমার আমার দুজনের ভালোর জন্যই তোমাকে আমায় যেতে বলতে হচ্ছে। তুমি কাল সকালে রওনা হবে। আমি এখুনি খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, শুনলে সকলে

শান্ত হবে।'

বিলামসন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে রায়। আমি চলে যাব শোনা মাত্র ওদের সাহস বেড়ে যাবে, উত্তেজিত হয়ে তোমার ঘরবাড়ি কাছারি আক্রমণ করবে, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। আমি আছি বলেই ওরা কিছু করতে পারছে না, তা জানো ?'

মহীধর আমতা আমতা করে বলল, 'তা হোক। এ অবস্থায় ওসব ভয় করলে চলে না।'

অরেল্যো ক্রমাগত ইসারা করছিল, মহীধর জোর করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইল।

বিলামসন নিজে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল নিয়ে এল, গ্লাসে ঢেলে মহীধরের সামনে ধরে দিয়ে বলল, 'খেয়ে দ্যাখো খাসা জিনিস। তারপর এস আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করি। কর্তব্যের চেয়ে বড় কিছু নেই রায়। আদর্শের জন্য দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়। ঈশ্বর যে নির্দেশ আমায় দিয়েছেন আমাকে তা মানতেই হবে।'

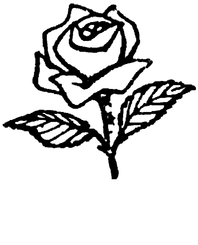

তোমরা সবাই ভালো

আঠার মিনিট লেট। সাধারাত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কলকাতা পেঁছিতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়িটা কি অমার্জনীয় অপরাধই তার কাছে করেছে।

দিবাকরবাবুর বোন সুবালা জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িতে ভিড় ছিল না?'

'ভীষণ ভিড়। কোনোমতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।'

সুবালা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়িতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাজা চেহারা থাকতে পারে!

'সারা রাত ঘুমোওনি বুঝি?'

'ঘুমিয়েছি। আমার এই বাক্সে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একেবারে নৈহাটি পেঁছি গেছি।'

স্টীলের ফোঁড়ায় কন্টকিত তার ট্রাংকটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবালা নয় উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়! কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সঙ্গে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

'আমি তো তোষক বালিশে শুই না। চৌকিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসিমা।'

পিসীমা? কাকে সে পিসীমা বলছে?

'আমি তোমার পিসীমা নই।' সুবালা প্রতিবাদ জানাল।

'পিসীমাই হন আপনি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে।

'আমি তোমার এই পিসেমশায়ের বোন—ছোট বোন।' সুবালা দিবাকরবাবুকে দেখিয়ে দিল। 'তোমার পিসীমা রান্নাঘরে আছেন।'

মনে মনে সুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হনুমান ছেলে! দিবাকরবাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসীমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বসল পিসীমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয় নি! চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসীমার বড় ছেলেটার একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তার পিসীমার এখন ঠাকুরমা পদবী!

রমেন বলল, 'এই পিসীমার সম্পর্কে আপনাকে পিসীমা বলি নি। নন্দ পিসেমশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসীমা হন।'

শুনে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ' বনে গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে সুবালার দু'দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক

পিসেমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক অনেক দূরে সম্পর্কের পিসেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে সুবালার স্বামী নন্দগোপাল তার খাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেটা ভুল করে নি, সুবালাকে জন্মে কখনো চোখে না দেখে থাকলেও সে যে কে মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ডবল সম্পর্কের মধ্যে কোন্‌টি বেশী লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন তেমন ছেলে নয়।

ইতিমধ্যে দিবাকরবাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মানুষটা তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমার ভেতর দিয়ে রমেনকে নিরীক্ষণ করে তিনি যথাবিহিত স্নেহার্দ্র বিস্ময়ের ভদ্রতা করে বললেন, 'ওমা, তুমি চারুদার ছেলে?'

রমেন বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসীমা? আমি শুনেছিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসীমা টক করে ঢোক গিলে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্য গুরুজনেরা প্রস্তুত হয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করায় সুবালা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'পিসীমা পিসেমশাইকে প্রণাম কর রমেন।'

'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, ছোট পিসীমা?'

'প্রণাম কর না।'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি।'

এমন ভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা তার বদ অভ্যাস ছিল, খুব মনের জোর দেখিয়ে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। সুবালা আর পিসীমা বাক্যহারা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসীমার সেজ মেয়ে রানী খিলখিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে হেসে ফেলেছিল। বাড়িতে বিশেষ করে তার সামনে, কারো শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। অন্য সময় হয়তো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্ত্বেও রানীকে ধমক দিতেন, এখন নবাগত ছেলেটার চমকপ্রদ পাকামিতে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ায় মেয়েকে শাসন করতে বোধহয় ভুলে গেলেন। যতবড় বেয়াদপ হোক, বাড়িতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট, তার ওপর গর্জন করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আত্মসম্বরণের অতি কষ্টকর চেষ্টায় কাতর হয়েই সম্ভবতঃ তিনি হঠাৎ ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লেন। চৌকিটা কচ্‌মচ্‌ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। দিবাকরবাবুর দেহটি প্রকাণ্ড, চুলে পাক ধরলেও গায়ে তার অসম্ভব জোর। এই কদিন আগেও তার বিরাট থাবার থাবড়া খেয়ে মেজছেলে সুকান্ত ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুঝল সেই জানে, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তাই বলে গুরুজনদের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসীমা। মানুষের পায়ে কত ধুলোবালি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বলে প্রণাম করি না। বাবাও তাই বলেন। গুরুজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করি না। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোনো মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর সামলাতে পারলেন না, সিংহের মতো গর্জন করে বললেন, 'মানে বুঝেছি। তুমি একটি এক নম্বরের জ্যাঠা ছেলে। যা, ওঘরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, এক পা দিবাকরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলেন পিসেমশাই!'

দিবাকরবাবু নির্বাক্ বিস্ময়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকি ছেড়ে উঠে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপন মনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুঝতে পারছে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

বেলা তখন প্রায় ১১টা বাজে। রমেনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়িতে কম নয়, নাওয়া খাওয়ার হাঙ্গামাও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়িতে থাকবার জন্য যে এসেছে তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের ট্রাঙ্কটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য ক'রে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল আর তার পাত্তা নেই। দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় সুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশী বড় নয়, দুটি চৌকি একটি টেবিল আর দু'খানা রঙ করা লোহার চেয়ার আছে। দুটি চৌকিতেই বিছানা গুটানো আছে। একটি সুকোমলের, একটি দিবাকরবাবুর ছোট ভাই সুধাকরবাবুর শালা রঞ্জিতের। টেবিলের একপাশে আই, এ, ক্লাসের বই, বাকী অংশ জুড়ে স্কুলের নিচু ক্লাসের ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মলাট ছেঁড়া বই খাতা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক দুটিতে ঘুড়ি লাটাই, মার্বেল, রবারের বল, টিনের কৌটো, কাগজের বাক্স থেকে শুরু করে পালিশ-চটা জুতো পর্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। সুকোমল আর রঞ্জিৎ এ ঘরে থাকে এবং বাড়ির গন্ডা দেড়েক ছেলে-মেয়ে দু'বেলা এ ঘরে বসে নকুল মাস্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

সুকোমল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করে রমেন সুবিধা করতে পারল না। কাটা কাটা জবাব দিয়ে সুকোমল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন ট্রাঙ্ক খুলে তার বই আর কাপড় বার

করছে, হঠাৎ সে চিবিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভালো ঘরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই? দেখে এসো না আছে কি না। দোতলায় আছে তিন তলায় আছে। সব বড়মামার নিজের লোকের দখলে—এক একজনের এক একটা ঘর। খাটে না শুলে বড় মামার ছেলেমেয়েদের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

সুকোমল কোঁস করে উঠল, 'আমরা কেন নিচের স্যাঁতস্যেঁতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকব?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নিচের তলায় থাকেন ভাই।'

'সাধে থাকেন? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে। ছোট মামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমানে সুকোমলের মুখখানা বাঁকা দেখায়, 'এই তো সবে এলে। দু'দিন থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়িতে থাকতে দিয়েছে যেন তাই ঢের!'

রমেন এক গাল হেসে বললে, 'ধেৎ, তাই কখনো হয়? খারাপ ব্যবহার যদি করবে, বাড়িতে থাকতে দেবার দরকার কি। মনে কষ্ট দেবার জন্য কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়িতে রাখে নাকি?'

সুকোমল হতভম্বের মতো বলল, 'রাখে না?'

রমেন বলল, 'কেন রাখবে? একজনকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট হয়, মিছামিছি নিজে কষ্ট পাবে এমন বোকা কেউ নয় ভাই। আমরা জোর করে থাকতে আসতাম তা'হলে বরং কথা ছিল। তা তো আমরা আসিনি। আমার কথা ধরো। বাবা পিসেমশাইকে লিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না, পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। লিখলেন, কোনো অসুবিধে নেই। অনাদর করবার জন্যে আমাকে ডেকে আনার তাঁর কি দরকার ছিল? বাবাকে তাহলে লিখে দিতেন সুবিধে হবে না।'

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বইগুলি গুছিয়ে ফেলেছে। বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে, নামিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে জায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে ভাই? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে। সেই যেন বাড়ির কর্তা। সুকোমল চটে গিয়ে একটা ব্যঙ্গোক্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল রমেন বাহাদুরি করে নি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় নিজের বিশ্বাসটা শুধু প্রকাশ করেছে।

'আমার দরকার নেই'—সুকোমল জবাব দিল।

এগারটা পর্যন্ত নিচের তলায় কোনো রকম গোলমাল ছিল না, তারপর এমন হৈ-

চি হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যেন হাট বসেছে।

সুকোমল বলল, 'বড় মামা ওপরে গেলেন!'

এ বাড়িতে দিবাকরবাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখসুবিধা আর জ্বালাতন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কানের আড়ালে কি ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁর সামনে সবাই ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করবে, জোরে কথা বলবে না, হাসবে না, ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত চেঁচামেচি দুরন্তপনা বন্ধ রাখবে—এইটুকু হলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই তিনি এক-তলায় নামলে দোতালা হাঁফ ছেড়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, দোতলায় শুরু হয় চেঁচা-মেচি ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি। বড়রা অবশ্য মারামারিটা করে না, সেটা ছেলেমেয়ে-দের একচেটিয়া হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে যখন তখন যার যাকে খুশি হরদম মারে। মনের মধ্যে সকলে যেন কি জ্বালা পুষে রেখেছে, ছোটদের ওপর কারণে অকারণে ঝাল না ঝেড়ে থাকতে পারে না।

নিজের বইখাতা গুছিয়ে রমেন একা ঘরে বসে আছে। সুকোমল বলেছিল, সারা-দিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ডাকতে আসবে না। রমেন তা স্বীকার করে নি এবং তার ভুল ধারণা ভেঙে দেবার জন্য তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক্ষা করছে। তেল মেখে গামছা হাতে সে একেবারে তৈরি হয়ে আছে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই যে আদর আহ্বান আসবে তাতে যেন তার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সত্য সত্যই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে নয়, পরিচয় করতে। রমেনের বেয়াদবির গন্ধ ইতি-মধ্যেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপন্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মনোরমা এতক্ষণ তাই শুনছিলেন। দিবাকরবাবুর স্ত্রী অনুপমা আর সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা এই দু'টি জা'য়ের মনের গতি সর্বদাই পূব আর পশ্চিমের মতো পরস্পর-বিরোধী। একজন লালপেড়ে শাড়ি পরলে অন্যজন পরেন কালোপাড় শাড়ি, একজন রুইমাছ খেলে পরে অন্যজন খান কৈ মাছ, একজন কারো নিন্দে করলে অন্যজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজনের কোনো ছেলে বা মেয়ে পর্যন্ত যদি অন্য-জনের একটু বেশী আদর পায় নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে ধরে তার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরমার কাছে সংবাদ ঠিক-মতোই পৌঁছেছিল কিন্তু অনুপমা তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন বলে তিনি তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাওয়ায়ও উচিত মনে করেন নি। তারপর অনু-পমা যখন তীব্রভাবে রমেনের নিন্দে শুরু করলেন এবং স্পষ্টভাষাতেই ঘোষণা করে দিলেন যে বাড়ির ছেলেদের মাথা খাবার জন্য এ শনিগ্রহকে তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারবেন না, দু'চারদিন দেখে দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন, তখন মনোরমার মনে হল এই তেজী সুবিবেচক, আদর্শ চরিত্র ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য

তাঁর ভাব করা দরকার। ঘরে ঢুকেই তাই হাসিমুখে অত্যন্ত মিষ্টি সুরে বললেন, 'একলাটি বসে আছো বাবা ? বাড়ি ছেড়ে এসে মন কেমন করছে ?'

রমেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাড়ি ছেলের মুখে এমন জবাব কি শোভা পায় ? বাড়ির জন্য মন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে তিনি তাকে কি বলবেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক করেছিলেন, চার পাঁচ বছরের ছেলের মতো সে সহজ সরল জবাব দিয়ে বসায় তাকে এবার কি বলবেন খানিক-ক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা হাবা নয়তো ছেলেটা ? মাথার কোনো দোষ নেই তো ?

সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের অনভ্যস্ত ধাক্কা সামলে মনোরমা তারপর বললেন,'প্রথম দু'চার দিন ওরকম লাগবে বাবা। তা আমরাও তোমার পর নই। আমি হলাম গিয়ে তোমার'—মনোরমা থমকে গেলেন। তিনি রমেনের কে হন ? দূর সম্পর্কের পিসীমার জা' এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়।

'আপনি আমার ভালো পিসীমা।'

পিসীমা ? তাই বটে, রমেনের পিসীকে তিনি যখন দিদি বলেন, তিনিও রমেনের পিসীমা হন বটে। কিন্তু ভালো পিসীমা কেন ? ছোট, বড়, মেজ, সেজ, রাঙা কালো মাসী পিসী দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালো-পিসীমা তো শোনেন নি কখনো। তিনি কি ভালো ? রমেন কি দেখেই চিনেছে তিনি মানুষটা মন্দ নন, মন তার ভালো ? মনোরমা একটি বিস্ময়কর আনন্দ অনুভব করেন। অনেক দিন ধরে মনের ওপর যেন একটা ভার চাপানো ছিল, ভারটা হাল্কা হয়ে গেছে। কত-কাল ধরে শুনে আসছেন তিনি হিংসুটে, স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আরও অনেক কিছু। শুনতে শুনতে ধারণা জন্মে গেছে যে তিনি সত্যই তাই। হিংসা, স্বার্থ-পরতা আর ঝগড়াঝাঁটি নিয়েই দিনও তার কাটছে বৈকি। রমেনের কথা শুনে হঠাৎ মনে হল, ওসব কিছু নয়, অনেক কাল আগে অল্প বয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন—সাদাসিধে ভালোমানুষ। তিনি ভালো।

কাছে বসিয়ে আদর করে মনোরমা রমেনকে খাওয়ালেন। অনুপমার পিত্তি জ্বালিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'খাসা ছেলে দিদি। ছেলে-মেয়েদের একটিবার ধমক দিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো দাসী প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইলেন হাসিমুখে। মনে হতে লাগল, খোলস ছেড়ে মনোরমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। খাওয়ার পর তিনি রমেনকে বললেন, 'এইটুকু ঘরে কি তিনজনের জায়গা হয় ? তুমি ওপরে থাকবে রমেন ?'

তখন রমেন বলল, 'ভালো-পিসীমা, আমি এ ঘরে থাকি, সুকোমলকে ওপরে নিয়ে যান।'

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও তুমি ? বেশ বাবা, তাই হবে।

সুকোমল ধীরেনের ঘরে যাক্, 'তুমি এখানেই থাকো।'

এ ব্যবস্থায় খুশী হওয়ার বদলে সুকোমল কিন্তু ভয়ানক চটে গেল। তার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগল কি না। এতদিন বাড়ির লোকের উপেক্ষায় তার অভিমানের সীমা ছিল না, আজ তাদের পক্ষপাতিত্বে সে হিংসায় পুড়তে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না, রমেনের মুখের কথায় তার দোতলায় ভালো ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাড়িতে পা দিয়েই ছেলেটার এতখানি প্রতিপত্তি জন্মে গেছে?

কৃতজ্ঞতা বোধ করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, উপকার করার বদলে রমেন তাকে ভীষণ অপমান করেছে। মনটা তার আরও বেশী খিঁচড়ে গেল, ওপরের ঘরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা জানাতেও কেউ যখন তার কথা কানে তুলল না, ধমক দিয়ে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল দোতলায়।

কেবল সুকোমল নয়, অনুপমারও এমন রাগ হ'ল বলবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে তার বাড়িতে এসে মনোরমার দলে ভিড়ে তাকে যে অপমানটা সে করল তার জ্বালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে জ্বর আসার মতো শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, দু'দিন দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তাড়িয়ে দিতেন? এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, তেরাত্রি পোয়ানোর আগে ছোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কান্ড করে ছাড়বেন একটা। তাকে ডিঙিয়ে তার ভাইপোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দখল করে তাও দেখে নেবেন।

দুপুরবেলা একবার মনোরমার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে অনুপমার চশমা-পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হ'ল।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাড়ি থেকে তাড়ান হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে ওকে দিয়ে অপমান করতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনবে না, অবজ্ঞা দেখাবে, অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন, তবেই অনুপমার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অমূলক নয়। ছেলেটাকে আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভব। তাকে স্নেহ করার, খাতির করার, খুশি করার আঘাত দেওয়ার কোনো প্রচলিত পদ্ধতি কারো জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশী খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেকজনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশী বেশী আদর যত্ন স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বশ করা যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা করে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে তাকে কাবু করাও তেমনি

অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অনুপমা আর মনোরমার দু'জনেরই ধাঁধা লেগে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জন করতে পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মতো সে যে একেবারে নির্বিকার হয়ে থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মতো খুশী হয়ে উঠে, কিন্তু গলে পড়ে না। ভালবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল পরেও তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পা'ও চাটে না।

প্রথমদিন অনুপমা ভেবেছিলেন, মনোরমা আগেই ভাব আরম্ভ করেছে তার সংগে তিনি বোধহয় পাল্লা দিতে পারবেন না। বিকেলে মিষ্টি আনিয়ে লুচি ভেজে রমেনকে খেতে দিলেন। অন্য সকলেই অবশ্য লুচি আর মিষ্টি খেল, কিন্তু তার মিষ্টি কথাগুলি পেল শুধু রমেন। পুলকিত হয়ে অনুপমা লক্ষ করলেন, এ বাড়িতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, তার স্নেহ আর যত্নই সে যেন চায়, এমনি ভাব রমেনের। নতুন পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। কি আগ্রহের সংগেই রমেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই প্রাইজগুলি আছে পিসীমা ? দেখাবেন আমায় ?

কবে সেই অল্প বয়সে সেলাইয়ের কাজ আর গানের জন্য অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, বাপের কাছে শুনে সেগুলি দেখবার জন্য রমেন উৎসুক হয়ে আছে। মনটা অনুপমার কেমন করে উঠল। কই, দশবিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনোদিন জানবার আগ্রহ দেখায় নি তার এককালে বিশেষ কি গুণ ছিল, কিসের জন্য বাড়িতে আর পাড়াতে এককালে তিনি সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন। আজ আড়ালে লোকে তাকে শুঁটকি মাছ বলে, তার মাথায় নাকি ছিট আছে, সাদা চোখে তাকালে ছেলেপিলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে বলে তিনি নাকি চশমা পরে থাকেন। সত্যই কি তিনি এই রকম মানুষ ? বড় ট্রাঙ্কের তলা থেকে খুঁজে পেতে পুরানো দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের চোখভরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে আজও তিনি সেই আগের অনুপমার মতোই আছেন, যার হাসিখুশী ভাব আর মিষ্টি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত, পাড়ার মেয়ে বৌ ভিড় করে যার কাছে আসত সেলাই শিখতে আর গান শুনতে।

অনুপমা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেকদিন শুকনো হয়ে ছিল আজ হঠাৎ একটা মধুর রসালো আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠেছে। ঠিক এই রকম মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে তার খুব অভিমান হয়ে গেল। খানিক পরেই রানীকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উদাসভাবে বললেন, 'আমার নিন্দে শুনতে বেশ ভালো লাগছিল, না বাবা ? আমি তো মন্দ আছিই—'

'না, পিসীমা।'

অনুপমা কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি কি জানবে, সবাই আমায় মন্দ বলে। যার

জন্যে যত করি তার কাছে আমি তত মন্দ।'

রমেন হেসে ফেলল। অনুপমা যেন হাসির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল।

—'কেউ মন্দ বলে না পিসীমা। আপনি কেন মন্দ হতে যাবেন? ভালো পিসীমা নিন্দে করেন নি, দুঃখ করছিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন ভালো পিসীমাকে, এখন আর বাসেন না। শুনে আমি কি বললাম জানেন?'

'কি বললে?'

বললাম, 'তা নয় ভালো পিসীমা, পিসীমার শরীর ভালো নেই। তাই আগের মতো আদর যত্ন করতে পারেন না। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার। আজ কতকাল ধরে কত অসুখে ভুগছেন পিসীমা কে তার খবর রাখে! কে তাকিয়ে দ্যাখে তাঁর দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্য উদয়াস্ত তিনি খেটে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তা'হলেই সবাই খুশী। কিন্তু এ ছেলেটার দয়ামায়া আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভালো নয়!

'ছোট বৌ কি বললে?'

'বললেন স্বর্ণসিন্দুর খেলে আপনার উপকার হবে। ওঁর এক মামা কবিরাজী করেন, তার কাছে খাঁটি ওষুধ পাওয়া যায়, আনিয়ে দেবেন বললেন!'

অনেককাল পরে সেদিন রাত্রে হেঁসেলে খেতে বসে অনুপমা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের গল্প হলো।

তারপর কাটল অনেকগুলি দিনরাত্রি। বাড়ির অসংখ্য সংঘর্ষ ছোট আর বড়, সামান্য ও সাংঘাতিক, যেন আপনা থেকে উপে যেতে লাগল অতীতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল বাড়িতে।

সবাই ভাবতে লাগল, আমি ভালো। আমি কেন খারাপ হতে যাব?

জন্মের ইতিহাস

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দু'জনের জল্পনা কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ হেন আশ্চর্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোনো নরনারীর জীবনে আজ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মতো লক্ষহীন দায়িত্ব-হীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষের সন্ধান পাওয়া মাত্র সে প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্ত্যে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিবাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ দীপ জ্বলিতে থাকে। খানিক আবোলতাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের থাকে সুলতা, কিন্তু তোমার মতো বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটা তো দেখতে হবে?'

বিকাশের উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে, 'না সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয়া নও, প্রিয়ারও বেশী। ঠিক যে তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে, 'দ্যাখো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরে লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে শুরু করব।'

বিকাশ বলে, 'হুঁ বল না। গলা বুজে আসবে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসতে পারে না তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেয়। তুমি কি ওকথা বলতে পার?'

সুলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়িতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক একদিন কাঁদে? ভালবাসুক আর না বাসুক স্ত্রীকে যার অমন ভাবে কাঁদতে হয় সে দুর্ভাগা বৈকি!…

ভালবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাঁটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালবাসা দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়। 'তোমার জন্যে যে ভালবাসা সে তোমারি থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভাল-বাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন—'

'দেখো। খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না—'

এমনি সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারি ভিতর দিয়া—দু'জনের যে অনির্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে প্রেরণার মুহূর্তেও কি কোনো কবি কোনোদিন তার মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে ?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হ'ল ?'

'একটু দেরি আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা শুরু করলে—'

—'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলত ?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকীও হতে পারে একথা কিন্তু মার মনে পড়ে না ?'

'তোমার পড়ে ?—'

—'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখব সুলতা।'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন।'

'ও, হ্যাঁ। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলত ?'

'ওর মাকে একটু ভালবাসা দিও।'

এমনি ভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্যপরিহাসে দাঁড়াইবে কখন গভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুই স্থিরতা থাকে না। দুজনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও এক স্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্তনের পরে কমিক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালকবালিকার মতো তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙাইয়া খোকা কার মতো দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেত ভাবে দুজনের পছন্দের মর্যাদা থাকিবে এ আলোচনা করা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে হয় না কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিবার প্রতীক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির করে মনে তেমনি একটা একটানা ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা ?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয় পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্কেরা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা, মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালয় ভালয় একটি খোকা

দিও, মা, খোকা দিও। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।

কোথা হইতে গোটা তিনেক মাদুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন কিন্তু শুধু কি মাদুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোঁজেন।

কি জানি কি হইবে? এবার ভালয় ভালয় হইয়া গেলে পরের বারে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারেই যা ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে বার বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনোদিন রোদ ওঠে কোনোদিন মেঘের ছায়া পড়ে কোনোদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যানের বাতাসে কাগজপত্র মৃদুশব্দ করিয়া নাড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের শাড়ি পরিয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন সব অভূতপূর্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয় নিজেরও অনেক আশ্চর্য গোপন পরিচয় ধরা পড়িতেছে।

এ অমৃত যে একদিন ভালবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যুগধর্মের প্রতি বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

সুলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসার কথা একান্তে ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এত বেশী করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবিকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই সুলতার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

দুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলসভাবে ঠেস দিয়া সুলতা চোখ বোজে। এই ঘরে তিন বছর ধরিয়া বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ ঘর যেন ঠাসা বাতাসে যেন পুরানো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী-স্পর্শ জুটিয়াছিল।

সেদিনের বুক-দুরুদুরু পুলক আবার আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু-ছাঁকা সূর্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়। আত্মীয়-বিচ্ছেদ বেদনায় পরমাত্মীয়দের সোহাগ মনে সেদিন তেমনি রঙ মিশাইয়াছিল; ভ্রূণস্পন্দনে

যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা।

তারপর একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া সুলতা খানিকক্ষণ মাখা ভাত নিয়া নাড়া-চাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃন্ময়ী বলিল, 'ওকি বৌ ? খাও ? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশ-শূন্য কণ্ঠ। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আবার হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মতো তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আর বেদনার ব্যাপার নয়—মনের বিকার, হৃদয়ের রুক্ষতা।

সুলতা বলিল, 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে।'

'বলো কি বৌ' বলিয়া মৃন্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ দু'টি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়।

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃন্ময়ী হাঁকিল, 'ওমা! মা! শুনছ ? বৌএর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কি বৌমা, কি ? কি রকম বোধ করছ ?'

কি রকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়িকে বলিবে কি। দেহের প্রত্যেকটি অণু যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারি যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধহয়, অজস্র এলোমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে।

সে করুণস্বরে বলিল, 'কেমন লাগছে মা, অস্থির অস্থির করছে।'

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাক বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা ট্যথা টের পাওয়া মাত্র আমায় কিন্তু জানিয়ো বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিকুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত হইয়া থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ী কই উল্লেখ করিলেন না ? শুধু দাই-এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি ?

বিকাশ বলিয়াছে দরকার হোক বা না হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায় ? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে ? যদি মরিয়া যায় ?

মৃন্ময়ী তীব্র দৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙিয়া হাসিয়া বলিল, 'বৌ-এর মুখ দেখেছ মা ? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে, মেয়ে মানুষের এতে ভয় কিসের শুনি ?'

মা বলিলেন, 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃন্ময়ী উদ্ধত ভাবে বলিল, 'কেন চুপ করব ? হক কথা বলব তার আবার চুপ করা করি কি !'

সুলতা ছলছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকগে। ভাত তো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে ?'

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃন্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ী আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে !'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে ? সকাল বেলাই শরীর ভালো ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন ?

ছোটননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপিচুপি বলিল, বৌদি সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বল !'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতূহল। বিবাহের কথায় যে এখনো ভালো করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই, সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলো-বাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে।

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্বেকার যে আদিম অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনোদিনই যে অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে অন্ধকার আবার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর—আঁতুড়ে। সে শুধু জানিতে চায়, ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল ? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্বোধ্য ঝাপসা কৌতূহলের সমাপ্তি খোঁজে। গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গতবৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। এই উজ্জলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্য ভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে কি ছিল।

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। বলিল, 'বলবে না তো ? আচ্ছা, নাই বললে !'

সুলতা বলিল, 'বলছি বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল, 'এই শুধু ?'

'আর ভয় করছে ।'

ভয় ! মনে হইল এবার যেন সুধা তার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে । চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল, 'ভয় করছে বৌদি ? ভারি আশ্চর্য তো !' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি এক মুহূর্তে গম্ভীর বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল ।

বিকেলের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নতুন জন্মতারকা দেখা দিবে ।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল, 'সুধা ভাই মাকে বল ওঁর কাছে লোক যাক্ ।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুণি এসে পড়বে ।'

সুলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল । বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধহয় কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায় ? ছেলের চেয়ে স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়াছে । এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া ?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল, 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই ? কোনো বন্ধু যদি বায়স্কোপে নিয়ে যায় ? কি হবে তা'হলে ?'

মৃন্ময়ী সারা দুপুর বার বার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, এ কথাটা সে শুনিতে পাইল : উঁকি দিয়া বলিল, 'কি আর হবে তা হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে । সে পুরুষ মানুষ এসে তোমার কাছে কি করবে শুনি ? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করি নি !'

সে অতীত কথা । মনে হয়, এজন্মে বোধহয় ঘটে নাই । কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পরিচালনার বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র ।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না । অস্পষ্ট ভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য । হয়তো আজ রাত্রে অস্পষ্ট থাকিবে না—কে বলিতে পারে ? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে তাহার চিত্তেও হয়তো অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চল পদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না ।

মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল । সিঁড়ি ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাহার পা দু'টি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না ? পাড়ার কাহারো বাড়িতে হোক, ভবানীপুরে পিসিমার বাড়িতে হোক,এবাড়ির সমারোহের সংবাদ যেখানে পেঁাছাবে না ?

ছোটবাড়ি, অন্দরের গা ঘেঁষা বৈঠকখানা । ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃন্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল, 'বিকুদা বাড়ি আছে ?'

মৃন্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'যান্' যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়াছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতলায় গেল—কপালে সিঁদুর পরিতে। সিঁদুরের ফোঁটার অভাবে তাহার কপাল সুড় সুড় করিতেছিল। কপালই বটে। সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিন্দুরের টিপ পরিয়া মৃন্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনি সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভালো।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র পাঁচু টের পাইল বাড়ির আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় স্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জল-যোগের আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরণের দিনে স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনি। পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতিপূর্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে ঘরের মেঝে পুঁছিতেছেন, দিদি-মার মুখের ভাব অন্ধকার ঘরখানার মতোই সন্দেহজনক। বড় মাসীর মুখের রুক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোটমাসী বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি। কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না, পাঁচু মুহূর্তে মধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফা-রিত চোখে সে সুলতার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুকখানির মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পারিল না। চৌকাঠ ডিঙাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল, 'কি রে পাঁচু?'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন্ দিকে যাইবে, এ বাড়ির কোন্ ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মার জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাইএর খবর গিয়াছিল, একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি।

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আঁকাইয়াছে, গায়ের রঙ এত কালো যে আর একটু কালো হইলে গায়ের উল্কিগুলি দেখা যাইত কিনা সন্দেহ।

কোনোদিকে দৃকপাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল, 'এস্‌লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাকড়া বাধল।'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাকড়া বাধল বাছা ?'

'হোই ও পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে।—দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা! বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালোয় ভালোয় খালাস করে দাও, পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু'টাকা করে—

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, 'ওই তো বাছা তোমাদের দোষ। একেবারে শেষ সময় মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়িয়ে নিতে চাও। দেনা-পাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়ে আছে কবে থেকে ?'

দাই বলিল, 'কথা হয়ে থাকলেই গরীবের কি চলে মা : যেখানে দু'টাকা বেশী মিলবে আমাদের সেইখানেই নাগতে হবে।'

মার সাংসারিক অভিজ্ঞতা কম নয়, বলিলেন, 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। এমন বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শাশুড়ী তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য এমন করিতেছেন। যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে। প্রথমেই পাওনা নিয়ে গোল বাধিলে দাই কি আর মন দিয়া নিজের কর্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয় ?

সুলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল, দাইকে এক সময় চুপিচুপি জানাইয়া দিবে টাকার ব্যাপারে তাহার কোনো দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মতো সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়স্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ি ফিরিয়াছিল সে কথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজকার দিনটিতে দেরি করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ ? কি যে সব ব্যবস্থা তোমাদের।'

মা বলিলেন, 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হ'ল বাবা, তখন তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খুঁজে বেড়াত ?'
বিকাশ যেন এই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিল!
মা আবার বলিলেন, 'এই তো গেল আঁতুড়ে, এখনো কিছুই নয়।'
বিকাশ জামা কাপড় ছাড়িল না বিরস মুখে জল-চৌকিতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ অন্য কারণে। সুলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না এমন ক্ষতি এ জীবনে আর সম্ভব নয়। ওঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীর ভাবেই না জানি সুলতা প্রতীক্ষা করিয়াছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনোদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যও কি সুলতার হইবে ?
সুলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।
ও ঘর হইতে সুলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই পরিচয়ের কাছে তার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপোলে-যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই সে আপসোস এ জীবনে আর ঘুচিবে না।
সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বিকাশ বলিল, 'বৌদিকে বলগে আমি এসেছি।'
সুধা আঁতুড় ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বৌদি জানে।'
জানে! কেমন করিয়া জানিল ? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পৌঁছিল ? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে জানালাটা পর্যন্ত ভালো করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আর আধঘণ্টার মধ্যে ও ঘর যদি ইহারা ভালো ভাবে আলোকিত না করে সে নিজে ডে-লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।
'ওঘরে কে আছে রে সুধা ?'
'মা ওবাড়ির পিসীমা আর দাই।'
'মিনু ?'
'দিদির শরীর ভালো নয়, শুয়েছে।'
বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়। মৃন্ময়ীকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন সর্বদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ায় সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জল-চৌকিটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাই-য়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতোই অবুঝ। আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কিনা কে জানে। করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা অমন কষ্ট পাইতেছে সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রণা তাহার খাওয়া না খাওয়ার উপর নির্ভর করে না, খাওয়ার স্বপক্ষে এ ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে।

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। একটি বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তার পরে অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মতো চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজ-ছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কাঁচা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'থাক।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ বাড়িতে তাহার চেয়ে কে ভালো করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাঁটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টি যে কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়া-ছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সে রকম ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে! পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিসের ফর্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া বোসগিন্নির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও দিলেন। মৃন্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধহয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারির হাফইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুড়ের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসি-তেছে। দাইয়ের অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে সুলতার মৃদু কাতরানি ছাড়া ও

ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ এ কি সহজ সাধারণ ব্যাপার। পুরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোনোমতে ধৈর্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীরে সুস্থে তাহা ঘটিবে একথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও সুলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়িতে পা দেওয়া অবধি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক সুলতা বারোটা একটা তো বাজিবেই আজ। সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি।

আগামীকল্যের যে সূর্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে সূর্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘন্টার আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতলায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল, বাড়াইয়া দিয়া ঠাওর করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পাঁচু থরথর কাঁপিতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হ'ল রে পাঁচু?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, 'ভয় করছে মামা।'

'কেন ভয় করছে কেন? যা ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, 'একটা শাঁকচুন্নী ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদে কিসের উপলক্ষে আজ শাঁকচুন্নীর আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল কোথা হইতে? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক পাঁচুর ভয় ভাঙানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিস পাঁচু। চল্ দেখবি, ছাদে কিচ্ছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল, 'না মামা!' কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না পাঁচুকে শক্ত করিয়া

বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে ? ভূতের আমি কান মলে দেব।'

ছাদে গিয়ে দেখা গেল শাঁকচুন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী অসংবৃত বেশে ছাদের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু ?'

মৃন্ময়ী কলহের সুরে বলিল, 'কেন এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি ?'

বিকাশ বলিল, 'মিথ্যে চটিস কেন ? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়িতে আজ একটা শাঁকচুন্নীই বা এলো। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্।'

মিনু ঝাঁঝালো সুরে বলিল, 'এবার থেকে ময়লা কাপড় পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময়ীর মেজাজ সব সময় ভালো থাকে না, কিন্তু এ ভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল, 'হয়ই ত কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কই রে ?'

মৃন্ময়ী চমকাইয়া উঠিল, 'ভূত। ভূত কি ?'

'পাঁচু দেখেছে। বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃন্ময়ী হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল, 'তুই দেখেছিস্ পাঁচু ? মিথ্যেবাদী, হারামজাদা দেখেছিস তুই।'

চাঁদের আলোয় তাহার গালে জলের দাগ চিকচিক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগ করা চোখ, মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে সুর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধহয়।'

মৃন্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু বাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাঁচুকে নিচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল, 'কি ভাবছ শুনি।'

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকারে ছাতে ঘুরতে দেখেছে তবে আজ এমন জ্যোৎস্না। এও কি সুলতার দোষ রে ?'

মৃন্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল, 'তা ছাড়া কি ?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চল্ মিনু আমরা নিচে যাই।'

'নিচে গিয়ে কি করব ? তোমার বৌএর সেবা ?'

'করলে কি তোর পাপ হবে ? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃন্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'তা জানি। চল নিচে।'

রাত নটায় সুলতা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারোটার সময়। একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল, 'ওকি হ'ল? মরে গেল নাকি ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল, 'আপনি আর একবার দেখে আসুন ডাক্তারবাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভালো বোধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, সুলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান!'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো আপনি। আপনার জন্য দরকার মতো উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। সুলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়িটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুলতা হয়তো আর শব্দ করিবে না, এ স্তব্ধতা ভাঙিবে একেবারে শঙ্খধ্বনিতে—যদি ছেলে হয়। শাঁখ সম্ভবতঃ মৃন্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মতো আঁতুড়ের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাঁচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনোদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়ত ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিতে তলাইয়া যাইবে না।

হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবনমানুষ দুঃখ ভোগ করে, রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়?

খোকা আসিবে আসুক এ যে বর্গী আসারও বাড়া।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগের কেশব ভালো ছেলে খুঁজছে, নগদ গহনা জামা কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটে নি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভালো করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায় নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাষ্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরনের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে জোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভালো কুইনিন। নতুন ধরনের কুইনিন—খুবই এফেক্‌টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে।'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল

শৈলের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সে জন্য কেশবের মনে কোনো আপসোস নেই। সে বরং ভাবে যে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক কালাচাঁদ তাকে জোরজবরদোস্তি করে একটা বাড়ির বাড়িউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ি নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়িতে তখন দশ বারোটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়িটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়িতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ির কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধাহাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? এছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভালো খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়া উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরি করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখ ভুলান রূপ সৃষ্টি স্থূল রঙীন ফুলের কায়দা। প্রায় কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফসোস করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুক্ চুক্। আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়।'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছলছল পর্যন্ত করল না। দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশসুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলে-

মেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখে নি, নিজে ঘা খায় নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিবে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়িও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে., হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কানাঘুষা কেশবের কানেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়িতে রাখবে? শৈলিকে বাড়িতে রাখবে তোমার?'

'বাড়িতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুশি হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়িতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ি গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই? যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিউরে ওঠে সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন

লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারে নি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশ ও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্ত মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত। বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কানে শংখঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ায় স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে! বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি দানসামগ্রী চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলের বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলের মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুনগুনানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলের শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ন বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়. তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলের রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখ-বেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না! খিদের বালাইও যেন তার নেই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে শানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ি এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণ-

দশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমন ভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমোচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়িতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হ'ল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়িতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ায় খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ি রেখে সে একজন লোক সংগে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়িতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে ?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না ? বলুন তবে কী করব। মাল-পত্র গাড়িতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভালো। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায় ?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সংগের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বাঁদ্য ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়িতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ করে কালাচাঁদ টর্চটা জেবলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম কর-ছিল। বিচ্ছুরিত আলোর ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন শাড়ি, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলকে তুমি বিয়ে করে যাও।'

'বিয়ে ? আপনি পাগল নাকি ?'

শৈলের হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে ; মিনতি করে

বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, সে তোমার ধর্মো। আমার ধর্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দু'জন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক্, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে, মাঝ রাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ি পরে এল। প্রদীপে সামন্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ায় সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভালো লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল-পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ; নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফঃস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোনো পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভালো লাগছিল না। শৈল্যও থ' বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আর কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ির আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হাল্কা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চআসার সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল! মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোঁসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামার? আর কি মেয়ে নেই পৃথিবীতে?'

কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল। মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল।'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক কাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদরযত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী, তার চোখে দেখা দিল কুটিল চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ি নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দুজনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হ'ল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে। আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পর মনে হ'ল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

রাঘব মালাকার

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন···তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকার, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন···]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ির চৌমাথা থেকে নামামাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন। নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোনো পথিকের বিপদ ঘটে নি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচে নি। সাপটাপ হয়তো কামড়েছে দু'একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয়তো তেড়ে গেছে ঘেউঘেউ করে, গরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোনো প্রমাণ নেই। এ পথের আশেপাশের বস্তি গাঁ-গুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল

হয়ে যাবে আশেপাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ির পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে বাঘবের ভারকাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবি করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ি বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ি—মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অর্থাৎ, লম্বায় চওড়ায় দুজনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয় নি। রাঘব মালাকারের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে কাচা আধপুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরানো ছিটের শার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গত-বারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। দু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি ? আজ তোর হয়েছে কি র‍্যা।'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ ?' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্সে। কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু। এত কাপড় জন্মে দেখি নি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড় ? কাপড় কিরে ব্যাটা ? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি ? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে ?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়। তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি। ব্যাটার বুদ্ধি কত।'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই তো বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক।

মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু, পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ি নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে ? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।'
'কে বলেছে তোকে ? কার কাছে শুনলি ?' সভয় গর্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।
'কে বলবে বাবু ? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা ?'
গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে ? মোরা কারা রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু ক'জন, না আরও অনেকে ?
'তোকে চার টাকা মজুরি দি রঘু।'
'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'
'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে ? তোকে বিশ্বাস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু ?'
দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে অগুন্তি—দু'মাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রী-পুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে 'নেমক-হারাম ঠাকুরবাবু ? বলছ নেমকহারামি ? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায় ? থানায় মোরা বলতে যাই নি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি ?'
'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুশি হয়ে, 'চটিস কেন ? আট আনা বেশী পাবি আজ, যা।'
রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহায্যে। ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহু-কাল ধরে : কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি।
পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ি আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খান ত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে খ্যান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু !'
সাত আট রশি দূরে খান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক

আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন, মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পশ্চিম গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নিচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামে নি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে! গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছমছম করে গৌতমের। এই জলা-জঙ্গল, কুঁড়ে, পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরানো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগে রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট ; পেঁাছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়ে-দেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকাব।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেব'খন তোকে একখানা—'গৌতম ঢোক গেলে, এক-জোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে ; দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দনবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে…'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয় নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য গাল দেওয়া দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে

কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা, গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই, জুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তু গাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না। বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুলো, তা তো শুনলে না।

'নে না কাপড়গুলো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হ'ল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা ?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, মরবি তুই রাঘব ! পুলিশ আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

দু'টি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দেঁড়িয়ে রইছ কেনে ? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে ক'দিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে। কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে— গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে ? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক

নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না ?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গোতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না. রাঘব একবার দা'টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি ? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি ? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবু-ঠাকুর।'

গোতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর ?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে গোতম বলে, 'শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না ?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চোরাবাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল ? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে দ্যাখ। পুলিশ কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার।

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করি মি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন। বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর ? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোনো ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গোতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনোমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গোতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরি করে আট-ঘাট বেঁধে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। নাথগঞ্জের গগনসা'র প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে। তিন দিন আগের তারিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পত্তুগাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পত্তুগাঁয়ে গিয়ে পুলিশ দ্যাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

প্যানিক

আপিসের বাড়িটি পশ্চিমমুখী। বাহিরে আসিয়াই ধনেশের চোখে পড়িল, আকাশটা আশ্চর্যরকম লাল। আকাশের খানিকটা পড়িয়াছে রাস্তার অপর দিকের বাড়ির আড়ালে। অন্তরালে ওই দিগন্তে নিশ্চয় স্তরে স্তরে সাজানো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মেঘ আছে। মেঘের প্রতিফলন ছাড়া আলোর ছটা এত রক্তিম হয় না।

হকারের চিৎকারে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এত জোরে চিৎকার করে কেন? খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মতো এমনিই টনটন করিতেছে, ফিসফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝনঝন করিয়া উঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোনো প্রয়োজন নাই। দু'টি পয়সা বাহির করিয়া ধনেশ একটা কাগজ কিনিল। অনেকেই কিনিতেছে। রবিবার তার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসিয়া একবার চোখ বুলানো ছাড়া খবরের কাগজের সঙ্গে জগদীশ কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখিত না, সেও আজকাল সকালে বিকালে কাগজ কেনে। একটু বেলা করিয়া তার বাড়িতে গেলেই বিনা পয়সায় কাগজ পড়িতে পাইবে জানে, কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না।

স্পষ্টই বলে, 'না ভাই, অত পয়সার মায়া করলে আর চলে না। যে সময় পড়েছে, এক ঘণ্টা আগে জানা পরে জানার ওপরেই হয়তো বাঁচন মরণ।'

এমন করিয়া বলে যে সর্বাঙ্গ যেন শিরশির করিরা উঠে। মনে হয়, অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘণ্টা সময়ের ওপরেই যেন অনির্দিষ্ট ও অনন্যসাধারণ মরণ ভয়াবহ মূর্তিতে ওৎ পাতিয়া আছে, একটা অদ্ভুত অকথ্য সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া!

জগদীশ তবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে মামাবাড়ি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়িতে সে থাকে একা, নিজে রান্না করিয়া খায়। যেমন হোক একজন ভাড়াটে পাইলে বাড়িটা ভাড়া দিয়া কোনো সস্তা মেস বা বোর্ডিং-এ চলিয়া যাইবে। তার ভয় ভাবনা শুধু নিজের জন্য। স্ত্রীপুত্র পরিবারকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ধনেশের নাই। একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনিও আবার এমন জায়গায় থাকেন সেখানে নাকি ভয় আরও বেশি। এমন সঙ্গতিও তার নাই যে মফস্বলে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দেয়।

কৃপণ ও বিচক্ষণ জগদীশকে দেখিলে সাধে কি হিংসায় তার বুকটা জ্বলিতে থাকে। মনে হয়, এই লোকটাই বুঝি তার মন্দ অদৃষ্টের জন্য দায়ী।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় জগদীশের গোলগাল মুখে ছোট ছোট চোখ দুটি পিট পিট করিতেছিল, ধনেশকে দেখিতে পায় নাই। ধনেশ নাগাল ধরিয়া বলিল, 'নতুন খবর কিছু নেই।'

জগদীশ বলিল, 'তা নেই, কিন্তু—'

জগদীশের মুখখানি চিন্তিত, বিমর্ষ। মাসখানেক আগে বৌ আর ছেলেমেয়েরা যখন কাছে ছিল, তখনও তার চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সক্রিয় উত্তেজনার ভাবও তার মধ্যে দেখা যাইত। এক মাসের মধ্যে মানুষটা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত পথিক যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে, কথা বলিতে শুরু করিয়াও থামিয়া যায়।

'একটা ব্যাপার ভালো ঠেকছে না।'—ঘাড়ে বসানো মাথাটা জগদীশ ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকে, 'এ আর পি'র একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেন বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপে নি। আজকালের মধ্যে একটা কিছু হবে বোধহয়, নইলে হঠাৎ—'

ধনেশের মুখ পাংশু হইয়া গেল।—'এমনি হয়তো বন্ধ করেছে।'

'তাই কখনো করে? একটা বিজ্ঞাপন চলছিল, কি দরকার ওদের সেটা বন্ধ করবার? এতো আর তোমার খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়, একটা মানে নিশ্চয় আছে। আমি ভাবছিলাম কি—'

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরও কয়েকজন কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ঢোক গিলিতে গিয়া জগদীশ প্রথমবারের চেষ্টায় ঢোকটা গিলিতে পারিল না।

'—আমি ভাবছিলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু হয়ে যাবে, এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপনটা বন্ধ করেছে। ভেবেছে, রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজর পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হতো তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে। এইসব ভেবে—'

অপরিচিত যারা কথা শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজন সায় দিয়া বলিল, 'সেটা সম্ভব। আবার এও হতে পারে যে, খবরটা ওরা চেপে দিতে চায়। বিজ্ঞাপনটা নেই দেখে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববে এখন দু'চারদিন কোনো ভয় নেই।'

আরেকজন বলিল, 'যা বলেছেন মশায়!'

ট্রামে উঠিয়া বসিয়া জগদীশ বলিল, 'এমন ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই কি বলব। দোটানায় পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে পাঠালাম এক জায়গায় উনি গেলেন আরেক জায়গায়, বিপদের সময় কার কাছে ছুটব আমি? এখানে গেলে

ওখানকার ভাবনা, ওখানে গেলে এখানকার ভাবনা।—দাও, একটা বিড়ি দাও।'

'বিড়ি নেই।'

বিড়ি ছিল। জগদীশকে দিবে না। ট্রামে এতলোকের সামনেই লোকটাকে তার মারিবার ইচ্ছে হইয়াছিল। সব সময় কেবল নিজের কথা ভাবে, নিজের কথা বলে। ভয়ভাবনা যেন তার একার, একচেটিয়া। ধনেশ যেন নিশ্চিন্ত মনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে, তার ভাবনা করিবার কিছু নাই, বলিবারও কিছু নাই। এতকালের বন্ধু সে লোকটার, নিজে রাঁধিয়া ভালো খাইতে পায় না ভাবিয়া এক মাসের মধ্যে কতবার ওকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রতিদানে তাকে একদিন একটু মুখের সহানুভূতি জানানোর অবসরও হয় না। যখন তখন শুধু শুনাইতে পারে, এবারে পাঠিয়ে দাও হে, সকলকে এবার কোথাও পাঠিয়ে দাও, আর দেরি নয়।

জানাশোনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, জগদীশের মতো প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এতলোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা, অসহায় মনে হয়। কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না। শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দু'পেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোশ সকলের খসিয়া গিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিতে পায় পিছনদিকের লম্বা সিটে বসিয়া একজন কি যেন বলিতেছে, আশেপাশে কয়েকজন মন দিয়া শুনিতেছে। রাস্তায় জগদীশের কথা শুনিয়া এই লোকটিই খবরের কাগজে এ আর পি'র বিজ্ঞাপন না থাকায় নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিল। বেশ বুদ্ধিমানের মতো চেহারা লোকটির। ভিতরের খবরও হয়তো কিছু কিছু রাখে। কাছে গিয়া শুনলে হইত না কি বলিতেছে।

বাড়ির সামনে ছোট রোয়াকে বসিয়া ছোট ভাই রমেশ পাড়ার ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। তার হাতে ছিল সিগারেট, মুখে ছিল হাসি। ধনেশকে দেখিয়া হাসি মিলাইয়া মুখতার অন্ধকার হইয়া গেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আড়াল করার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। ধনেশের সামনে কোনোদিন সে সিগারেট খায় না। ঔদ্ধত্য দেখাইতে চাহিয়াও অভ্যাসের বশেই বোধহয় একটু তাকে ইতস্তত করিতে হইল, তারপর সিগারেটটা মুখে তুলিয়া টান দিলো জোরে।

আজ তিনদিন রমেশের সঙ্গে তার কথা বন্ধ।

রমেশ বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতে আসিয়াছিল। শুনিবা মাত্র ধনেশ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল একেবারে।

'দাও, তাই পাঠিয়ে দাও। আজ পাঠিয়ে দাও—এই দণ্ডে। তুমিও থাকগে' শ্বশুর

বাড়ি—আমাদের সঙ্গে থেকে মরবে কেন!'

'চাকরি ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তাই বুঝি ভাবলেন আপনি?'

'ভাবব না? বৌমাকে রাখতে গিয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে, অত বোকা বুঝিয়ো না আমায়।'

'না আপনি খুব বুদ্ধিমান। এত যদি বুদ্ধি আপনার, দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কেন? আপনাকে ক'দিন বারণ করেছি। আপনি কথা শোনেন না, পাগলের মতো করতে থাকেন। আপনাকে ওরকম করতে দেখলে বাপ মা ভাইবোনের জন্য ছেলেমানুষের ভাবনা হবে না?'

লাবণ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ না করিলে হয়তো ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও ধনেশ আত্মসম্বরণ করিতে পারিত। রমেশকেও দোষ দেওয়া যায় না। এ বাড়ির অস্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে লাবণ্যের মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সকলের অবিরাম পরামর্শ ও আলোচনায় ভয়ংকর সব সম্ভাবনা যতই অনিবার্য ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, বাপের বাড়ির সকলের জন্য সে তত উতলা হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কপাল কুটিয়া অনর্থ করিতে থাকে। সে সমস্ত সহ্য করিতে হয় রমেশকেই।

'ছেলেমানুষ! বয়স ভাঁড়িয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বাপ, ছেলেমানুষ! পারুল ছেলেমানুষ নয়? পারুল যদি এখানে থাকতে পারে, তোমার আহ্লাদী বৌও থাকতে পারবে।'

পারুল ধনেশের বড় মেয়ে। বছর সতের বয়স হইয়াছে, মানুষকে বলা হয় চোদ্দ।

'পারুল আমাদের কাছে আছে।'

'বৌমাও তাই আছেন।'

তখন রমেশও আর ধৈর্য ধরিতে পারে নাই।

'সেই জন্যই সরিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে না।'

'এ বাড়িতে মানুষ থাকে না, না?—কি থাকে, জন্তু জানোয়ার?'

'পাগল থাকে। আপনার মতো যাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেছে।'

ঠিক পাগলের মতোই তখন দু'পা সামনে আগাইয়া ধনেশ তার ত্রিশ বছর বয়সের ভাইএর গালে চড় বসাইয়া দিয়াছিল। ধনেশের নিজের বয়স পঞ্চাশের কাছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। মাঝখানে তিনটি বোন, তারপর এই ভাই। এত বড় উপযুক্ত ভাইকে চড় মারিয়া বসার ঝোঁক অবশ্য ওই একদিনের একটিমাত্র কলহে জাগে নাই। কিছুদিন হইতে মনটা বিগড়াইয়া যাইতেছিল।

মনে হইতেছিল, রমেশও বুঝি তার অবস্থা বুঝে না, তার কথা ভাবে না, অন্য সকলের মতোই সে স্বার্থপর। প্রথমে রমেশের নিশ্চিত নির্বিকার ভাব সে বুঝিতে পারিত না। যে খবর শুনিয়া তার হৃদকম্প উপস্থিত হইত, খবরটা মন দিয়া শুনিবার আগ্রহ পর্যন্ত রমেশের দেখা যাইত না। পরামর্শ করিতে ডাকিলে কেমন

উসখুস করিতে থাকিত, বিরক্ত হইয়া বলিত অত ভেবে লাভ কি ? আপিস যাই-তেছে, আড্ডা দিতেছে, গান গাহিতেছে, বৌ আর পারুলকে সঙ্গে করিয়া সিনেমায় যাইতেছে, কিছুই যেন হয় নাই, সর্বনাশ যেন ঘনাইয়া আসে নাই ঘরের দুয়ারে। বিস্ময়ের পর জাগিয়াছিল বিরক্ত ও ক্ষোভ আর সেই মনোভাব মনের মধ্যেই পাক খাইতে খাইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহের : ছেলে নাই, মেয়ে নাই, শুধু সে নিজে আর তার বৌ, তাই কি রমেশ এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে ?

তাই বটে। এ যুগের তাই, বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছে এক স্কুলে পড়া ধিঙ্গি মেয়েকে, দিবারাত্রি সে মন্ত্র দিতেছে কানে, তার কি দায় পড়িয়াছে দাদার ভাবনা ভাবিতে গিয়া মাথার টনক নাড়িতে দিবার।

রমেশের প্রত্যেক কথা আর কাজে সে এই চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। তার সঙ্গে সে যে পরামর্শ করিতে চায় না তার কারণ তার দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার ইচ্ছা তার নাই, নিজে কি করিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে চায় বলিয়া তাকে সে তিন মাস ছুটি লইয়া চেঞ্জে যাইতে বলে। পাটনায় একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে ? করিবে না, চাকরির ছলে এই তো তার সরিয়া যাওয়ার সময়। খরচ কমাইয়া টাকা জমাইতেছে, তাকে বলে নাই, তার মানেও ধনেশ জানে। রমেশের গম্ভীর ও চিন্তিত হইয়া উঠিবার কারণ, তর্ক আর কথা কাটাকাটি আরম্ভ করার কারণ, শহরের হাজার হাজার লোক যে স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, সেইখানে বাপমা ভাইবোনের জন্য লাবণ্যকে উতলা হইতে পরামর্শ দিবার কারণ, সব ধনেশের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। সুতরাং কারণে অকারণে খিটিমিটি বাধিতেছিল। কেউ কারো কথা সহ্য করিতে চায় না, পরস্পরের নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত সময় সময় দু'জনের অসহ্য মনে হয়। মনের এই চিরন্তন প্যাঁচ, ঢিল দেওয়ার, আলগা করার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। তারপর পুলককে উপলক্ষ করিয়া দু'জনের মধ্যে কয়েকবার রীতিমতো ঝগড়া হইয়া গেল।

মুখ অন্ধকার করিয়া রমেশ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'পুলককে ক্ষেন্তির শ্বশুর-বাড়ি গিয়া থাকতে বলেছেন ?'

'হ্যাঁ, ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুক। জবরদস্তি লড়াইয়ে পাঠাবার আইন পাস হচ্ছে শুনলাম।'

'আইন পাস হলে ওখানে ওকে ধরতে পারবে না ?'

'তুমি বোঝো ছাই। কলেজ থেকে নাম, ঠিকানা জেনে খুঁজতে আসবে, এখানে না থাকলে বলতে পারব, কোথায় গেছে জানি না। ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাও বলতে পারব।' ধনেশের ভুরু কুঁচকাইয়া গেল, একথাটা তো আগে খেয়াল হয় নি। কাগজে ওর নামে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আগে থেকে ছাপিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না ?'

'আপনি ওর মাথাটা খাচ্ছেন দাদা। কোথায় আপনি কি গুজব শুনে আসবেন আর আপনার এতবড় জোয়ান মর্দ ছেলে চোর-ডাকাতের মতো লুকিয়ে বেড়াবে। এর চেয়ে লড়ায়ে গিয়ে মরা ভালো। আইন যদি পাস হয়, লড়ায়ে না যেতে চায়, জেলেই নয় যাবে। তাও ঢের ভালো।'

'তুমি তো তা বলবেই।'

একটা বিশ্রী কলহ হইয়া গেল। কাকার কাছে বকুনি আর উপদেশ শুনিয়া পুলক একবার ঠিক করিতে লাগিল ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাইবে না, আবার উমার কান্না ও ধনেশের ধমকধামক যুক্তিতর্কে মত বদলইয়া ফেলিতে লাগিল। ধনেশ ও রমেশের মধ্যে আরও কয়েকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল, প্রচন্ড এবং কুৎসিত। মনে হইল পুলকের ভালোমন্দের প্রশ্ন ভুলিয়া রমেশও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তার জিদ চাপিয়া গিয়াছে যে পুলককে কোথাও সে যাইতে দিবে না।

এমনি যখন চলিতেছিল, লাবণ্যকে বাপের বাড়ি পাঠানোর কথাটা রমেশ তাকে বলিতে গেল এবং সংক্ষিপ্ত অর্থহীন কলহের পর ধনেশ তার গালে বসাইয়া দিল চড়। ক'দিন পরে মাসকাবারে বেতন ও ছুটি পাইলে রমেশ নিশ্চয় লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে। নিজে বোর্ডিং অথবা মেসে চলিয়া যাইবে।

মাঝখানের এ ক'টা দিন এমনিভাবে মুখের সামনে সিগারেট টানিয়া নির্বিকার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া, একা লাবণ্যকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, তার সবচেয়ে গভীর হতাশা ও বিষাদের মুহূর্তে পাশের ঘরে ঠুংরি সুরে গান ধরিয়া দাদাকে আঘাত দেওয়া ও অপমান করার কাজে লাগাইতেছে।

সদরের চৌকাট পার হওয়ার সময় চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনদিনে রমেশের গায়ের জ্বালা কমে নাই। আজ ভাই-এর সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিবেন ভাবিয়াছিল। পয়লা কি দোসরা তারিখে লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তারপর কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলিবে। বিপদের কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, সংসারের সাধারণ কথা। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র সাপের মতো ক্রুর ভঙ্গিতে যে ফণা তুলিয়াছে, তার সঙ্গে যাচিয়া কিভাবে কথা বলা যায়।

সিগারেট খাক, সেজন্য নয়। ত্রিশ বৎসরের উপযুক্ত ভাই, সামনে খাইলেও দোষ হয় না। তবু একটু আড়াল দিবার, একঘরে থাকিলেও অন্তত তার পিছন দিকে জানলায় সরিয়া গিয়া সিগারেট টানিবার যে প্রথা ছিল, যুগযুগান্তের সংস্কারের চেয়ে সেটা কম বর্জনীয় নয়। রমেশ যে শত্রুতা করিতে চায় তার এত স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আর কিসে মিলিত। একটি গাঁট ভাঙিলে শিকল ছিঁড়িয়া যায়, এই একটি নিয়ম ভাঙিয়া ভাই তার স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের বাঁধন ভাঙিয়া দিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। একজনকে মারিয়া উপরে গিয়াছে উমা, আরেকজনকে পিটাইতেছে পারুল। ব্যাপারটা বুঝিয়া ধনেশ

মুখ খুলিতে না খুলিতে তড়বড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া কি জোরে ধাক্কা দিয়াই সে পারুলকে হটাইয়া দিল। বেহায়া নচ্ছার মেয়ে খাইয়া খাইয়া গায়ে তার এতই কি তেল বাড়িয়াছে, সময় নাই অসময় নাই ভাইবোনদের মারে ?

'তুমি মারলে আমায়। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু বললে না বাবা ?'

পারুলের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাদাটে সরু গলায় তিন চারটা নীল শিরা ফাঁপিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।—'থাকবো না তোমাদের বাড়িতে আমি আর। নার্স হয়ে যাবো—এক্ষুণি নার্স হয়ে যাবো।'

আঁচল ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া মেয়েকে থামাইয়া উমা বলিল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'আমি এক্ষুণি শীলাদির কাছে গিয়ে নাম লেখাবো। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে।'

গা ধুইতে নিচে নামিয়াছে, গায়ে জামা নাই। ওসব যেন গ্রাহ্যও করে না, এমনিভাবে পারুল চেঁচাইতে থাকে। উমা আঁচল ছাড়িয়া না দিলে সে যেন বিনা কাপড়েই পথে বাহির হইয়া যাইবে, এমনি উন্মাদিনী মনে হয় তাকে। দেখিলে কল্পনাও করা যায় না, কয়েকমাস আগে এই পারুল ছিল ধীর, শান্ত ও সংযত মেয়ে, চুপচাপ সংসারের কাজ করিত, মুখে ফুটিয়া থাকিত সলজ্জ নম্র হাসি।

'তোরা কি আমায় পাগল করে দিবি।' ধনেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া লাবণ্য নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতেছে। নিচের উঠানে যা ঘটিতেছে সে সব যেন অজানা অচেনা প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যাপার, তার কিছু বলারও নাই করারও নাই। ভাশুর আসিয়া দাঁড়ানোর অনেক আগে হইতেই সে এইভাবে এইখানে দাঁড়াইয়া উদাসীনের মতো সব দেখিতেছিল। মাজা বাসনের তাড়া উমা পা দিয়া ছুঁড়িয়া দিল—দিক। দু'বছরের শিশুকে বেদম মারিয়া উমা উপরে উঠিল—উঠুক। খেলা ফেলিয়া পাঁচ বছরের মিনু উপর হইতে সাবান আনিয়া দিতে না চাওয়ায় পারুল তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছে—করুক। মা যদি পাগলা গরুর মতো মেয়েকে গুঁতায়, সতর আঠার বছরের মেয়ে যদি সদরের খোলা দরজার সামনে উঠোন কোমর পর্যন্ত উদলা করিয়া দাঁড়ায়, তাতেও তার কিছু আসিয়া যায় না। তার যে বাপ মা, ভাইবোন ওদিকে মরিয়া গেল, সাতদিন খবর আসে না।

লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া ধনেশ চিৎকার করিয়া বলিল, 'তুমি কি একবার নিচে নামতে পার না বৌমা ?'

লাবণ্য ইঞ্চি দুই ঘোমটা টানিয়া দিল। ভাশুরের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা শাঁকের ফুঁ পড়ে, ঘরে ঘরে ধুনা দেওয়া হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিবার আগে মাটির প্রদীপটি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মিনিটখানেকের জন্য আলো দিয়া আসে। কিছুই বাদ যায় না, সব বজায় আছে। রান্নাঘরে রান্না হইতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসিয়াছে, রমেশের ঘরে রেডিও বাজিতেছে, দুধ খাইয়া প্রতি-

দিনের মতো কোলে শুইয়া ঘুমানোর জন্য খোকা গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব বজায় আছে। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া, কাগজ পড়া, স্নানাহার সারিয়া আপিস যাওয়া, ছুটির পর বাড়ি ফেরা, খোকাকে ঘুম পাড়ানো ছেলেমেয়ের পড়া বলিয়া দেওয়া, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসা, খাওয়া এবং ঘুমানো। তবু সংসার তার বেঠিক বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া। বাহির হইতে একটা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত প্রচন্ড শক্তি চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া তার সংসারের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ভিতর হইতে বিরামহীন সক্রিয় একটা শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের।

খোকাকে কোলে শোয়াইয়া অভ্যাসমত ধীরে ধীরে তাকে থাবড়াইতে থাবড়াইতে অবসাদে ধনেশের চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। এ, আর, পি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়াছে, জগদীশ আর ট্রামের সেই কাঁচাপাকা চুল বুদ্ধিমানের মতো চেহারার লোকটি বলিয়াছে, আজ রাত্রেই হয়তো কিছু ঘটিবে। এ চিন্তা মন হইতে দূরে করিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। কিন্তু এই আতঙ্ক পর্যন্ত তার যেন আজ কেমন অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বুককাঁপানো উত্তেজনায় অবশ করা শিহরণের মতো মুহুর্মুহু শিরায় বহিয়া গিয়া মনকে দিশেহারা করিয়া দিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে আরেকটা আতঙ্ক তার চেতনাকে দখল করিতে চাহিয়াছে —বাহিরের বিপদ ঘটিবার আগেই তার ঘর ভাঙিয়া যাওয়ার, সর্বনাশ হওয়ার আতঙ্ক। একটা বিষ যেমন আরেকটা বিষের ক্রিয়া নাকচ করিয়া দেয়, সংসারের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে খেয়াল করায় নূতন এক ভয় তার এই ক'দিনের ভয়কে দুর্বল করিয়া গিয়াছে।

জগদীশ ডাকিতে আসিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিল। পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েরা অবিরত ঝগড়া আর মারামারি করিতেছে। ওদের স্বাভাবিক দুরন্তপনার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া বেপরোয়া হিংস্রভাব দেখা দিয়াছে। মেজাজ যেন ওদের তিরিক্ষে হইয়া উঠিয়াছে। তার পর এক সময় ছেলেমেয়েরা ভাত খাইতে গেল, উমার গালাগালি আর মার খাইয়া পলটুর আর্ত ও মিনুর নাকিসুরে কান্না ধনেশের কানে আসিতে লাগিল। চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। অবসাদ ধীরে ধীরে কেমন একটা মৃদু ও শান্ত নেশায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, দুর্বল জ্বরো রোগীর আলস্যের মতো। ঘরের বাইরে বারান্দায় হঠাৎ পারুল আর লাবণ্যের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সেই পারুল আর সেই লাবণ্য। সখির মতো গলায় গলায় ভাব ছিল এই দু'টি ভাশুরঝি আর কাকীমার। কাড়াকাড়ি করিয়া লাবণ্য সংসারের কাজ করিত, উমার ছেলেমেয়ে মার চেয়ে কাকীমার আদর পাইত বেশী। সংসারের কাজ করা লইয়া পারুলের সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিতেছে। একতলায় উমা চিৎকার করিয়া একটা বিশ্রী কথা বলিল লাবণ্যকে। লাবণ্য ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল, 'তোমার খাই না পরি যে যা মুখে আসছে বলছ দিদি?'

লাবণ্য এত জোরে কথা বলিতে পারে ? এত কর্কশ তার গলা ?

অনেকক্ষণ পরে কি কাজে ঘরে আসিয়া ধনেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উমার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। উমা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি পাড়ার দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে বাহির হইয়াছে। বাড়িতে তার তো চুপচাপ একা বসিয়া থাকা স্বভাব নয়, বাড়ি থাকিলে এতক্ষণ কত আলোচনা, কত পরামর্শ তার চলিতে থাকে।

'কি হয়েছে গো ? আজ কিছু হবে নাকি ?' ভয়ে উমার কথাগুলি প্রায় জড়াইয়া গেল।

'শরীরটা ভালো নেই। পুলক ফেরে নি ?'

'না। ঘরে বসে আছ, খেয়ে তো নিতে পারতে এতক্ষণ ? সারারাত হেঁসেল আগলে বসে থাকব ?'

সকালে চার বস্তা চাল, এক বস্তা ডাল এবং নুন, তেল, মশলা মুদি দোকান হইতে আনা হইয়াছিল। বাজারে গিয়াছিল মাছ তরকারি কিনিতে, রসিকবাবু এমন ভয় দেখাইয়া দিলেন যে মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আর ভরসা হইল না, ধার করিয়াই জিনিসগুলি কিনিয়া আনিল। মাস ছয়েকের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করা আছে তবু আরও কিছু অবিলম্বে এই দণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ফেলাই ভালো। মুদিওয়ালা কি সহজে ধার দিতে চায়। বিশ বছরের যে খদ্দের, তাকে পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য বাকি দিতে সে নারাজ। বিকালে টাকা পাঠাইয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে ধনেশ জিনিসগুলি পাইয়াছিল।

পুলককে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে ফেরে নাই। ক'দিন সে বাড়ি ফিরিতে এমনি রাত করিতেছে। কোথায় যায়, কি করে ছেলেটা, কে জানে। সেও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তিনচার বছর আগে যখন তার পনেরো-ষোল বছর, অকারণে তার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বভাব হইয়াছিল মেয়েদের মতো লাজুক, চোখ তুলিয়া কারো মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে-বয়েসের বদভ্যাস ছেলেকে ধরিয়াছে টের পাইত, কত রাত্রি ধনেশের তখন ঘুম আসে নাই। তার পর ছেলের চেহারায় লাবণ্য ফিরিয়া আসিল, স্বভাব স্বাভাবিক হইলে, ধনেশের যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। খাইতে খাইতে ধনেশের মনে পড়িল, কিছুদিন হইতে পুলকের চেহারা আর চালচলনে আবার যেন সেই আগেকার শোচনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেখিয়াও এতদিন সে দেখে নাই। চারিদিকের অস্বাভাবিকতার পীড়নে তার দিশেহারা ভয়-ভাবনার ছোঁয়াচে আবার কি ছেলেটা বিগড়াইয়া গেল ?

মুখে ভাত রুচিল না। অর্ধেক খাইয়া ধনেশ উঠিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল পুলকের। আজ একবার ভালো করিয়া ছেলেটাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে, তার কি হইয়াছে। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, সংসারের কাজ ফুরাইয়া গেল। শুধু আলো জ্বালিয়া ধনেশ আর উমা বসিয়া

রহিল ছেলের অপেক্ষায়। শ্রান্তিতে ধনেশের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শংকায় মন তার সজাগ, সচেতন হইয়া রহিল।

পুলক ফিরিয়া আসিল রাত্রি প্রায় একটার সময়। গলিতে রিক্সার আওয়াজ শুনিয়াই ধনেশ ও উমা নিচে নামিয়া সদর খুলিয়া দিয়াছিল। পুলক রিক্সা হইতে নামিল, ভাড়াও মিটাইয়া দিল। সমস্ত শরীর শক্ত আর সোজা করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সময় চৌকাটে পা বাধিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া ধনেশের ধমকে উমা চুপ করিয়া গেল। পুলক নিজেই তখন উঠিয়া বসিয়াছে।

ছেলেকে কড়া কথা বলিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। শান্তকণ্ঠে অসহায়ের মতো সে শুধু প্রশ্ন করিল 'মদ খেলি কেন রে পুলক ?'

পুলক বলিল, 'কেন খাব না ? ক'দিন বাঁচব আর। তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দু'দিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফুর্তি করে নি।'

পেটব্যথা

কথা মতো মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কি, একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, ওগো ওঠো। শুনছো? ওঠো গো।

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

এত তাড়া কিসের, আঁ, কিসের তাড়া এত? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কত্‌খনে কালীকে তাড়িয়ে হাড় জুড়োবি ভেবে?

এ পর্যন্ত বললে কোনো কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে এসে হাইটাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক্‌ জের চলে ভৈরবের গোঁসায়।

হাঃ, সে বলে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মতো, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে টেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মতো পেলে একটা ছাগল বেচতে চেয়ে পাগল হবে সে তো ডাল-ভাত।

এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

ছাগল লোকে বেচে না পোড়ারমুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে? মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, মেয়ের কথা বলো না যদি সরম থাকে একরতি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচত মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে খেতে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

ছাগল বেচলে বাঁচতো! মানোর মার ধাঁধায় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, ছাগল কোথা ছিল তখন? কালী তো জন্মালো দু'চার দিন আগে, মানো যাওয়ার দু'চার দিন আগে ওই গোয়াল-ঘরটায়।

ওর মা-টাকে বেচা যেত না? বাচ্চা ক'টাকে?

কার ছাগল কি বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব? আর সবে বিইয়েছে দুটো তিনটে দিন আগে?

রওনা দেয় না? এসো না গিয়ে ভালোয় ভালোয়? মানোর মা বলে লড়ায়ে জেতা

রানীর মতো, বেলা যে দুপুর বয়ে যাবে সদরে পেঁছিতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে। গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দু'পা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পেঁছিবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বৌয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্ম-ভোর ক্ষেত চষে আর গরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বার বার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগে সস্তা শাড়ির পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই কটা পাড় আজও টিকে আছে, গরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্যন্ত বুঝি ভালো চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙা গোয়ালের ফাঁকা চালাটার নিচে পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জেবলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা ক'টাকে নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও ক'টা বাচ্চা টিকত কে জানে! কয়েক দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো? জাফর শুধিয়েছিল। বাঁচাবো। বলেছিল ভৈরব উদা-সীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি ছাগলের মাংস এক দিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ যদি কোনো মতে তুলে আনা যায় কাল্লুর খেত থেকে।

তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরে নি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাব-নার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্তত দশবার মনের মধ্যে জোর গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ও-কথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয়তো পেটের জ্বালায় মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয় তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয় তো মরত না, তবু না খেয়ে যে মরেছে এ-কথা কোনো মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তা হলে? জোয়ান মর্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনো হয়! সেও তো মরে নি, তার আর দুটো ছেলে মেয়ে। দুর্ভিক্ষটা কোনো মতে সামলেছে ভৈরব। এক বেলা আধ বেলা শাক-পাতা খুদ-

কুঁড়ো কোনো মতে জুটিয়ে হাড় চামড়া টিঁকিয়ে রেখে কোনো মতে বেঁচে থেকেছে সবাই মিলে—মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হ'ল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনো অসুখ হলে। অসুখটা যদি না হতো, না খেয়ে মানো মরত না, শাকপাতা খুদ-কুঁড়ো তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত ক্ষেতে ক্ষেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেক কাল যেমন ফসল কারো মাটিতে ফলে নি।

আর ক'টাদিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকী খাজনার দায়ে। তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন।

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, বলি চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো?

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা' বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচপুরুষ শুঁড়ির কর্ম তো কেউ করে নি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষী। তার এক দূর-সম্পর্কের কুটুম্ব সদরে মদ বেচে টাকা করে। এজন্য তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ মা বো মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

এই যাচ্ছি হেথা হোথা।

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, রাগ কয়ো না। ওটা নিছক তামাশা। তামাশা বোঝ না, কেমন চাষী তুমি? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভালো, তা কি জানি না আমি? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক্ ক'টাদিন আর চলে না কোনো মতে।

সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে? কৈলাস বলে আশ্চর্য হয়ে, তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় ভৈরব। গাঁয়ের গরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারো অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি।

পুবের আকাশে সূর্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোট-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল তৈরি করে দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়ডর ভুলে যায়।

আপনাকে গরু-ছাগল দেওয়া মানে তো খয়রাৎ করা।

বটে না কি? সবাই তাই আমাকে গছিয়ে দিতে পাগল। নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে,

শোন বলি তোকে, ছ'টাকা সবাই পায়, তোকে আট দিচ্ছি আর কাউকে বলিস না। এমনি ছাগলের জন্য আট টাকা করে দিতে হলে ব্যবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিঠিটা দিবি যা—পেন্সিলে লিখে দিলাম তো কি হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে।

রও, রও। ভৈরব সাতঙ্কে বলে, আট টাকা কিসের? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচবো।

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা?

কি জন্যে! আমার ছাগল আমি যেথা খুশি নিয়ে যাব।

মাইরি? কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মতো, আমি দশ-বিশ হাজার ঢেলে লাইসেন্স নেবো সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খশি নিয়ে গরু-ছাগল বেচবে? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল কাপড় কেরোসিনের মতো গরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না। অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স?

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্তভাবে বলে, বোকা পেলে না কি কৈলাসবাবু? আইন শুধিয়েছি। চালানী কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিয়ো তখন।

ভৈরব বলতে শুরু করলে কৈলাস ভুরু কু'চকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশজনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম শুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রয় হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুশি হয়। শুধু ভালো দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ায় খেদটা তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটেকুটে গর্ভিণী কালীকে হয় তো খেয়ে ফেলবে নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিনকাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গরু মহিষ পাঁঠা খাসী ছ .লের কোনো তফাৎ নেই, মাংস হলেই হ'ল। কুকুর-বেড়াল নাকি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক যোগান দেয় তাতে। কালী ভালো ঘরে পড়েছে ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ি, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়। বাড়ির লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার এক রকম চলে যাবে। আধ সের আলু এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ'আনার হলুদ লঙ্কা ধনে আর জিরে, চার পয়সাতে সোডা আর দু'আনার একটি কাপড় কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবে চিন্তে দু'আনার

তামাক-পাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্য।

তারপর পথের ধারে তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলেভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়ই পছন্দ করে।

বাদাম তেলের চেনা গন্ধে পুরানো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে, জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্যন্ত। পেটভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে যে মিলিটারী লরীগুলো চলেছে, দিক কাঁপিয়ে সেগুলি চলতে শুরু করার পর দেখতে দেখতে দুর্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপসোস দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা-পেটের তেলেভাজার তলে।

ঘুম আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভালো। তেমন নাছোড়া-বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোনো গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিস কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগানো ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায় নি, এবার শহর ছাড়িয়েই দু'দিকে ছড়ানো পরের ক্ষেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতোই তাজা খুশিতে। তার নিজের ক্ষেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যে দিকে তাকাই সেই-খানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দু'জন ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার মানুষ।

ছাগল বেচলি ভৈরব?

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, বেচেছি গো কৈলাসবাবু, তোমার আশীর্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।

তাই না কি! তা বেশ করেছিস, আমাকে বেচা-কেনার ঝক্কিটা তুই নিজেই পুইয়ে-ছিস। আট গণ্ডা কমিশন দেবো তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোক দু'জন ভৈরবকে ধরে কোমরে-বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুনে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, হুঁ খরচা করা হয়েছে এর মধ্যে। দাঁড়া, হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনৎ- -সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকিটা তোর।

এ কেমন ধারা তামাশা কৈলাসবাবু ? ছাড়ো আমায়, ছেড়ে দাও।

তামাশা ? ব্যাটা, তুই আমার তামাশার পাত্র ? দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, বলি নি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গরু-ছাগল কেনা-বেচার লাইসেন্স কারো নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে ? ঘাড়ে তোর ক'টা মাথা রে হারামজাদা, গট-গট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে ?

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্তনাদের সুরে বলে, ডাকাতি করে গরীবের পয়সা কেড়ে নেবে ? নাও—আমি থানায় যাবো, নালিশ করবো।

থানায় যাবি ? নালিশ করবি ? কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়, যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা। বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথ-চলতি রাম শ্যাম যদু মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দু'জন কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে—কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে। তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে—দৌড়ে পালায় নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলে-দুলে, পিছনে চলছিল সঙ্গী দু'জন, কিছুই যেন ঘটে নি এমনিভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে চুমড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সঙ্গে রক্ত তুলতে দেখে, রাম শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি থানা থেকে আঁচলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

দু'হাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তেবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনি সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাই-এর সঙ্গে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাতপাতালে পৌঁছেই আরেকবার বমি করে ভৈরব। একগাদা তেলে-ভাজার সঙ্গে উঠে আসা একগাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, কি হয়েছে ?

মধু বলে, রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্ত-বমি করছিল ডাক্তারবাবু। আমরা তুলে এনেছি।

যদু বলে, কারা নাকি মার-ধোর করেছে।

শ্যাম বলে, পেটে লাথি মেরেছে এক জন।

রাম বলে, ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে! মরে যদি যায়।

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, লাথি মেরেছে? কে লাথি মেরেছে? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে!

রাম বলে, আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাসবাবু।

শুনে বলাই বলে, হুম্।

শ্যাম বলে, মোরা দু'জন আসতেছিলাম, কাছে যেতে লাথি মেরে কৈলাসবাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা লোকটাকে একটু দেখতে দাও! বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভৈরবকে পরীক্ষা করে, লোক-দেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভালো করে দেখে। তার পর সে রায় দেয়, কলিক। কলিক হয়েছে।

বলাই বলে, আঃ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

রাম শ্যাম যদু মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলি-কের ব্যথা হ'ল, যাকে তোমরা শূল বেদনা বলো। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছো না বমি তেলেভাজায় ভর্তি?

মধু বলে, কিন্তু ডাক্তারবাবু—ও রক্তটা?

কলিকে রক্ত ওঠে।

যদু বলে, পশু মোকে শূলে বেদনায় ধরেছিল ডাক্তারবাবু। রক্ত তো ওঠেনি? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।

রোগের লক্ষণ সবার বেলা এক রকম হয় নাকি?

শ্যাম বলে, আমরা যে দেখলাম ডাক্তারবাবু লাথি মারতে?

দেখেছো তো বেশ করেছো। ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানো তুমি? লাথি কে মেরেছে কে মারে নি জানি না বাবু, তেলেভেজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।

রাম বলে, কৈলাসবাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্ত-বমি করতে লাগল—

যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও, যাও, বাইরে যাও, ভিড় করো না। ওষুধপত্তর দিতে দাও মানুষটাকে চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।

রাম শ্যাম যদু মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচ-ড়াতে থাকে হাসপাতালের দু'টি লোহার খাটের একটিতে। আরেক বার সে বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে কম, রক্ত ওঠে বেশি। মনে হয়, রক্ত-বমি করে তার পেট ব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে, তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।

বাইরে থেকে গুঞ্জন কানে আসে কুঞ্জ ডাক্তারের, বাড়ি যাবার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরোতেই রুদ্ধ ঝাপ্টার মতো এসে লাগে গুঞ্জনধ্বনিটা। ইতিমধ্যে রাম শ্যাম

যদু মধুদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তেঁতুলগাছটার তলায় জোট বেঁধে তাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাশ কাটিয়ে খানিক তফাৎ দিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার এগিয়ে যায়।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমের আয়োজন করছে কুঞ্জ ডাক্তার, সেই উদ্ধত ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ায় তার বাড়ির দরজার সামনে।

বাইরে থেকে হাঁক আসে : ডাক্তারবাবু ! ও ডাক্তারবাবু ! শূলবেদনার রুগী এসেছে আর একজন—কলিগের রুগী।

ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দেখতে পায়, তারই সদরের চৌকাটে মুখ থুবড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রাম শ্যাম যদু মধুরা বলে, পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে ডাক্তারবাবু, কলিক হয়েছে।

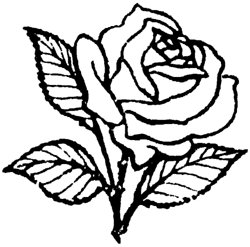

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। সে কেরানী। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশো টাকায় শুরুর গ্রেডে সরকারী চাকুরি পেয়েছে আর বছর। হীরেন সাতান্ন টাকার কেরানী, যুদ্ধের দরুন পাঁচ দশ টাকা বোনাস এলাউন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু সরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাজার করে রেঁধে-বেড়ে, ঝি-চাকর ঠাকুর, শুধু নিজেদের ভালোমন্দ সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি দু'পলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসারে থেকে ও সংসার দান হিসাবে নয়। দু'চার দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারের মাল আনা হলে সংগে সংগে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বড় দু ভাই-এর বৌদের তরফের কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো উপলক্ষে খাবারটাবার মাছটাছ এমন জিনিস যদি এত বেশী পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তিটা ভাগ করে দেওয়া হয়। হীরেনদেরও দিতে হবে। কেরানী বলে তার বৌ এসেছে গরিব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ির দিক থেকে কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মতো, কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মতো, কখনো আসবেও না, তবু উপায় কি। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো বাস করুক, বাস তো করে একই বাড়িতেই, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শী সকলে। সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোনমতেই।

বিশেষত বুড়ি মা আছেন হীরেনের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তাঁর দুধটুকু জাল দেওয়া, দইটুকু পেতে রাখা, চাল ডাল তরকারিটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এসব করতে হয় হীরেনের বৌকে। অসুখেবিসুখে ব্রত পার্বণে বাড়তি দরকারের জন্য বৌদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজকার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেনের বৌ-এর কাছ থেকে। তাঁর রেশন কার্ড, কার্ডের মাল হীরেন পায়, মাসে দেড় মন দু'মন কয়লার দাম তিনি দেন, ঠিকা ঝি'র আট টাকা বেতনের দু টাকা দেন আর

সাধারণভাবে সংসার খরচের হিসাবে দেন দশ টাকা।

হীরেন ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমতো আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পশার বেশি, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পশার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা। চাকরি হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড় বৌ-এর পরামর্শে দায়টা মাসিক পঁচিশ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের বৌ নেই। এখনও বিয়ে করে নি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়িতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন নীরেন লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড় দু'জনকে। তখনও তার চাকরি হয় নি। তার খাওয়াপরা পড়াশুনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরও তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথা-টাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এরকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, কেন, এ তো ভালোই হ'ল! রোজ বিশ্রী খিট্‌খিটে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কি মন কষাকষি বল তো? দাদার আয় বেশি, তিনি ভালোভাবে থাকতে চান। মেজদার ভালো উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালোভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশ টাকা দিয়ে মজা করব, ওঁরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়াখাওয়ি কামড়াকামড়ি করেও এক সাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভায়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভালো।'

'তোমার চলবে?'

'চলবে না? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্য দিকে লাভ হবে। মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুদকুঁড়ো হজম হবে।'

'নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে কিনা কথাটা হ'ল এই যে—'

দুঃখী অসহায় গরিব কেরানী ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড় বড় দু'ভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরও পড়েশুনে আরও পরীক্ষা পাশ করে বড় কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেনের সংসারে।

চাকরি হবার পরেও, দু'শো টাকায় শুরু গ্রেডের সরকারী চাকরি হবার পরেও প্রায় দু'মাস হীরেনের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়বৌ পুলকময়ী আর মেজবৌ কৃষ্ণপ্রিয়া চটপট অদল-বদল করে নিজের নিজের সংসার

সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সার্বজননীন ভাঁড়ার ঘরটা ভেঙে-চুরে নতুন জানলা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো আলো-বাতাস ভরা বড় আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণপ্রিয়ার। আপসোস সে যদি চেয়ে নিত ভাঁড়ার ঘরটা রান্নাঘর করার জন্য। উনান টুনান বসানো নতুন রান্নাঘর পেয়ে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারে নি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাঁড়ার ঘরকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে। সেজবৌ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে, পুরানো নোংরা বান্নাঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত, কালি-ঝুল মাখা চুন-বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়, মিস্ত্রী লাগিয়ে কিছু পয়সা খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বৌকে হারানো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, পাড়া বেড়ায়, নিন্দে করে কেরানী দেওর আর তার বৌয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে কৃষ্ণপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও শাড়ি কিনে বড় বৌয়ের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায়, অর্গান বাজিয়ে গান করে, কেঁদে কেটে চিঠি লিখে ঘনঘন বড়লোক মামা-মামী মামাতো ভাইবোনদের দামী মোটরে চাপিয়ে বাড়ি আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফর্সা রঙ আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাস্টারনীর মতো পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে বৌয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে যায় শাশুড়ী ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পশার বড় বেশি বেড়েছে, দু টাকার বদলে আট টাকা ফি করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামী আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ি গয়না, মোটর কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি কিনে আয়োজন করছে বাড়ি করবার! ধীরেনেরও ওকালতি পসার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পশারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবেচিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশো পাঁচশো টাকা আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করে নি, বৌ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত ছিল। হীরেনের সংসারের অশান্তি, উদ্বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মার গুমখাওয়া একগুঁয়ে সেকেলে ভাব জীবনে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। প্রায় তাকে বাজার করতে হয়, প্রায় তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রেশনের লাইনে, মার আব্দার আর হুকুম সমানে চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড় ভোঁতা, বড়

নোংরা। বড় বৌ আর মেজোবৌয়ের প্রায় চার বছর পরে বৌ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ওদের দু'জনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাঁধছে বাড়ছে ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ী শাশুড়ির সেবা করছে, গাদা গাদা জামা কাপড় সিদ্ধ করছে কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছে : মরলে'জুড়োবো, তার আগে নয়।' ঘর সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরানো বাক্‌স পেঁটরা, রঙচটা খাট-চেয়ার, ছেঁড়া কাপড়-জামা, ময়লা কাঁথাখানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে পারে। রান্নাঘর ধোয়ায় দু'বেলা—নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না করা ডাল ভাত মাছ তরকারি খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণাপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ।

'ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে রেঁধে খাওয়াবো।'

কৃষ্ণাপ্রিয়া বললে একদিন হাসিহাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলি খারাপ।

'এমন আগোছাল কি করে থাকে ঠাকুরপো? ছি, ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নিচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কি ছড়িয়ে ভাড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ মাসে মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরত করে দিতে পারে না তোমার?

তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে কৃষ্ণাপ্রিয়া, ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পারে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুশিই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কি আছে।

খেয়ে আরও খুশি হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিস শুধু কৃষ্ণাপ্রিয়া রেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনোমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি ঘাঁটা কোনো মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার সেঁতসেঁতে ঘরে পুরনো মলিন পাত্রে মোটকাহীন মরচে-ধরা টিনের কোটায় মশলার রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা। পরিবেশক মাইনে করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরে সুস্থে হাসি-গল্পের সঙ্গে এক সাথে খাওয়া।

কৃষ্ণাপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ওদিকে এতদিন পরে হীরেন আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরও কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, 'আমি টাকা দিতে পারব না। যা দিয়েচি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।'

হীরেন বলে, 'তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কি করবি অত টাকা দিয়ে?'

'যাই করি না।'

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেক ভাবে।

'ছুটির দিন একটু দেরি করেও খেতে পারব না খুশিমতো ?'

'ঠাকুর রেখে দাও, যত খুশি দেরি করে খেও। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো ? দেখতে পাও না সেই কোন্ ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি ? দেড়টা বাজে, এখনো বলছ রান্নাঘর আগলে বসে থাকতে ?'

'আমি যে টাকা দিই—'

'টাকা দাও বলে বাঁদী কিনেছ আমায় ?'

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলি করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেনও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোট ভাই-এর মতো ব্যবহার করে তার সঙ্গে। মাসে মাসে এতগুলি টাকা সাহায্য করে ও সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টিসুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয় অনুগত নয় দু'জনে। হাড়-ভাঙা-খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে, ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেইজন্যেই তো তাকে বেশি করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না ? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেনকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ীমাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা করে দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ী কি খাবে ও টাকাটা ? হীরেনকেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা একরকম সে হীরেনকেই দিচ্ছে। সোজাসুজি আরও দেবার কি দরকার আছে কিছু ? না সেটা উচিত ? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের।

'তলে তলে টাকা জমাচ্ছে। বাইরে গরিবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো ?'

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকারভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলি, ব্যাঙ্কের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করে নি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলি দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায় ? কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায়।

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হ'ল, পৃথিবী জোড়া মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে তাদের পারিবারিক যুদ্ধ পর্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমি-টাতে এবার বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইঁট বালি চুন সুরকি

· পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেণ্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খ‍ুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলা দেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমতো, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায়নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ির কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

'মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবার যো নেই আমার।' দুর্বল ক্ষীণ স্বরে বুড়ী মা কাতরিয়ে আপসোস করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্য রকম শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি মরলে তো না খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিসুদ্ধু ?'

হীরেন বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণ দুর্বল সুরে বলে, 'কেন অত ভাবছ বলত মা ? অত সহজে কি মানুষ মরে ? দুর্ভিক্ষে দ্যাখোনি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে। তুমি এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাঁচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে ? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো দুধ, হপ্তায় দু'দিন একপো মাছ, তাও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার পয়সার পুঁই শাক রেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বৌটা বাঁচবে, ছেলেমেয়ে কটাও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, একথা সত্যি, এভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না।'

'কি বললি ?'

'বললাম বাঁচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব ? সাহেবের টুঁটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন ? মরব না। কেউ আমরা মরব না।'

বুড়ীমা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে মরলে কেমন হয় ? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে, চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফির ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেনের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ি গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিত নির্ভর চালচলন, অবসর, সৌখিনতা, ভালো ভালো জিনিস খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সব কিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে এই ভাবনার মলম দিয়ে সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা পরম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ীশাশুড়ির জন্য জীবনপাত করে খাটা, শাক-পাতা-ডাল-ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজরগজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেনের উপর ঝাঁঝ বেড়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলে-মেয়ের দুটি বড় হয়েছে, তারা শাক-পাতা ডাল-ভাত খেতে পারে,

অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু কিন্তু একটু তো দুধ চাই ? একপো দুধ আসত, সেটা বন্ধ হ'ল। সপ্তাহে দু'দিন মাছের আঁসটে গন্ধ নাকে মুখে লাগত, তা আর লাগে না। যে সায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো থলথলে যৌবন না থাক সেও তো যুবতী, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, সায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে ফিরতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কি এক কলাকৌশল জেনেছে হীরেন, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই আর ছেলে মেয়ে হবে না। এসব কি সত্যি ? কখনো হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে ? এসব ফাঁকি, এসব যুদ্ধের বোমা, এসব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামি, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। ছাতের আলসেয় উঠবার সময় হীরেন তাকে আটকায়। এত এলোমেলো কথার পর এত রাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

'আমি যদি মরি তোমার তাতে কি ?' লক্ষ্মী বলে ঝাঁঝের সঙ্গে ছাড়া পাবার জন্য লড়তে লড়তে হীরেনের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দেয়। হীরেন জানে লক্ষ্মীকে, ভালভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদ কাঁদ হয়ে সে বলে, 'তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।'

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। 'নিজের কথাই ভাবছি ? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।'

'ভালো ? তুমি মরলে আমি বাঁচবো ?'

'বাঁচবে না ? আমি মরলে তুমি বাঁচবে না ? দাঁড়াও বাবু, ভাবতে দাও।'

বাঁচবে না ? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেনও মরবে অন্য কোনো রকমে। তাই হবে বোধহয়। যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ এগার বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বল তো। একটু ঘুমবো আমি।' ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজগিজ করা ছেঁড়া তোশকে হীরেনের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেনের কথা শোনে।

'সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী ? আমি বুঝেও বুঝিনি। যা করা দরকার করেও করিনি। মাছিমারা কেরানী তো। এই রকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।'

'ওমা, কিসের সময় ?'

'তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বে না—'

'আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে ?' লক্ষ্মী রাগ রাগ করে বলে, আমি যাই নি। কিসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।'

সাতদিন সময় চেয়ে নেয় হীরেন, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে দুঃখে ম্লান হয়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে লোকটার।

রাত নটায় হীরেন বাড়ি ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দু'জনে এক-সাথে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত এগারটার সময়! লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে?'

'পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভূপেন আর কানাই আমারই মতো কেরানী, চেন তো ওদের? ওদের বাড়িতে! ভালো কথা, কাল ভোরে ওদের বৌরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বউ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।'

'না ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওদেরও যাতে তেত-লার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।'

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারটি কাচ্চা-বাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরিতরকারি, বোতলে ভরা সরষের তেল, ভাঙা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধমণ কি পৌনে একমণ কয়লা। কচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হলো হীরে-নের শোবার ঘরে। বাড়তি ছোট ঘুপটি ঘরখানা সাফ করে রাখা হলো চাল ডাল তেল নুন তরিতরকারি। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেনদের রাত্রের এঁটো বাসন মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলি চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড় স্যস-প্যানটা।

'আমাদেরই কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দু'জন ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী? জানি খাও। কে না খায় চা?'

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন দ্যাখে আবোল-তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা তা কথার ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশেপাশে থাকে। তার মতো গরিব কেরানীর বৌ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোট ঘরটায় জমা করেছে নিজেদের সঙ্গে আনা জিনিসের সঙ্গে।

লতিকা বলে, 'বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ির খাওয়ার জিনিস বাসনপত্র জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘর ছোট হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাঁড়ার ঘরের কাজ

দেবে।'

মাধবী বলে, 'মস্ত রান্নাঘর। দু'শো লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।'

অলকা বলে, 'ভালোই হ'ল, তুমিই দলে এলে বলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরও কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা নেই ভালো মতো, না ভাঁড়ার না রান্নাঘর, কি যন্ত্রণা বল দিকি।'

অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেনের কাছে জবাব চায়।

'লাগবে না? চারবাড়ির চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চারবাড়ির একদিনের কয়লা খরচে চারদিন না চলুক, তিনদিন তো চলবে? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চারজনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে একজনের গেলেই চলবে। চারজনের রাঁধার বদলে একজনের রাঁধলেই চলবে—চার দিনে তিন দিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূর থেকে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে? চার পাঁচ হাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা ভাত খাওয়ার বদলে দশ বিশ হাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাত। তার তুলনায় সুবিধা কত।'

লতিকা আজ রাঁধবে। একা যখন ছিল, নিজেদের বাড়িতে রোজ রাঁধতে হত, এখন একদিন রাঁধে সে তিনদিন ছুটি পায়। একদিন মানুষের খাওয়ার মতো কিছু যদি রাঁধত তো দু'দিন কি রাঁধবে, কার পাতে কি দেবে ভেবে পেতো না—আজ সে ভালো মাছ তরকারি রাঁধতে পেরেছে কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই।

তিনদিন পরে এই চারটি অনাত্মীয় পাড়াপড়শী একান্নবর্তী পরিবারের জন্য রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিনদিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবান্না না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোর খাটুনি ঢের বেশী রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, 'লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই আমায় বাঁচালি।' লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিনজনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা দুটোকে সে দুধ খাওয়ায়। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল ক'দিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজী নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।

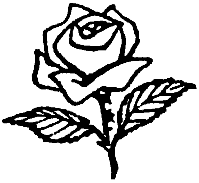

বাগদীপাড়া দিয়ে

ভরদুপুরে দুলে বাগদী নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মতো যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। অনেক তেল আর অনেক স্নেহে পাকানো সেই লাঠি, কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে রক্ত মেখে পোক্তও যে হয় নি এমন নয়।

লাঠিটা হাতে নিয়ে দুলে সেই সকালবেলা বাগদীপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকূল তার নালিশ নিবেদন কানেও তোলে নি। তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিল: 'শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনব'খন'।

শ্রীমন্ত বলেছিল, 'কিরে দুলে! বুড়ো বয়সে আবার কোনো ছুঁড়ির সাথে 'অং' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি? এখন বাবু আমি বড় ব্যস্ত। আমার বাড়ি যা, পরের বেড়াটা ভেঙে গেছে, সেরে দিবি যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।' পুবে হেলানো গাছে মাথা ঘেঁষা সূর্য তার মাথার উপরে আকাশে মাঝখানে চড়া পর্যন্ত দুলে নায়েববাবুর বাড়িতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়িতে চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুরি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান এবং সেইজন্যই দুলে বাগদীপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদার আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগদীপাড়ায় প্রধান করেছে। বেগার তাকে খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগদীপাড়ার মেয়েমদ্দ কারো বেগার না খেটে রেহাই নেই।

অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, 'একটু বোস বাবা। চট করে নেয়ে খেয়েনি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভালো করতে করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম।'

দুলে সেই থেকে বসে আছে। মাঝদিনের মাথার উপরের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কি। গ্রামের বাইরে যেখানে মেয়েদের পায়ের আধখানা মলের মতো বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলাজঙ্গল ভরা জমিতে বাগদীপাড়া,

সে পাড়ার সে প্রধান। সেটা তো বেলগাছের দেবতা জমিদার আর নায়েববাবুর দয়াতেই। তার রাজ্যে, ওই বাগদীপাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এভাবে শ্রীমন্তর বাড়ি এসে বেগার খেটে ধন্না না দিয়ে তার উপায় কি। তার রাজ্য যে যায় যায়।

খাটুনি, খিদে আর মনের কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। অর্ধেক দিন প্রতীক্ষা করাল. একবেলা বেশী বেগার খাটাল, একমুঠো গুড়মুড়ি পর্যন্ত জল খেতে দেয় নি। এত বেলায় এসে তাকে বসিয়ে রেখে নিজে আরামে নাইতে খেতে গেল। তা হবে বৈকি, বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা!

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকো টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জল চৌকিটাতে ধপাস করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'চটপট বল দিকি কি ব্যাপার। প্যানাস্‌নি, এক কথায় বল।'

'তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।'

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠে ঘুমপাড়ানী ছড়া শোনে—

'আয়রে ঘুম যায়রে ঘুম
বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দীদের ছেলে ঘুমোল জাল মুড়ি দিয়ে—'

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে দুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলে, 'তবে তুমি ঘুমোগে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।'

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে বলে বসে, 'রাগিস কেন? তুই আর আমি কি তফাত? তুই আমার পুত্রতুল্য। আমি হলাম তোর বাপ। বাপের পরে কি গোসা করে রে ব্যাটা? কি বলছিস বল।'

'বলব কি?' দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, 'একদল বদবেজাত যে বাগদীপাড়া নষ্টাৎ করে দিচ্ছে সেদিকে তুমরা গা করবে না? কারখানায় খাটতে যায় সব্বোনেশে গুনো, বাগদীসমাজ ছারখারে দিলে! কি বলে শুনবে?'

'বল না, শুনি।'

'বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ। মোরা ছোট কিসে?'

'বলে তো হয়েছে কি?'

'হয়েছে কি? ঠাকুরের থানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে!'

ঠাকুরের থানের এই অপমানের কথা উচ্চারণ করতে হ'ল বলেই নিজের দু-কান মলে দুলে শিউরে ওঠে।
'বলিস কিরে। কবে কাটবে ?'
'অনেকে গুঁইগাই করছে, তাইতে ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজী করাচ্ছে। বেশিদিন আর সামলানো যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত কর।'
বাগদীপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যেই। প্রতি বছর বর্ষায় জলার জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আরেক বর্ষার আগে শুধু কিছু দিনের জন্য খানিকটা সরে যায়। তফাতে নিচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু—আগে ওইদিকে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষার জল পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, সে কতকাল কারো আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক জায়গায় হাত ত্রিশ লম্বা, দশ বারো হাত চওড়া এবং পাঁচ-ছ হাত উঁচু একটি বেদী বানায়, ইঁট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগদীসমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদী স্থাপন করতে হবে। এবং এমন আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাদেশের খবর শোনামাত্র জমিদার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে টাকা আর লোক দিয়ে তাড়াতাড়ি বেদীটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগদীদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলা ভরে উঠবার পর বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে চিরদিনের মতো বেরিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঢুকে জমা হতে শুরু করেছে।
ঠাকুরের বেদী জল আটকানোয় জমিদারের কি লাভ হয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ, সবাই জানে। তবে এসব ব্যাপার জেনেও না জানাই নিয়ম। বাগদীপাড়ার মঙ্গলের জন্যই খরচপত্র করে জমিদার ঠাকুরের থান বানিয়ে দিয়েছে এটা সত্য বলে মানাই নিয়ম।
শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, হাই তুলে বলে, 'কি বলে জপাচ্ছে ? ঠাকুরের থান তো বেগার তেভাগা নয় ?'
দুলে তার ঝাঁকড়া চুল পেছনে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পাল-পার্বণে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে যখন সে পাগলের মতো মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে।
'শোন তবে কি বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতে মোর গা কাঁপে। বলে, মোরা খাঁটি খাই, ছোট কিসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম মানবো নাই।'

'সজ্জাত কি রে ?'
'ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তার চেয়ে উঁচু জাত, ভালো জাত।'
'ও, সৎ জাত ! উঁচু জাত !'
দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়—'হ্যাঁ, সজ্জাত। বলে বম্ভাণ্ড সংসার পাল্টে গেছে বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস্ আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন ? না, তারা চোর ছ্যাঁচড়। কেন ? না যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর-বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত !'
বলতে বলতে দুলে বাগদী কেঁদে ফেলে, 'কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ি মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো। তুমরা এর বিহিত কর।'
ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। দুলের বিবরণ শুনে বিশেষ সে বিচলিত হয় না। বাগদীপাড়ায় আবার বিদ্রোহ। জোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদপি বেড়েছে এই পর্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে ঢিট হয়ে যাবে। সমাজের মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। সেজন্য দুলের নালিশের প্রতিকারের ব্যবস্থা একটা করতে হবে। কিন্তু দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার। মাতব্বরের এতটা নরম হলে কি চলে ?
শ্রীমন্ত ধমকে বলে, 'কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলের মতো কাঁদতে লেগেছে। সাধে কি তোকে কেউ মানে না ?'
দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলে, 'তোমরা হলে মা-বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে কাঁদতে পারি। না তো দুলে বাগদী কেমন মরদ দশটা গাঁয়ের মানুষ জানে।'
শ্রীমন্ত একটা অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ করে বলে, 'মরদ যদি তো ওদের ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা ?'
'উই তো মোর পোড়া কপাল !' আবার, হাঁউমাউ করে ওঠে দুলে, 'তোমরা বুঝবোনি। ই যে সামাজিক অমান্য গো, জেতের ব্যাপার ঠেঙাব কাকে ?'
সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার চেষ্টা কি আর করে নি দুলে, কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি ? যাদের জাতে ঠেলবে, একঘরে করবে, তারাই যে বর্জন করেছে যে-ক'জন দুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাঁকা দেবে, তার উপায় কোথায় ? ওরাই যে উলটে তাদের পিটিয়ে দেবার মতো দলে ভারি। দুলে বরং জাত-ধর্ম ঠাকুর-দেবতা চিরকালের রীতিনীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে, কারণে, অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব ফুর্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেয়ে-মদ্দের মেলামেশার নিয়মনীতি আরও শিথিল করে, কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায়

রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—'মোর আর ক্ষেমতা নাই, ইবারে তোমরা বিহিত কর।'

শ্রীমন্তের ঢুল আবার আসে। সে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সে হবে'খন। ভারি সব মস্ত লোক, তার আবার বিহিতের ভাবনা। কে কে পান্ডা হয়েছে নাম বল তো? বিশে? শিবু? ..'

উপরে ভাদ্র শেষের মাথা ফাটা রোদ, তলায় বর্ষার পরিপূর্ণ জলা। পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাব উঠছে। বাগদীপাড়ার দিকে চলতে চলতে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায় ঝাপসা দেখতে থাকে দুলে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক! তার প্রতিপত্তি তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে বাগদীপাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাতেও দুলের আপত্তি নেই। তার সমস্ত দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়—সঙ্ঘাত যারা তারা তার শত্রু, তারা ধ্বংস হয়ে যাক, দেবতার রোষ পিতৃপুরুষের কোপ জমিদার পুলিশের ক্রোধ হয়ে এসে তাদের ধ্বংস করে দিক। মনে মনে দুলে অনেক কিছু মানত করে।

বাগদীপাড়ার জল কাদা শীতকালের আগে শুকোয় না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নিচু জমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে কোনো মানুষ যেখানে কখনো থাকে না। বহুকাল আগে বাগদীরা যখন রাজার হয়ে লড়াই করত তখন রাজা জমিদারের প্রজা ঠেঙানো লেঠেল পুলিশ আর বেগার-দারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, নামমাত্র একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে তারা আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির টুকরো নানাভাবে খসে গেছে তাদের দখল থেকে, বৃত্তির বদলে পুজাপার্বণে চিঁড়ে মন্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগার খাটা আজও ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের কিছুটা দুর্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখার জন্য খাওয়া পরা চলাফেরা ধর্ম-কর্ম সমাজ গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্বর রীতিনীতি ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই যে সেদিনও ছিল, যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচন্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধানিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকের হয়ে এসেছে পুরানো অচল সমাজ-ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারে বদ্ধ পশুগুলি। তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগদীপাড়ার পচাই খাওয়া, মেয়ে-পুরুষে যথেচ্ছাচারী, ব্রাহ্মণের ছায়া ভীরু, অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল, মারামারিতে পটু, ক্ষেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগদীদের উঁচু তলার মানুষের আচার-নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগ করার ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—রাজার জন্য লাঠি হাতে খুন করতে

খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে। আজকেই এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। দুপুরে এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগদী মেয়েপুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—একপাশে চার পাঁচ হাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদীতে। এ কি দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর? এ কী সর্বনাশ ঘটালে? বাগদী সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ি আর নায়েববাবুর বাড়ি ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলটপালট হয়ে গেল? অপরাধ কি হয়েছে কোনো? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে কসুর করে নি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিসফিস করে শিস্ দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে।
উম্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দুলে চিৎকার করে: সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে! ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি?'
শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবুদের ঠাকুর ঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকাশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।'
'পালা! পালা সব! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা!'
সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। দুলালী কাঁচ বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত ধর্ম সব নষ্ট করেছে। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, 'আরে বুড়ো তোর মরণ নাই? খপর দিছিস? বজ্জাতি করে খপর দিছিস?'
দুলালীর খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তার রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ্ধ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

স্থানে ও স্থানে

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো।

বুক যার ছোট হয়ে গেছে ভয়ে, উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা হয় ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ হয় প্রশ্নের সঙ্গে, তার ঝাঁঝ আরো বেশী।

পালাব কেন? নরহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু' একজন তাকে যারা ভালো করে চেনে, বিশ্বাস করে।—সেকি, এখন আনবেন? পনেরই আগস্ট যাক্? দু'একমাস দেখুন কি দাঁড়ায়, নিজে থাকেন আলাদা কথা, এ সময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটের দায়ে থাকতেই যখন হবে, দেরি করে লাভ কি। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভালো. তাতে মনের জোর বাড়ে।—নরহরি জবাব দেয়।

স্টীমারে অসম্ভব ভিড়।—পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ স্টীমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গরুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি শৃংখলা সামঞ্জস্য ছিল নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখে মুখে নড়াচড়ায় কথা বলায় ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে, একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমাসংখ্যাহীন অচেতন আদান-প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয় বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনা যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেনে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ বারো জন ডাকাত, সকলেই অস্ত্রধারী, দু'জনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়িতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না, ডাকাতেরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের স্টেশন থেকে ছাড়ার পর গাড়ির গতি একবার মন্থর হয়ে আসে, লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। ঠিক ওখানে দু'টি স্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জন জায়গায়, গাড়ির গতি এরকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ত পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ি যারা চালায় তাদের। গয়নাগাটি সব সংগ্রহ করে একটি তরুণীকে সাথী করে নির্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধহয় তাদের ছিল। কিন্তু উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়ে-

টির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে আহত করে অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি নেমে পালায়। একদল যাত্রী হৈ হৈ করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের গুলি তাদের ঠেকাতে পারে নি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।
এটা জানা ছিল না নরহরির, সে শুনেছিল অন্য কথা। এসব নিত্যকার ঘটনা আর এরকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেরে পড়ে থাকে বা বসে ঝিমোয়। শেষটা তাহলে সত্যি নয়।
শিয়ালদায় গাড়ি পেঁছিল দেরিতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে নরহরি একবার তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত শহরের স্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে এই শহরটির প্রতি, তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ উত্তেজনা স্বপ্নের সমারোহে বিয়েবাড়ির আলো আর সানাইয়ের তানে সুমিত্রাকে বাপের বাড়ি আনা নেওয়ার বিরহ-মিলনের মাধুর্যে কি প্রিয় ছিল এ শহর তার কাছে। ক'দিন আগেও ছিল। প্রিয় আর রোমাঞ্চকর তারই জমজমাট গৌরব। ঢাকায় বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুশি হয়ে অনুভব করেছে তার নিজের চঞ্চল রক্তের তাপ। ছাত্র অভিযানের জয়, লাখ নাগরিকের মিলন-অভিযানের জয়, ধর্মঘটের জয়, মিলিটারী অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়, জয়ের পর জয়। তারপর যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায় মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নরহরির কাছে শহরটিকে অপ্রিয় ঘৃণ্য করে তুলতে পারে নি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতর হয়েছে।
আজ সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে, অন্তত-পক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে এ শহরের হিন্দু-মুসলমানরা। তার সে ভুল ভেঙে গেছে। এ শহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদের আস্তানা।
সুমিত্রার বাপের বাড়ি পর্যন্ত হয়তো পেঁছিবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো বাবা এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তারটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভালো আছেন? কবরেজের ওবুধ খেয়ে কমেছে একটু?
মা পুরী গেছেন ওমাসে।
ওঃ! তা ভালো আছেন তো? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা পড়ছি বাবাজী, মাথা ঘুরে যায়। উড়িষ্যার ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙালী মেয়েদের

ওপর অত্যাচার করছে।

মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হ'ল।

বড় শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতী বাঙালী মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুণ্ডারা খাবলা দিচ্ছে বাঙালী মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার শুরু করছে, কি বিপদ ভাবতো!

মেজ শালা শ্যামল বলল, দুটো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আজ, জন্মে ভুলবে না। মুড়ি মুড়কির দোকানের ওই অর্জুন আর সতীশবাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুর ঝি আর অর্জুনের বৌটাকে ছেলেরা ধরেছিল। তা আমরা ভেবে দেখলাম কি, যতই হোক আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত হবে না। ভেবে চিন্তে তাই ছেড়ে দিলাম। জানো নরহরি, ভদ্র হয়েই আমরা আজ বিপদে পড়েছি। ওদের মেয়েছেলেদের ওপর যদি অত্যাচার চালাতে পারতাম ওরা ঠান্ডা হয়ে যেত।

নরহরির খিদে পেয়েছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদর অভ্যর্থনা হয় নিখুঁত। বড়লোক নয় নরহরির শ্বশুর, অথচ ভেজিটেবিল ঘিয়ে ভাজা লুচির সংগে সন্দেশ দেওয়া হয় তাকে জলখাবার। ঘরে তৈরি মিষ্টি ছানা নয়, দোকানের দামী সন্দেশ। খাবারের দোকান সব বন্ধ, তবু।

কার ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, তার বাচ্চাটার আওয়াজের মতোই যেন মনে হয়!

শালী সুষমা তাকে শান্ত করছে, চুপ্ চুপ্, শীগগির চুপ—মুসলমান ধরে নেবে!

পাল্টা ছড়াও শুনেছে নরহরি চুপ্ চুপ্, শিখ আসছে।

তা দুমুখী ক্রিয়ার দুমুখী প্রতিক্রিয়া হবেই।

অতুল সাবধান করে দেয়, কাজ না থাকলে বেরিয়ে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা করে বলে, বেরোনো মানেই প্রাণ হাতে করে যাওয়া। এখানে হাংগামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হয়তো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুশকিল ওইখানে, পরিমল বলে সায় দিয়ে, কোনো এলাকাটা সেফ্ নয়, জানাটানা থাকলেও বরং খানিকটা—

নরহরির মুখ দেখে ছোট শালা অমল বলে, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মায়া আছে। দরকার থাকলে বেরোবেন, যেদিক সেদিক ঘুরবেন না, ব্যাস্।

তুই তো বলেই খালাস—পরিমল চটে বলে জামাইবাবু জানবে কি করে? ব্যাটারা ট্রাম চালু রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই? ব্যাটাদের এরিয়ায় ভুল করে ঢুকলে সংগে সংগে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিয়ায় ঢুকলে সন্দেশ খাইয়ে দাও না?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো ছোঁড়ার বিশ্রী

গা-জ্বালানো কথাবার্তা।

নরহরি সবিনয়ে বলে, বেরোবো আর কোথায়, দু'একটা জিনিসপত্র কেনা। কারো সাথে দেখা করার সময় হবে না। গোছগাছ করে দিনে দিনেই স্টেশনে চলে যাব সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি ? পরিমল বলে।

চিঠি পান নি।

চিঠি তো পেয়েছি। মানে বাপু বুঝতে পারি নি চিঠির তোমার।

মাথা খারাপ না হলে কেউ—

থাক্, থাক্। অতুল বলে হবে'খন ওসব কথা নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ওবেলা বসে পরামর্শ করা যাবে। আজ তোমাদের যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া কর, মাথা তোমার ঠান্ডা হোক, ওবেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব। এ রাজনীতি নরহরি জানে।

আরও ঠান্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখার সময় ভেবেছিলাম দু'একদিন থাকতে পারব। সে উপায় নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

স্টেশনেও ঠিক করে নি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে শহরের সন্ত্রস্ত চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিত মৃত্যুদানের ঘটনা, এ বাড়ির হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আসছে। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কি বল তো ? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না পারে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে !

যে পারে সে-ই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা অনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে! শ্যামল হেসে বলে, তোমার তাড়াহুড়োটা পড়ল কিসে ? টিঁকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন ?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলটপালট হচ্ছে তো চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে। এঁদের না নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পারে আমার।

সে কি!

তাই তো স্বাভাবিক। ঘরসংসার পেতে যারা আছে, তারা থাকতে চায়. তারা নিশ্চয় প্রেফারেন্স পাবে। আমি বৌ ছেলে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়, পালাবার জন্য

এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন ?

বলেছে নাকি ? তোমার তো হিন্দু আপিস। হিন্দু হয়ে কর্তা তোমায় একথা বলল ?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ওদেশের লোক হয়ে ? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে ? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে, তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে ?

যায় যাবে অমন কাজ। শ্যামল বলে বীরের মতো, চাকরির জন্য বৌকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সী মেয়ে বৌ একটিকেও ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সী মেয়ে বৌকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন যদি যান, তার একটি মোটে বাড়বে।

ওসব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কি। কলকাতায় চলে আসবে, একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ি ফেলে চলে আসবে ? আপনাদের তো হাজার হাজার লোকের চাকরি যাচ্ছে, চাকরি কে দেবে আমায় ?

সে যা হয় হবে, উপায় কি ! তাই বলে—

আপনি তো বলে খালাস।

সুমির মতো অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধহয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোক, এর মেয়ে আর ওদের বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হ'ল। সুমিত্রা তার বৌও বটে, শত শত বৌয়ের কি হবে না হবে একথাটা সে কেন টেনে আনছে তার নিজের বৌয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এরা। একটু স্তম্ভিত হয়ে গেছে তার কথাবার্তায়।

তোমার মতলব ভালো নয় নরহরি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকরি রাখতে চাও।

অতুল অতি কষ্টে বিবাদ সামলায় স্ত্রীর সাহায্য পেয়ে, সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলায় আওয়াজ পেয়েই নরহরির শাশুড়ী হলুদলঙ্কা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছিল দরজার আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকে নি, এবার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝনাৎ ঝনাৎ চাবির রিঙের আওয়াজ করল তিন চারবার পিঠে আছড়ে আছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবার আগে নরহরি ঘোষণা করল, হাজার হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুমুড়

এ তো জানা কথাই !

গুম খেয়ে যাবে ঠিক করেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুমুড় হই আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথার চেয়ে তার কথার বেশী জ্বালা ধরে বাড়ির লোকের গায়ে।

পার্কসার্কাসের আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য যে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলে গায়ে জ্বালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে—এ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে !

তুই চুপ কর ! কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ায় সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধা বাড়া খাওয়া-দাওয়া ঢিমে তালে চলেছে। আজকের গাড়িতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নরহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ির লোক জানে শেষ পর্যন্ত নরহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু' একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারে নি সমস্যার আগামাথা। নরহরি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে। হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালোমন্দ হিসাব করেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবে না ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে—বাঙাল তো। সেবার ওর বড়-খোকার চিকিৎসা করছিল এ পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের এলোপ্যাথি ডাক্তার— শ্বশুর-বাড়িতে পা দেবার দু'ঘন্টার মধ্যে।

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে চিকিৎসায় বিশ্বাস করি, সেই চিকিৎসায় মরুক।

কি কাটা কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান করুন কিছু যদি ভালোমন্দ হত ছেলটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নরহরির ? কী আপসোসটাই তাকে করতে হত গুরুজনের কথা না শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করার জন্য !

তাই, তাড়া না থাকলেও বারোটার মধ্যে খাইয়ে দেওয়া হ'ল নরহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওয়া হ'ল শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বৌদিদিদের হেফাজতে।

ঘন্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা না ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু

সুমিত্রা ভাবল কি, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসার এ সুবিধাটুকু না ছাড়াই ভালো। আগে বোঝাপড়া হোক, নরহরি স্বীকার করুক এখনকার মতো বাপের বাড়িতেই সে তাকে রাখবে, তারপর হাসিমুখে নিজেকে সে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয় নি ? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না হলে চলবে কেন মেয়েমানুষের।

এসেই ঝগড়া শুরু করলে ? বেশ তুমি। পান চিবনো বন্ধ রেখে পানরাঙা ঠোঁটে হাসে সমিত্রা, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয় আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালেয় ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম ? আশ্চর্য হয়ে বলে নরহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায় নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবেন না। তোমায় আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাই, তাতে ওদের কি ?

মনে মনে একটু চটে যায় বৈ কি সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ মা ভাই বোন যে গো। ভাবনা হবে না ?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কি যে বলে। তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি রাস্তার লোক ? বাপভাই বুঝি রাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয় ? আমি বুঝি রাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধে হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ, অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলটপালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জন নিরিবিলি মাধুর্যের ভূমিকা পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যায়।

আমি তো আজকেই যাব ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে ?

তবে কি ? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

ক্রমে কলহ এবং কান্না। এসব আগে হয়েছে অনেক, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। এ অস্ত্রও তেমন ফলপ্রদ নয় দেখে আবার মিষ্টি হয়ে উঠে নরহরির বুক আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কত নিবিড়, কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানের পিতামাতার ভালবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বলো, নরহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মতো করে বলল, আজ না গিয়ে পরশু যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমায় যেতে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব ?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এ ছেলেখেলা নয়, নরহরি বলে, রাগ অভিমানে কথা নয়। যদি না যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকী জীবনটা বাপের বাড়িতেই কাটাতে হবে তোমার—বিধবার মতো।

আমায় নয় মেরে ফেল তুমি—আর্তনাদ করে উঠে সুমিত্রা, রাত বিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুশি করবে আমায় নিয়ে, তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফেল নিজের হাতে!

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নরহরি। বিষন্ন বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোট একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়িতেই বোধহয়, তার ছেলেটার মতো গলা। অন্যের কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধহয় কাঁদছে।

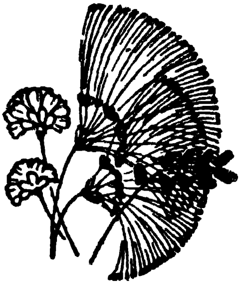

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্ধ-উলঙ্গ মূর্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু'চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অত্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্ধ-উলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারা শূন্য? এটা ধাঁধার মতো লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে স্ফূর্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গা-ঘেঁষা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলাভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু'তিন হাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেখানে সেঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেন্টের ভিত্তির আধহাত উঁচুতে গোলার মাটি লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে শুরু করে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে সিঁদ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভান্ডারে। ছোটখাট গর্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুর ঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস-জ্বরের শান্তি ঘটিয়ে অন্নপথ্য করবে সে আর বঁচি।

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু'চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য!

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কিসের পরিহাস! কালও ধান ছিল গোলায়, কি করে কোথায় উধাও হয়ে গেল ধান? পাপী সে চোরছেঁচড়, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা?

মন্ডল [illegible]রা ভৌমিকেরা ভোরভোর গাঁ-সুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ হালদারের ধানে[illegible] [illegible]লায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসী মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা

ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল। সব মিথ্যে হয়ে গেল।
নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু'চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরলো না তার দুরদৃষ্ট, শ' দেড়শ' মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে।
সোনা মণ্ডল আপসোস করে বলে, রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না? শুধু পরামর্শই হ'ল, কেউ নজর রাখলে না? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ি—
ঋষি পাঞ্জা বলে, কেন গেলে? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুমবাড়ি যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে?
ঋষি তোকে আমি—আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।
পরাণ ভৌমিক বলে, কেন ধমকাবে ওকে? দায়িক মোরা সবাই নই? রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে। মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশো মণ ধান সরাবে?
তা বটে, হক্ কথা।—চোখের নিমিষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক কি ব্যাপারটা বল দিকি, এ্যাঁ! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান?
এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে বুড়ো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধা যাই হোক, ভুল যাই হয়ে যাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা যায় বুড়ি কচি মেয়ে পুরুষ যে আছে তার বাড়িতে—আগুন দিয়ে ছাই করে দেওয়া যায় তার বাড়ি। পাকা দালান তো তার একটা ভিটের তিন খানা ঘর, বাকি বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউদাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।
কিন্তু তাতে তো আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।
ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপসোস বুকে নিয়ে, মিছামিছি হাঙ্গামা করা স্বভাব তাদের নয়, বাংলাদেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারের কি দুর্মতি হ'ল, কি খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরি করার, গোমস্তা সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু'চারটে ধমক ধামক দিতে!
ধান পেলে সোনা মণ্ডল? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে বলল নারায়ণ তার ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায়?
ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম হয়ে গেল গাঁয়ের শ'দেড়েক পুরুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকালো জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।
গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার

দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।
আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল ?
ধান কোথা গেল নারাণ ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোর গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো করে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো করে ধরল তার বুকের ফতুয়া, আনল সবার মধ্যে।
ধান কোথায় গেল ?
আমি—আমি—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।
এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকেও আটকাল।
বলল, দূৎ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।
সুবল মশাল জেবলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারের গোয়াল ঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।
কি পোড়াবী ? ঘরবাড়ি ? ঘরবাড়ি কি শত্তুতা করেছে মোদের সাথে ? ঘর পুড়বে মিছিমিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারি এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাই-কিশোরীর নামটা।
সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশা-ভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়িমরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আম-বাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু ধাওয়া করে। তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকুল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।
সোনালী তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারী সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দপুরের বোঝাই বাসটা চলে গেল। আজ দেরি করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গা ঘেঁষে বাসটা বেরিয়ে যায়, ওঠানামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।
বাসটা যেন থেমেছিল এদিকে রাস্তাটা যেখানে বড়পাড়ার বড়বাড়ির আড়ালে। টিনের ছোট বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যবসা উল্লাসের, অনেক উকিল-মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশী উপার্জন। সম্প্রতি এগারজন চাষীর নামে একদিনে হালদার সতেরটা মামলা শুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম্।
জমায়েৎ দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদার বাড়ির সামনে ভিড় জমাটা

শুভ চিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষগুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার আগুন। সোনা মন্ডলের গালে চড় মেরেও কুন্ডু ছুটে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদের মানুষ, সাথে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মতো ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ওবেলাই হয়তো দেখা যাবে সোনা মন্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড় রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জন করে ওঠে আড়াইশো লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মন্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠান্ডামাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দি-ফিকিরের জাল বোনা, মানুষের পর মানুষ পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির ভেজা ঘাসে চিৎ হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন পলকহীন চোখমেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিলপত্র, নোটের তাড়াটা পর্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানলার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক ধ[illegible]টা পর্যন্ত থরথর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিনু, ছেলের বৌ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার-গিন্নী মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিঁদুর মাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁত চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই জোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনো এল না নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনি বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মতো। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে, ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরেই যেত ধৈর্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ি চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসে নি, কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশী আর কিছু করার কথা ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরানো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল, এ প্রশ্নের জবাব হালদারের কাছে আদায় করার সাধ জেগেছে। জবাব চাই, ধান কি হ'ল। জবাব দিতে হবে হালদারকে!

উঠানের দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়,

হালদার মশায়।

দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারো সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানলার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড় মেয়ে বিনুর ভয়ার্ত মুখ।

বাবা বাড়ি নেই।

বাড়ি আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশাইকে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড় ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুক কি হবে? আরও ক্ষেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানলায় দাঁড়ায়। বলে, কি চাই সোনা মণ্ডল?

গোলার ধান কোথা গেল? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে? কখন বেচলে?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ!

জানলার পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড় ছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানলা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশো মণ ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায় নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায় নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবি করেছে।

শুধু দু'জন ভেতরে আসবে—এই শর্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধসেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুশি হয়ে বলে, আ মর! কোথাকার কুড়োনো চাল?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড় বৌ, হাঁড়ি থেকে আধসিদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে তুলে কোঁচড়ে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরি এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর, দশজন লোক নিয়ে। সরকারী রাস্তায় থেমেছিল লরি।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরিটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ির কাছে, হাতে হাতে গোলার ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরিতে, আবার ঠেলে লরি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড় রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরিটা, ধান-চাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনো মরিয়া হয়ে ওঠে নি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরির চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গত রাত্রির আনা-

গোনার নতুন দাগ।
জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনোটাতেই যায় নি ধান নিয়ে লরিটা, বড় সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশ-ডাঙ্গায়।
ধান-চাল চোরা চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর।
জানে অনেকেই, এক রকম প্রকাশ্যভাবেই চোরা চালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে, সরকারীভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।
টিনের চালা, সিমেন্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল পড়েছিল মেঝেতে, চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায়, গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনো মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয় নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোট ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদাম-ঘরে তুলতে যে কটি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।
ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল, তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড়চোখে চেয়ে হাসে। রাজু তার শীর্ণ মুখে খুশির ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটি বেশী শস্য ছিটিয়ে দেওয়া।
ছোট ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়েপুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধানচালের গুদামটির গায়ে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয় বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না তার, পয়সা নিয়ে দুফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়। এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান, দশ টিনে দু'টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে ঠাট বজায় রাখতে হয়। বাকিটা নির্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।
নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পৌঁছে দিবি ধান।
মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না?
দুত্তোরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কি হবে? কোন্ শালা কি করবে?
তা ঠিক, কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না, সবার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে

চোরাই ধান-চাল চালান দেওয়া যায়।

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে, কিছু বলে না।

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের তো এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই, জৈনুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদামে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদামে কি আছে না আছে, তোমার তাতে কি?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চিৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙায়! বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো। দারোগাবাবু আসুক। ধান রয়েছে, আসামী রয়েছে, এ তো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকান্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কি ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলিভাবে এখান দিয়ে ধান চালের বে-আইনী চালান চলে আসছে যে, লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইন-সঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিটপিট করে। এ অঘটন তার কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল, সেটা সে গ্রাহ্যই করে নি, থানায় খবর গেছে শুনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যে ভাবে চারিদিক ভেঙে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুশির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ এসে তাকে কিভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারায়ণ। কিছু তার হবে না শেষ পর্যন্ত সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে তার হৃৎপিন্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতার এই বিরোধী মূর্তি জীবনে সে কখনো দেখেনি।

বিধুভূষণ ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, হয়েছে কি! ভিড় কিসের!

বলে ধান? চোরাই ধান ধরা পড়েছে? তাই নাকি। তা এত ভিড় কেন?

বলে, কি হে পরাণ, ব্যাপারটা কি?

আমি কি জানি, নারায়ণ বলে, কর্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনেছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে, বিধুভূষণ লোকটার মূর্খতায় সে চটে যায়! কর্তাকে আবার টানার চেষ্টা কেন এর মধ্যে? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তার কর্তা, কে ধান পাঠিয়েছে!

সুধীর কানাইদের বলে বিধুভূষণ ওহে তোমরা ভিড় ভাগাও, তোমরা যাও, ধরিয়ে দিয়েছো, এবার যা করার আমায় করতে দাও।

সুধীর কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীর বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নাম টাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুরুন !—একজন চেঁচিয়ে বলেন।

ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীরদের দিকে, পিছনের জনতার দিকে, দু'চার বার তাকায়, তারপর নারায়ণকে বলে, গুদামটা খোলো তো হে। কত ধান আছে ?

দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বাইরে থেকে তালা এঁটে সিল করে দেওয়া হয়, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীর নাম ধাম, তারপর একজন পুলিশকে গুদামের সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায়।

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

সেইদিন জগৎ কুন্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয় জোনেসের বাংলোয়। জোনস একা থাকে, তার মেম থাকে কলকাতায়। শহর ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল করে তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড় মুস্কিল হয় টাকার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলে।

পরদিন দেখা যায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নারায়ণ। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানার কাছে এক চালা ঘরে চালান হয়ে যায়, সেঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয়। খড়ের চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার হ'ল ?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজ খবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। কান্ডাকান্ড জ্ঞান আছে তোমাদের ? লাইসেন্স আছে নারায়ণের, জগতবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারায়ণেরও বুদ্ধি বেশি, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেন্ট সরকারের, জগতবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেন নি, সে খবরটাও তুই জানিস না ?

ধানটা তাহ'লে সরানো হ'ল কেন ?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা যেন যা' হানা দাও নারায়ণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেফাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এ যুক্তি ভালো। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

মেজাজ

চা আর ডিম ভাজা এসেছিল দু'জনের জন্য, মনোরঞ্জন নিঃশব্দে দুটি প্লেটের ডিম ভাজাই নিজের মুখে পুরে দিতে থাকে! এককালে সে দারুণ কংগ্রেসী ছিল, আজকাল একেবারে চাষাভুষো বনে গেছে। অনেক দিন পরে তাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছিল। ভাষাহীন ক্ষিদে দিয়ে এত সহজে সে-ই শুধু চোখের পলকে আত্মীয়তা ঝালিয়ে নিতে পারে। চাষাভুষো বনার কারণও বোধহয় তাই।

ডিম শেষ করে সে বলে, 'তোমার তাকানি দেখে ভৈরবকে মনে পড়ছে। সেও এমনিভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে মানুষকে বিব্রত করে!'

'তোমাকে মোটেই বিব্রত বোধ হচ্ছে না। কিন্তু ভৈরব কে?'

'লক্ষ্মীপুরের একজন চাষী! তার মেজাজের অদ্ভুত গল্প শুনবে—'

'গরিব চাষী?'

'দেড় দু-বিঘে জমি হয়তো আছে। তাছাড়া ভাগে চাষ করে।'

'গল্পটা বলার আগে তবে একটা সংশয় মিটিয়ে দাও। মানুষটা চাষা, তাতে গরিব, তার মেজাজ হয় কিসে? জমি নেই, ভাত নেই, আরাম বিরাম স্বাস্থ্য নেই, দেশের মালিক সরকারের কাছে দূরে থাক গাঁয়ের মালিক জমিদারের বাজার সরকারের কাছে পর্যন্ত মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই, মেজাজের মতো এমন ফ্যাশনেবল চিজ সে কোথায় পেল? কিছু অর্থ, সংস্কৃতি, আরাম-বিলাস প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থাৎ এক কথায় লোকের ওপর ঝাল ঝাড়বার অধিকার থাকলে তো মেজাজ গজায় না—ওটা খেয়াল খুশির অংগ।'

কথাটা বুঝে মনোরঞ্জন মৃদু হাসে।—'বেশ, মেজাজ না বলে রাগ বল, মাথা গরম বল। যার কিছু নেই তার ঘৃণা রাগ এসব তো কাড়তে পারবে না?'

গল্প বলতে মনোরঞ্জন পটু নয়। আমাকেই গল্পটা মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। অভিজ্ঞতার স্বাদটা অবশ্য এসে যায় মনোরঞ্জনেরই।

মাঝারি আকারের মানুষটা ভৈরব, মোটা হাড়, সিঁটকানো শক্ত চেহারা, ছোট চাপা কপালটার নিচে একজোড়া স্থির জ্বলজ্বলে চোখ। এই চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার স্বভাব। হুকুম শুনতে বা গাল খেতে একটু সময়ের জন্য সামনে এলেও এতে মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বড়ই অস্বস্তি বোধ করে, ভেতরে ভেতরে রেগেও যায় লোকটার ওপরে। প্রথমত সবিনয়েই হয়তো সে দাঁড়িয়েছে রাখালবাবুর সামনে, হাত জোড় করে আজ্ঞে হুজুর-বলেই

কথা কইছে, কিন্তু মাটিতে আটকে রাখার বদলে চোখ পেতে রেখেছে সোজা রাখালবাবুর মুখে। ধমকধামক গালমন্দ নীরবেই শুনে যাচ্ছে, চিরকাল তার বাপদাদা যেমন শুনে এসেছে, কিন্তু থেকে থেকে আচমকা কি যেন ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, ঝলসে উঠেছে তার চোখ। দেখলে ভয় করে।

রাখালবাবুর মতো মস্ত লোক, খুশি হলে সে তার গলা কাটতে পারে, সেও এক-ভাবে ভেতরে ভেতরে ভৈরবকে ডরায়!

ভয় তাকে কম বেশী সকলেই করে। তার মেজাজের খবর কারো অজানা নয়, বহুদিন থেকে নানাভাবে পরিচয় পেয়ে আসছে। ঝাঁ করে মাথায় তার রক্ত চড়ে যায় এবং সে অবস্থায় স্বয়ং থানার দারোগাবাবুকে পর্যন্ত সে যে মেরে বসতে পারে সে প্রমাণও ভৈরব দিয়েছে। গ্রাম্য আক্রোশে একজন তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে জড়িয়েছিল, দারোগাবাবু তদন্তে এসেছে। ধমকধামক এবং দু-চারটে চড়চাপড় সে যথারীতি দিব্যি হজম করে যাচ্ছিল, দারগাবাবু হঠাৎ একটা খারাপ রসিকতা করে বসায় সেটুকু তার সইল না, ধাঁ করে গালে একটা প্রচণ্ড থাবড়া বসিয়ে দিল! চড়চাপড় যার সইছিল গালমন্দও সইছিল একটা বদ রসিকতায় যে তার মাথা বিগড়ে যাবে, কে এটা ধারণা করতে পারে? চুরির দায় বাতিল হয়ে গেল কিন্তু জেল তাকে খাটতে হ'ল ওই অপরাধে। বেগুন ক্ষেতে গরু ঢোকার জন্য কানাইয়ের সাথে একদিন তার বচসা, সে ঝগড়া অন্যের মধ্যে খুব বেশী হলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত—আচমকা লাঠির ঘায়ে সে কানাইয়ের মাথা ফাঁক করে দিল। তাতেও কি রাগ পড়ল? সেই লাঠি দিয়ে অপরাধীর গরুটার মাথাতে আরেক ঘা না বসিয়ে পারল না, গরুটা গেল মরে। এই নিয়ে হ'ল আরেক দফা জেল এবং সামাজিক হাঙ্গামা। গো-হত্যার জন্য বিধানমতো প্রায়শ্চিত্ত সে করত, ভট্টাচার্যের কয়েকটা চটাং চটাং কথায় মেজাজ গেল বিগড়ে।

বলল, 'বামুন আছো, বামুন থাকো, গাল পেড়োনি। করবানি যাও প্রাচিত্তির। কর গে যাও একঘরে। খাটব নরক দশ জন্ম।'

কুটুম্বস্বজন পাড়াপড়শী তাকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে, তবু সামান্য কারণে আচমকা ধারণাতীতভাবে মাঝে মাঝে বেধে যায়। হেটোরা দোকানীদের সঙ্গে তো তার নিত্য হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। মার খেয়ে খেয়ে বাড়ির লোকের প্রাণ যায়। গাল মন্দ সে বিশেষ দেয় না, খানিক গালাগালি দিয়ে সামলে যাবার মতো নরম রাগ তার কদাচিৎ হয়। তার গরম হওয়া মানেই একেবারে চরম অবস্থায় পেঁছে যাওয়া। তার বৌ কালীর হয়েছে জ্বর, হয়তো আগের দিন তার পিটুনি খেয়েই। শম্ভুর দোকানে সে বৌয়ের জন্য চার পয়সার সাগু কিনতে গেছে।

'কম দিয়েছে শম্ভু। ওজন করে দাও।'

'যাও যাও, বেশি দিয়েছি। চার পয়সার সাগু' তার ওজন চায়।'

শুনেই মেজাজে আগুন ধরে যায় ভৈরবের।

'কেন হে কত্তা ? চার পয়সা পয়সা নয় ? ওজন কর তুমি, বেশি হয় ফিরে নাও বেশিটা তোমার। তোমার ঠেঁয়ে ভিক্ষে চাইছি ?'

দোকানে তখন ভিড়ের সময়, দু-চারজন ভদ্রলোকও আছে। শম্ভু মুখ বাঁকিয়ে শোলোক বলে, 'চার পয়সার সাগু খায়, বৌ ডিঙিয়ে শাউড়ি পায় !'

ভৈরব সাগু ছুঁড়ে মারে শম্ভুর শোলোক-বলা মুখে। 'তোর সাগু তুই খা।'

শুধু সাগু ছুঁড়ে ঠান্ডা হবে তেমন মেজাজ নয় ভৈরবের। এদিক-ওদিক তাকাতে সামনে গুড়ের হাঁড়িটা নজরে পড়ে।

'গুড় দিয়ে খা !'

গুড়ের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবলা খাবলা গুড় সে শম্ভুর মুখে ছুঁড়ে মারে। পরে যা হবার তাই হয়, গরিব অসহায় চাষী তো। কিন্তু সে হিসেব তো আর মেজাজ বোঝে না।

এসব লোককে নিয়ে ওইখানে বিপদ। রাগ হলে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে, নিজের ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা পর্যন্ত লোপ পায়, মরবে কি বাঁচবে খেয়াল থাকে না। সুতবাং তুচ্ছতায় যতই সে মশামাছির সামিল হোক, সহজে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তাই থেকে একটা মোটা সিম্ধান্ত বোধহয় করা চলে। যতই মনে হোক যে মেজাজটা তার একেবারেই অন্ধ ও বেহিসেবী, জগৎসংসার ভুলে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় যা খুশি কান্ড করে বসে, ঠিক অতটা হয়তো সত্য নয়। মানুষ যে তাকে ভয় করে, সহজে তার পেছনে লাগতে চায় না, এটা বোধহয় সে বোঝে।

তারপর একদিন এল লক্ষ্মীপুরের ওই হাঙ্গামা। গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে রাখালের চোরাই ধান-চাল চালান বন্ধ করতে যাওয়া নিয়ে যার সূত্রপাত। পরে অবশ্য ব্যাপার অনেক দূর গড়ায়। কারণ গরিবের যে কোনো বেয়াদপিই ভীতিকর, সমূলে উৎপাটন না করলে চলে না। ধান-চাল উপে যেতে সে এলাকায় মানুষের প্রাণ যায়-যায় হলে মরিয়া হয়ে তখন তারা নিজেরাই প্রতিকার করবে স্থির করে, ভৈরবও সেখানে পরামর্শের গোড়ার দিকে উপস্থিত ছিল। ব্যবসায়ী-জমিদার রাখালের অপকর্মের বিবরণ শুনতে শুনতে সে গরম হয়ে উঠেছিল, জোর গলায় দাবি জানিয়েছিল যে, 'উঁহু, শুধু ধান-চাল না, আগে ও লোকটাকে সবাই মিলে ফাঁসি দিতে হবে, তারপর ধানচাল ঠেকানো।' বুড়ো বনমালী তাকে ধমক-দিয়েছিল, 'তুই থাম ভৈরব। এ ছেলেখেলা নয়।'

'তবে যা খুশি কর। মোকে ডেকোনি !'

বলে গটগট করে সে উঠে এসেছিল বৈঠক থেকে। তাতে বিশেষ কেউ অখুশি হয় নি। তাকে সঙ্গে রাখার ঝক্কি কম নয়। একা তার জন্যই হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে দু-একটা খুন জখম হয়ে যাবে, সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে না।

গ্রামের লোককে দাবাতে যে তান্ডব শুরু হয় তারপর তারা কেউ তো কল্পনাও করতে পারে নি। রাখালের গুন্ডার দল জড়ো হয়ে পাড়ায় পাড়ায় হানা দেয়,

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও গ্রামের লোক শেষে প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে দল বেঁধে তাদের মেরে হটিয়ে দেয়। পুলিশের স্থায়ী ছাউনি পড়ে লক্ষ্মীপুরে। কয়েকটা পাড়ায় গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষায় এমন শক্ত ব্যবস্থা করে যে রাখালের গুণ্ডারা দল বেঁধে সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না।

ভৈরবের ঘরটা ছিল এই এলাকার কিছু তফাতে। একদিন একদল লোক ঘরে ঢুকে খুঁটির সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধে। বাচ্চা ছেলেটা কালীর কোলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, ছিনিয়ে নিয়ে ভৈরবের পিঠের সঙ্গে ছেলেটাকেও তারা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে। তারপর সেইখানে ভৈরবের চোখের সামনে কালীর উপর একে একে তারা সাতজন অত্যাচার করে। আলো জ্বালে নি। জ্যোৎস্না ছিল। গরিবের ছোট ঘর, খুঁটিটার তিন চার হাত তফাতেই ছেঁড়া কাঁথার বিছানা।

কাহিনীর এইখানে থেমে গিয়ে মনোরঞ্জন আচমকা প্রশ্ন করে 'কেন বল তো? পাশবিক অত্যাচারের মানে হয়, কিন্তু স্বামীর সামনে কেন? মাতাল মার্কিন সোলজারদেরও এই ঝোঁক দেখা যেত। কোনো কারণ ভেবে পাই না।'

'মানে? অত্যাচারের মানেই বিকার। অত্যাচারীর মনে দারুণ আতঙ্ক থাকে। নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কার, নিজের নিয়মকানুন পর্যন্ত সে ভাঙছে—নিজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সকলকে পায়ের নিচে পিষে রাখবার জন্য ওরা নিজেরাই নীতি-ধর্ম আইনকানুন আদর্শ খাড়া করে—নিজেরাই আবার তা ভাঙে। আত্মবিরোধ এড়িয়ে যাবার সাধ্য ওদের নেই, অন্যায় করতে ওরা বাধ্য। নেশাখোর যেমন নেশা চড়ায়, এরাও তেমনি অন্যায়কে আরও উগ্র আরও বীভৎস করে চলে। হিটলার অসংখ্য ভয়াবহ অন্যায় করেছে, যাতে তার এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হয় নি। গুণ্ডারা এই একই জাত।'

মনোরঞ্জন একটু ভেবে বলে, 'তাই কি? কে জানে?'

তারা চলে যাবার পর কালী কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। কাছাকাছি কোনো চালায় আগুন ধরেছে, বাইরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির দ্যুতিময় রূপ দেখা যায়। ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলে, 'বাঁধনটা খুলে দে বৌ।'

তার শান্ত গলার আওয়াজে কালী বোধহয় আশ্চর্য হয়ে যায়। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'মোকে কিছু করবে না তো?'

'না, তোর কি দোষ? শীগ্‌গির দড়ি খোল—ছেলেটা বুঝি শেষ হয়ে গেল।'

কালী তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালে। ছেলের দিকে এক নজর তাকিয়েই এতক্ষণ পরে সে প্রথম আর্তনাদ করে ওঠে। এ পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু তার গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বিক্রি করে কিছু বাড়তি রোজগারের জন্য ঘরে ভৈরব পাটের দড়ি পাকায়, বাঁধবার দড়ির তাদের অভাব হয় নি। দিশেহারা উন্মাদ তারা, ওইটুকু ছেলেকে পাটের সরু পাকানো দড়ি দিয়ে বাপের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে

গায়ের জোরে, গলাতেও প্যাঁচ পড়েছে। ইচ্ছা করে কিনা তারাই জানে। ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল, কান্না থামাতে হয়তো এইভাবে গলায় দড়ি জড়িয়েছে। দড়ি খুলে নামাতে নামাইতে টের পাওয়া যায় ভৈরবের আশঙ্কাই সত্য, ছেলেটা শেষ হয়ে গেছে।

কালী হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠতে খুঁটিতে বাঁধা ভৈরব সেইরকম শান্ত গলায় বলে, 'মোর বাঁধনটা খোল আগে।'

ভয়ে ভয়ে কালী তার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে। ভয়টা তার অকারণ নয়, এতদিন একসঙ্গে ঘর করছে, মানুষটাকে সে সবার চেয়ে ভালোভাবেই জানে। কারণে অকারণে কত ছ্যাঁচা খেয়েছে, গায়ে আজও তার অনেক চিহ্ন আঁকা আছে এখানে ওখানে। এ অবস্থায় আজ ভৈরবের মাথা ঠিক আছে এটা স্বপ্নেও সম্ভব বলে ভাবতে পারছিল না। তুচ্ছ কারণে মানুষটা ক্ষেপে যায়, মহামারী কান্ড বাধিয়ে দেয়, বাইরে রাগের কারণ ঘটলে ঘরে হাতের কাছে তাকে পেয়ে পিটিয়ে দেয়, আজ রাতের এত ভয়ানক কান্ড তার সইবে কি করে? বাঁধন খুলে দিলে দিশেহারা উম্মাদ ভৈরব যদি প্রথমে তাকেই খুন করে বসে!

দড়ি খুলে দিলে যে খুঁটিতে ওকে তারা বেঁধেছিল তাতেই ঠেস দিয়ে ভৈরব মেঝেতে বসে পড়ে। মনে হয়, তার সামনে তার বৌয়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেল, তারই গায়ে গায়ে লেগে থেকে কচি ছেলেটা যে ওদের দড়ির ফাঁসে দম আটকে মরে গেল, এসব কিছুই সে গায়ে মাখে নি। তার রাগও নেই, হা-হুতাশও নেই।

কালী নিজে টের পায় না সেও কত শান্ত ধীর হয়ে গেছে, ছেলের জন্য উম্মাদিনীর মতো সেও আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে না। সাধারণভাবে অসুখ বিসুখে ছেলেটা মরলে এতক্ষণ তার গলা ফাটানো আর্তনাদ সারা গাঁকে জানান দিত তার শোকের খবর। সাতজন অত্যাচার করেছে। স্বামীর সামনে। রক্তাক্ত দেহে রক্তাক্ত মন কি সাধারণ শোকদুঃখের স্তরে থাকতে পারে?

'আবার কে আসে?' অস্ফুট স্বরে বলে।

'শুধোও—সাড়া দাও!' কাছে সরে এসে কালী বলে।

'কে?'

'আমি। বনমালী।'

বনমালী ঘরে এসে বলে, 'আর ক-জনা আসছে। বন্দুক হাতে পাহারা ছিল, মোরা এগোতে পারিনি ভাই। তোমার ঘরে অত্যাচার করবে তাও মোদের ভাবনার অগোচর ছিল। সেদিন চটাচটির পর তুমি তফাতে ছিলে বরাবর!'

'গরিবের এই দশা!'

ভৈরবের নম্র শান্ত সুর বনমালীকেও আশ্চর্য করে দেয়। কোনোদিন কোনো অবস্থাতে কেউ কখনো তাকে এমন ধীরভাবে কথা বলতে শোনে নি। প্রদীপের আলোয়

তার দিকে চেয়ে বনমালী বলে : 'পাগল হয়ে যায় নি তো মানুষটা ?'

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বনমালী বলে, 'এর প্রতিশোধ পাবে একদিন।'

ভৈরব সায় দিয়ে তেমনি ধীরভাবে বলে, 'পাবে বৈকি, শীগগির পাবে। কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে সুদে আসলে।'

একে একে আরও কয়েকজন চেনা লোক আসে, ভৈরবের ধীর শান্ত ভাব তাদেরও অবাক করে দেয়। নগেনের বৌ আর নিতাইয়ের পিসী এসেছিল, এক কোণে তাদের কাছে বসে কালী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনে ভৈরব বলে, 'কাঁদিস না বৌ। আর কান্না কিসের ? যদ্দিন বেঁচে রইব, তোতে মোতে শুধু দেখব ওদের কত সব্বোনাশ করতে পারি, কটাকে কাঁদাতে পারি।'

ছেলেকে পুড়িয়ে জিনিসপত্র পুঁটলি করে কালীর সংগে ভৈরব পাড়ার ভিতরের দিকে ব্রজেন দাসের বাড়ির একটা ঘরে আশ্রয় নেয়। একদিকে তাকে দেখে যেমন টের পাওয়া যায় না সে সেই বদরাগী পাগলাটে ভৈরব! অন্যদিকে তেমনি ভাবাও যায় না সেদিন রাত্রে তার জীবনে কী ভীষণ ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামরক্ষী দলে সে নাম দেয়, কাজ করে, মন দিয়ে আলাপ আলোচনা পরামর্শ শোনে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর মানুষকে সরলভাবে সংক্ষেপে নিজের কাহিনী বলে। দাওয়ায় বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাটে বাজারে চাষাভুষো লোককে পরমাত্মীয়ের মতো ঘটনাটা শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'প্রতিকার করবে না ? তুমি মোর ভাই ?'

সাত দিন পরে সেই গুণ্ডার দল যখন মাঝরাত্রে লোচন দাসের ঘরে হানা দিয়ে তাকে আর তার বাপকে বেঁধে বাড়ির বৌ আর মেয়েকে নিয়ে আরেকটা উৎসবের আয়োজন করে তখন তিনশো লোক নিয়ে ভৈরব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কজন এসেছিল প্রায় সকলকেই বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।

কী ভীষণ যে দেখায় তখন তার মুখের চেহারা। দেখে বনমালী এবং আরও অনেকে বুঝতে পারে ভৈরবের মেজাজ কোথায় চড়েছে। তাই, পরদিন আবার তাকে মৃদু ও শান্ত দেখে তারা ক'জন আশ্চর্য হয় না।

প্রাণাধিক

আজ জ্যোতির্ময়ের আসবার কথা। দিল্লী থেকে প্লেনে আসছে, লিখেছে অবনী-দের বাড়িতে এসে উঠবে এবং দু-একদিন থাকবে। অযাচিত সম্মানিত অতিথি। অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজনের কি এরোড্রামে যাওয়া উচিত নয় ?

এখন সমস্যা হ'ল, কে যাবে ? অবনীর সে বন্ধু, সুতরাং সে গেলেই সবচেয়ে মানানসই হয়, কিন্তু এদিকে মুশকিল হয়েছে যে কেরানী-জীবনে অঘটন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু আপিস গিয়ে কলম পিষে ছুটির পর নিজের ঘর-সংসার আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি প্রাণপণে কর্তব্য করা নিয়ে হিমসিম খেয়ে তার দিন কাটে না। জীবনটাই যাতে টেঁকে সেজন্য কেরানীপনার রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থা অর্থাৎ মাসান্তিক মজুরির কিছু উন্নতি সাধনের জন্য বেপরোয়া চেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। অবনীদের আপিসে কাল ধর্মঘট—অবনী আবার এটা ঘটাবার ব্যাপারে ভালোরকম জড়িয়ে গেছে। কোনো সম্মানিত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার মোটেই নেই।

তার পিসতুতো ভাই সুব্রত যাবে ছাত্রদের জরুরী মিটিং-এ।

বাণীর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের একদিন পরিচয় ছিল কিন্তু সে গেলে বাড়িতে এ বেলা রান্না করার লোক থাকবে না, পিসীমার অসুখ। বাণীর শ্বশুর অবনীর বাবা বুড়ো মানুষ। যত না বুড়ো হয়েছে ভদ্রলোক, তার চেয়ে বেশী অকালবার্ধক্য তাকে কাবু করেছে জেল খেটে খেটে দেশটা স্বাধীন করার পর কোথাও আর পাত্তা না পাওয়ার মনোবেদনার চাপে। বিরাট বিরাট সত্যযুগীয় ফাঁপা স্বপ্ন আর আদর্শগুলিতে সরোজের চিরদিন অন্ধ বিশ্বাস, ভদ্রলোক কোনোদিন ফাঁকিও চেনেনি, ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্য বাগাতেও শেখেনি। আদর্শের ব্যবসাদারী হাটে তাই তার ত্যাগের মহিমা কানা-কড়ি দামেও বিকালো না। বাষট্টি বছর বয়সে অম্বলের জ্বালার সঙ্গে প্রাণের জ্বালা মিশে বেচারীকে তাই অথর্ব করে ফেলেছে।

কিন্তু আদর্শ তো তার যাবার নয়। জীবনে কত উন্নতি করেছে জ্যোতির্ময় কোথায় উঠে গেছে, তার মতো বড়মানুষকে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে অপরাধ হবে। এও তার আদর্শের অন্তর্গত। সরোজের তাই টনক নড়ে।

'তোমরা বলছ কি ? কেউ যাবে না ? তা কখন হয় ?'

'কচি খোকা তো নয়,' অবনী বলে, 'বাড়ি চিনে আসতে পারবে। ট্যাক্সি চেপে আসবে, অসুবিধাটা কি ?'

'কত বড় অভদ্রতা হয়! একটা মান্যগণ্য পদস্থ লোক, তার একটা সম্মান নেই ? তোমরা কেউ না যাও আমি যাব।'

তা সরোজের যদি জ্যোতির্ময়কে এগিয়ে আনতে যাবার আগ্রহ জেগে থাকে কারো কিছু বলবার নেই। নিজের অকারণ নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ঘুচিয়ে যদি নড়ে-চড়ে বেড়াতে চায় সেটা বরং ভালো লক্ষণ।

শুধু বাণী বলে, 'আপনি একা যেতে পারবেন না বাবা। মণ্টুকে সাথে নিয়ে যান।'

মণ্টুর বয়স এগার বছর। সে বাণীর ভাই।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাণী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, ঘামে ভেজা গায়ে একটু হাওয়া লাগায়। খানিক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা জমিটুকুতে বস্তির মজুরদের গান বাজনার ছোটখাটো একটা আসর বসেছে। কি উচ্চগ্রামে ওদের সুর বাঁধা, কি জমজমাট জীবন্ত স্থূল ওদের আওয়াজ। পানের দোকানটার শেডহীন বাল্‌ব আর রাস্তার বাতি থেকে ওদের আসরে কিছু আলো পড়েছে, কিন্তু ওরা ধার করা আলোকে পর্যন্ত যেন অগ্রাহ্য করতে নিজেদের একহাত উঁচু একটা কারবাইডের আলো জ্বালিয়েছে, শিখাটা কাত হয়ে লড়াই করছে বাতাসের সঙ্গে। আগাগোড়া কি ভাবে বদলে গেছে জগৎ। জ্যোতির্ময় শহরে এসে যেচে তাদের বাড়ি উঠতে চাইবে এই কল্পনাতীত সম্ভাবনায় আগে তারা কত উত্তেজনা বোধ করত, বিব্রত হয়ে উঠত। সন্দেহ নেই যে অনেক কিছু প্রত্যাশাও জাগত তাদের। আজ একমাত্র তার ওই বুড়ো পাগলাটে শ্বশুরটি ছাড়া জ্যোতির্ময়কে নিয়ে কারো বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। আজ শুধু তারা ধরে নিয়েছে যে, এ একটা রহস্যময় ঘটনা, জ্যোতির্ময় এসে ব্যাখ্যা না করলে এ খাপছাড়া ব্যাপারের মানে বোঝা যাবে না। বালিগঞ্জে তাদের মস্তবাড়ি, সেখানে তার ভাই সপরিবারে বসবাস করছে। শহরে বড় বড় হোটেলের অভাব নেই, বড়লোক বন্ধুরও অভাব নেই। তবু জ্যোতির্ময় প্লেন থেকে নেমে সোজা উঠেছে তার কেরানী বন্ধুর বাড়ি, অতিথি হয়ে সেই বাড়িতেই দু-একটা দিন কাটাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে।

শখ ? খেয়াল ? কে জানে কি আছে জ্যোতির্ময়ের মনে! এ কথা ভেবে নেওয়া বাণীর পক্ষে কঠিন নয় যে তাকে স্মরণ করে তার আকর্ষণে জ্যোতির্ময় আসছে, কিন্তু এ রোমান্টিক কল্পনায় তার সুখ নেই বলে কথাটা ভাবতেও তার ভালো লাগে না। তার জন্যই যদি জ্যোতির্ময়ের এ আগমন হয়, সে জানে তার মানে কি। একদিন চেনা ছিল, হয়তো মাঝে মধ্যে কখনো মনেও হয়ে থাকতে পারে যে এ মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, দূর থেকে সেই চেতনা মেয়েটিকে ভেবে হৃদয়-মনে ব্যাকুলতা জাগায়, জ্যোতির্ময় হঠাৎ তাকে দেখতে আসছে এ কথা কল্পনা

করতেও বাণীর হাসি পায়। ঘটনাচক্রে যদি তারই জন্য জ্যোতির্ময় এসে থাকে, তার একমাত্র অর্থ হবে এই যে তার একটা কুৎসিত খেয়াল চেপেছে। মনে পড়েছে যে বাণীকে দু-একবার লোভনীয় মনে হয়েছে অথচ পাবার চেষ্টা করা হয় নি, আজ সে গরিব কেরানীর বৌ, তাকে দু'দিন একটু ঘেঁটে আসা যাক।

আগে থাকতে একটা লোককে মন্দ ভাবতে বাণীর ভালো লাগে না। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচু স্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।

সরোজকে জ্যোতির্ময় একটু ঠাহর করে দেখে চিনতে পারে, বলে, 'ও আপনি? আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। অবনী এলো না?'

'অবনী একটু জরুরী কাজে গেছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।' কিছু মনে করার ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুর অস্তিত্বও জ্যোতির্ময় অস্বীকার করে। তাকে বেশ উৎসাহী সানন্দ আত্মপ্রতিষ্ঠ মনে হয়, মন্টুকে চিনতে না পারার ত্রুটির জন্য তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বলে, 'ভারি অন্যায় হ'ল। তুমি তো শুধু ওনার ছেলে নও, তুমি যে আবার অবনীর ইয়ে, না কি বল অ্যাঁ?'

গাড়িতে সে সরোজকে বলে, 'আমি একটা জরুরী কাজে এসেছি। একটা ভুল হয়ে গেল, অবনীকে লিখে দিতে মনে ছিল না, আমি এসেছি যেন চারিদিকে রটিয়ে না বেড়ায়।'

'না না, এখবর রটে নি। ওই যে তুমি লিখেছিলে কাজের চেয়ে দু'টো দিন বন্ধুর বাড়ি শান্তিতে বিশ্রামের লোভটা তোমার বেশী, ওটা পড়েই অবনী কাউকে জানায় নি। জানলে দশটা লোক এসে তোমায় বিরক্ত করবে একি আমরা জানি না বাবা? তুমি এ গরিবের বাড়ি পা দেবে লোকের এটা ধারণায়ও আসবে না।'

একটা সিগারেট বার করে সরোজের প্রায় সাদাটে চুল ও শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেটা না ধরিয়েই জ্যোতির্ময় আবার পকেটে রেখে দেয়। তাতে আনন্দের সীমা থাকে না সরোজের।

জ্যোতির্ময় বলে, 'আপনাকে খুলেই বলি। আমি একটা এজেন্সি খুলব। নিজের নামে তো আর পারি না, চারিদিকে শত্রু, নানা লোকে নানা কথা বলবে। তাই ভাবলাম, বিশ্বাসযোগ্য কে আছে, কাকে ভার দেওয়া যায়। তখন মনে হ'ল, এত লোকের জন্য এত করেছি, অবনী আমার কতকালের বন্ধু, ওর জন্য কিছুই করা হয় নি। আপনি সারা জীবন কাজ করলেন, শেষ জীবনে আপনারও সুখ হ'ল না। তাই অবনীকেই সব ভার দেব ঠিক করেছি। ওকে আর চাকরি করতে হবে না, আপিসে মাইনে যা পায় আমার কাছে তার বিশ গুণ কমিশন পাবে।'

'কিসের এজেন্সি বাবা?' সরোজের গলা কেঁপে যায়, চোখে জল এসে পড়ে—এতদিনে—কি তবে তার সারা জন্মের আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতিদান আসবে? এই কঠোর বাস্তববাদী জগতে অহিংসা দারিদ্র্য উপবাস-বরণের পুরস্কার মিলবে?

'বলব'খন বাড়ি গিয়ে। বিস্তারিত বলব।'

মনে মনে বিড়বিড় করে অভ্যস্ত কয়েকটা মন্ত্র আউড়ে অনির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্য যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সরোজ নিশ্বাস ফেলে। ভগবান তবে ছপ্পর ফুঁড়েই দিলেন!

'ছেলেমেয়ে ক-টি?'

'একটা মেয়ে আছে বছর তিনেকের। এলাহবাদে দাদামশায়ের কাছে থাকে। কাজের চাপে, জানেন জ্যাঠামশায়, বছর খানেকের মধ্যে মেয়েটাকে চোখে দেখি নি।' সরোজ মনে মনে বলে, ষাট! তিনিও কর্মী ছিলেন, এও কর্মী, এই বয়সে বেচারী কত সাফল্য লাভ করেছে, টাকা পয়সা মান সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি! কিন্তু এরা নীতি জানে না, ব্রত বোঝে না। একটা মোটে মেয়ে, কার জন্য তবে এই তপস্যা? এরা মনে রাখে না যে গান্ধীজীরও সংসার ছিল, পুত্র-সন্তান ছিল, তারপর যখন সময় এল তখন তিনি হলেন সন্ন্যাসী।

এরা যখন পৌঁছল, বাড়িতে বাণী তখনও একা, শুধু পিসীমা বিছানায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে সরোজ প্রায় চটে যায়, চেঁচিয়ে বলে, 'কী আশ্চর্য, এখনো কেউ বাড়ি ফেরে নি! এদের যদি কোনো কান্ডাকান্ড জ্ঞান থাকে।'

জ্যোতির্ময় তাকে শান্ত করে: 'আহা আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজে গিয়ে আটকে গেছে, আসবে সময়মতো।'

কিন্তু অবনীর অনুপস্থিতিতে যে তাকে বিরক্ত করেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। পরক্ষণে সে প্রশ্ন করে, 'অবনী জরুরী কাজে গেছে বলছিলেন, কিসের কাজ?'

'ও তার আপিসের ব্যাপার।'

'আপিসের ব্যাপার?' বিরক্তি কেটে জ্যোতির্ময়ের মুখে স্মিত ভাব ফোটে। কেরানীর কাছে আপিস কত গুরুতর এটা তার অজানা নয়।

বাণীর দিকে সে আশ্চর্য হয়েই তাকায়, কি দেখবে ভেবেছিল আর কি দেখছে, যেন চোখ দিয়েই যাচাই করে নিতে চায়। পাঁচ-ছ বছর বিয়ে হয়েছে, কেরানীর মেয়ে কেরানীর বৌ! সে এখনো এমন আঁটো আছে, জীবন্ত আছে! বাণীকে গরিব বাঙালী গেরস্ত ঘরের বিবাহিত মেয়ের চিরন্তন মাতৃরূপা রূপে না দেখে সে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে।

'আপনাকে তো আগে তুমিই বলতাম, আপনার বোনের সঙ্গে দু-বছর এক সাথে পড়েছি। আশা কোথায় আছে?'

'আশা আশা? একটু বিলাতের দিকে বেড়াতে গেছে। মানে, দেশে কেমন ওর মন টিঁকল না, একটা সুযোগ জুটে গেল ও একটু আমেরিকা বেড়িয়ে আসতে গেল।'

জ্যোতির্ময়ের অস্বস্তি বাণী টের পায়। কথাটা হালকা করে উড়িয়ে দিতে সে বলে, 'ওর বেড়ানোর ভাবনা কি? সাধ হলে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। জামা-কাপড় ছাড়ুন, চান করবেন? বিশেষ চেষ্টায় দু বালতি জল রেখেছি।'

'বিশেষ চেষ্টা কেন ?'।

'জলের বড় অভাব। সব জিনিসেরি অভাব—কেরানীর বাড়ি তো !' কথাটা বাণী না বলতেও পারত। জ্যোতির্ময় এ সব হিসাব করেই এসেছে, বড় একটা মোটা লাভের গোপনীয় ব্যবস্থার জন্য একটা দুটো দিন এ সব কষ্ট অসুবিধা সইতে সে নারাজ নয়।

নাইতে অনেক সময় লাগিয়ে, সম্ভবত নিজের উচ্চতম জগতের অভ্যস্ত হিসাব-নিকাশ চালচলন কি ভাবে মানুষের জগতের উপযোগী করে ঢালাই করে নেবে, কয়েক ঘণ্টার জন্য করে নেবে (আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি এখানে থাকতে হয়, বাইরে নিজের জরুরী কাজের নামে দশ ঘণ্টা, ঘুমানোর নামে চোদ্দ ঘণ্টা, চিঠি লেখা কাগজ পড়া চিন্তা করার নামে দশ ঘণ্টা যাবে। তবু চোদ্দ ঘণ্টা থাকে ঘরোয়া সামাজিক জীবনের জন্য। অসুস্থতার ভান করে আরও ঘণ্টা দশেক কাটানো ছাড়া উপায় নেই। অন্যভাবে ছাঁটাই করে টোটালটা আরও কিছু কম করা যায় কি ? বোধহয় এরা ভড়কে যাবে। বন্ধুত্ব, প্রীতি, আদর্শ, নীতি মানবতা, ইত্যাদি ভান তো চাই, সরোজের ছেলেকে চাকরি ছাড়িয়ে চোরাকারবারে নামাতে হবে। তার জীবনে তার পরিবারে এটা প্রায় বিপ্লবের সমান।) সেটা ঠিক করে সহজ সরল হাসিখুশি হয়ে জ্যোতির্ময় বারান্দায় জেঁকে বসে।

দূরে এক হাত কারবাইড লাইটের আলোয় মজুরদের গানের আসরের দিকে চেয়ে বলে, 'ও ব্যাটাদেরই আজকাল ফুর্তি। স্ট্রাইক করে করে মোটা মজুরি কামাচ্ছে, সস্তায় ফুর্তি করছে। লোকে আমাদের প্রফিটটাই দ্যাখে। একখানা গান শুনতে আমাদের যে হাজার টাকা খরচ সেটা কেউ হিসাব করে না। হেসো না বাণী, ঠিক কথাই বলছি।'

'বলছেন না কি ?'

'বলছি না ? একটা ছোঁড়াকে বিনি পয়সায় মেয়ে সাজিয়ে ওরা নাচাচ্ছে, গান করাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো কী জমজমাট আসর। আমরা যে মেয়েটার গান শুনে একটু মাতব, সে মেয়েটার বাপকে একটা খাতিরী চাকরি দিতেই হবে। মেয়েটাকে শান্তি-নিকেতনে পড়িয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। রেডিও সিনেমায় নাম করাতে হবে। গান তো আসলে অষ্টরম্ভা, কাজেই নাম টাম করিয়ে না শুনলে তো মাতলামি আসবে না। একটা রোমাঞ্চকর গান শুনতে আমাদের হাজার কেন, তার বেশী খরচা হয়।'

'না শুনলেই হয়।'

'হয় না। যার মেয়ে বা বৌ গান শোনাবে সেও সব জানে বোঝে কি না। সব কল টিপে হয়। কল টেপাটাই আসল।'

'এমন যখন কাহিল অবস্থা,' 'বাণী হেসে বলে, 'ও কল আপনাদের বিগড়ে গেছে। আর কাজ দেবে না।'

সরোজ বাণীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলি। একটু হিসেব করে কথাবার্তা বোলো। অবনীর একটা ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, যা-তা বলে ওর সর্বনাশটা কোরো না।'

'আমি আপনার ছেলের সর্বনাশ করব? তাতে আমার লাভ কি বাবা?'

প্রাণপণ উদারতায় সরোজ ক্রোধ সংবরণ করে। এরা কিছু জানে না বোঝে না মানে না। এদের আধ্যাত্মিক জীবনে এমন দৈন্য স্বার্থপরের মতো সব বিষয়ে স্বামীর সংগে নিজেকে জড়িয়ে ভাবে। আমার কিছু হোক না হোক স্বামীর আমার ভালো হোক এ চিন্তাও এদের আসে না।

বাণী তার মুখের ভাব লক্ষ করে ভরসা দিয়ে বলে, 'ভাববেন না, বাড়িতে এসেছে মানুষটা, আমি প্রাণ দিয়ে আদর যত্ন করব।'

দু'খানা ঘর আর ওই বারান্দাটুকু সম্বল। ছোট ঘরে বাণীরা যাবে, জ্যোতির্ময়ের কাছে চাদর চেয়ে নিয়ে বাণী সে ঘরে বিছানা করে দেয়, বলে, খাটে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন, যা চেয়ার বাড়িতে। কষ্ট পাবেন অনেক।'

'বেশ তো, তোমাদের সংগে নয় কষ্টই পেলাম।'

পিঠ চাপড়ানো উদার আত্মীয়তা জাহিরের ভাব সুর ভাষা বাণী জানে। এ হ'ল রক্ষাকর্তার পিতৃত্ববাদ। জ্যোতির্ময়ের অসুবিধাটাও বাণী টের পায়। তাদের দেখতে হচ্ছে অন্য দৃষ্টিতে, চোখ তার অভিনয়ের সংযম মানতে রাজী নয়। আগে খেয়াল ছিল না, জ্যোতির্ময়ের তাকানি দেখে বাণী টের পেয়েছে সে এখন একটা নতুন আকর্ষণ হয়েছে। বিয়ের আগে বাপের ঘাড়ে খেত-পরত, বাপ যতই গরিব হোক তখন আলস্য ছিল, শখ আর শৈথিল্য ছিল। নিজের সংসারে কর্মজীবনের দায়িত্বে সামঞ্জস্য আনার জন্য চলা-ফেরা খাওয়া-পরার কঠোর সংযম আর খাটুনি তার দেহে ক'বছরে মজুর মেয়ের বিশেষ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে—বেশী করে এনে দিয়েছে কারণ যতই হোক, মজুর-মেয়ের মতো তার মন্দের হাড়-ভাঙা খাটুনি নয়—যত ওঁচা হোক, খাওয়াও সে তুলনায় সে অনেক ভালো পায়।

'ছেলে-মেয়ে হয় নি?' জ্যোতির্ময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে। তার আসল কৌতূহলটা কি বাণীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ চোখ দিয়ে তার সর্বাংগে কৌতূহলটার জবাব সে খুঁজছিল।

বাণী ধীর কণ্ঠেই বলে, 'একটা মেয়ে হয়েছিল দু'বছর বয়সে মারা গেছে। মারা যেত না, একটা চিকিৎসা ছিল। তাতে বহু টাকা লাগে, যোগাড় করা গেল না।'

জ্যোতির্ময়ের মাথা একটু নামে, দৃষ্টি মেঝেতে নেমে যায়।

'আমায় লিখলে না কেন?'

এ প্রশ্নের আর জবাব কি? বাণী চুপ করে থাকে।

'অবনীর যদি পাঁচ ছ-শ টাকা রোজগার হয়, খুশি হবে?'

'হব না! কী বলেন!'

জ্যোতির্ময় চোখ তোলে, 'কালকেই সব ব্যবস্থা করে দেব। নাম থাকবে সরোজ-বাবুর, ওঁর নামের একটা বিশেষ ইয়ে আছে। দেখাশোনা সব অবনীই করবে। কালকেই ও রিজাইন দিয়ে দিক।'

'রিজাইন বোধহয় দিতে হবে না, এমনিই তাড়িয়ে দেবে।'

'কেন?'

'স্ট্রাইক-ফাইক করছে।'

জ্যোতির্ময়ের চোখে সংশয় ঘনিয়ে আসে।—'ও বাবা, ও সবে যায় না কি?' একটু ভেবে বলে, 'যাক্ গে, ও পেটি চাকরিও করতে হবে না, স্ট্রাইকেরও দরকার হবে না।'

বাণী কিছু বলে না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামী-শ্বশুরের সর্বনাশ করতে কিছুতেই মুখ খুলবে না। তরকারি নামাতে সে রান্না ঘরে যায়। পরনের শাড়িখানাই একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে একটা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে জ্যোতি-র্ময়কে বলে, 'আধ ঘণ্টা বাবার সঙ্গে কথা বলুন। পাড়ার একটি মেয়েকে পড়াই, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েই চলে আসব।'

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হয়, ক্ষুণ্ণও হয়। কাল স্বামী চাকরি ছাড়বে, মাসে পাঁচ-ছশো টাকা রোজগার শুরু করবে, তার খাতিরেও সে একবেলা মেয়ে-পড়ানো কামাই করতে সাহস পেল না।

অবনীর ফিরতে প্রায় রাত ন-টা বেজে যায়। বাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হ'ল?'

'ঠিক হ'ল। সবাই একমত।'

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবে অবনী জামা কাপড় ছেড়েছে, সে ফিরেছে টের পেয়েই সরোজ তাকে ব্যগ্রভাবে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। বাণী যখন মেয়ে পড়াতে গিয়েছিল সে সময় জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার এজেন্সি সম্পর্কে আরও আলাপ হয়েছে। সমস্ত ব্যাপার জেনে সরোজের যেমন হয়েছে ভয়, তেমনি বেড়েছে উত্তেজনা। নিজে আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তাকে আলাপ-আলোচনা করতে দিতে সে রাজী নয়। এজেন্সির প্রস্তাবে সায় দিতে ছেলের নতুন বিবেকে বাধবে বলেই সরোজের ভয়, সোজাসুজি হয়তো সে জ্যোতির্ময়কে বলে বসবে: আমি তোমার ওই লোকঠকানো ব্যাপারে নেই। তাহলেই সর্বনাশ।

'জ্যোতির্ময় তোমায় বলেছে কিছু?' উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে সরোজের, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'কখন বলবে?'

'শোন তবে বলি—'

সরোজ জ্যোতির্ময়ের বেনামী এজেন্সির ব্যাপারটা ছেলেকে খুলে বলতে শুরু

করে। অবনীর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ দেখে আলোচনাটা খাওয়ার পর আরম্ভ করার কথা বলতে গিয়ে বাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যায়—ক্ষিদের কষ্ট অবনীর সইবে, কিন্তু একটু শান্ত হতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে বুড়ো মানুষটার হার্টফেল করা আশ্চর্য নয়। সেইখানে একটা মাদুর বিছিয়ে বাণী দু'হাত ধরে সরোজকে বসিয়ে দেয়, বলে, 'বসে কথা বলুন বাবা, ব্যস্ত হবেন না।'

রাগে দুঃখে তার চোখে তখন প্রায় জল এসে গিয়েছে। ক্ষিধেয় মানুষ মরে যাক, জীবন অচল হয়ে আসুক, এমনি সব দুর্বলতা বাধা হয়ে মানুষকে ব্যস্ত হতে দেবে না, তাড়াতাড়ি কিছু করতে দেবে না! সরোজ এই বলে শেষ করে, 'সারা জীবনে আমি নীতি আর আদর্শ বাঁচিয়ে এসেছি, এতে কোনো দোষ দেখলে আমি নিজেই বারণ করতাম। মানুষের নীতিধর্ম অন্তরে, বাইরেটা দেখলে শুধু চলে না। তুমি যেন জ্যোতির্ময়কে না বলে বোসো না।'

অবনী বাণীর দিকে তাকায়। বাণী যেন জানত সে এইভাবে, পাশের দিকে সরোজের চোখের আড়ালে সে দাঁড়িয়েছিল। নীরবে ঠোঁট কামড়ে বাণী চোখের ইশারায় সরোজকে দেখিয়ে দেয়। ইঙ্গিতটার মানে বোঝা সহজ। ধৈর্য হারালে চলবে না, ব্যস্ত হলে চলবে না, বুড়ো বাপটা যখন আছে তার অস্তিত্বটাও মানতে হবে। অবনীর শান্তচোখে বিপজ্জনক অসহিষ্ণু ক্রোধ ঝলসে উঠছিল, বাণীর ইঙ্গিত না পেলে সে হয়তো ভুলেই যেত আসল কারসাজী কার, অসহায় নিরুপায় বাপকে দাবড়ে দিত।

কী ভয়ংকর মুহূর্তটা যে কেটে যায় বোঝে শুধু বাণী আর অবনী। ঘৃণার মতো প্রচণ্ড মহৎ হৃদয়াবেগকে যুগে যুগে তারা অনেক কায়দায় বিপথে উল্টো দিকে চালিত করে ঘরে ঘরে ভুল বোঝা আর অশান্তি আর হতাশা সৃষ্টি করেছে তাদের কৌশল আরও একবার প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল!

জ্যোতির্ময় ঠকাবে মানুষকে, লোকচক্ষুর আড়ালে সে হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে বাগাবার ব্যবস্থায় কাজে লাগাবে সরল বোকা অসহায় সরোজ আর তার গরিব কেরানী ছেলে অবনীকে, আর একটু হলে আড়ালের মানুষ তাকে আড়ালেই রেখে ফাটাফাটি হয়ে যেত সরোজ আর অবনীর মধ্যে।

অবনী মৃদু শান্ত স্বরে বলে, 'আপনি যদি জোর করেন আপনি যা বলেন তাই হবে। আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না! কিন্তু আমি ভাবছি, আমার ভালোর জন্যই আপনি এটা বলছেন। সবার কাছে হীন হয়ে আমার সুখ-শান্তি যদি নষ্ট হয়, আপনি কি সুখী হতে পারবেন?'

'ওই তো, ওই তো দোষ তোমার!' ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুরে সরোজ বলে। কিন্তু অভিমান সাধারণ হৃদয়াবেগ, মোটেই মারাত্মক নয়। সারা জীবনের ত্যাগ স্বীকারের পুরস্কার যেচে ঘরে এসেছে অথচ ছেলে তো বাতিল করে দেবে, এই আতঙ্কে যে কাঁপুনি ধরেছিল সরোজের তা কেটে গেছে। ক্ষুব্ধ হোক আর অভিমান করুক,

এখন সে শান্ত হয়েছে, আচমকা তার হার্টফেল করে মরার সম্ভাবনা নেই।

দু'বার নাক ঝেড়ে, বাণীর কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে কয়েক ঢোক জল খেয়ে সরোজ বলে, 'তোমার ঠেকছে কিসে? এ তো চুরিচামারির ব্যাপার নয়, সাধারণ ব্যবসার কথা। কেউ না কেউ এজেন্সিটা পেত, এজেন্সি দেওয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্ময়ের হাত ছিল, সে অন্যকে না দিয়ে তলে তলে নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এটা একটু অন্যায় বটে, দেশের লোককে জানানো হ'ল এক রকম কাজে হ'ল অন্য রকম। কিন্তু বিশেষ কি এসে গেছে? অন্য লোকেও এজেন্সিটা চালাত, জ্যোতির্ময় নিজের লোক দিয়ে সেটা চালাবে। এজেন্সি চালানোই আসল কথা। তাতেই দেশের মঙ্গল। এতে তোমার আপত্তি কি?'

অবনী বলে, 'এক কাজ করা যাক। জ্যোতি আপনার নামে এজেন্সি করতে চায়, তাই করুক : আপনি মাইনে দিয়ে লোক রাখুন, এজেন্সি চালান। আমি নাই বা রইলাম ওর মধ্যে।' আশেপাশের তিন চারটে বাড়িতে রেডিও বিনিয়ে বিনিয়ে গানের নামে কাঁদছে। তবে সুখের বিষয়, এ কাঁদুনি ঢোল করতাল ঘুঙুর আর সমবেত গলার আওয়াজে খানিকটা চাপা পড়ে গেছে।

সরোজ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ভেবে দেখি। তোমরা খাবে যাও। আমি আজ কিছু খাব না বৌমা।'

বাণী চট করে সামনে আসে।—'না খাওয়াই ভালো। পাতলা একটু বার্লি করে রেখেছি, চুমুক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

খাদ্য দেখে রীতিমতো ক্রোধের সঞ্চার হয় জ্যোতির্ময়ের, যদিও তার জন্যই বিশেষভাবে সরোজ একপোয়া মাছ আনিয়েছিল এবং মাছটা বেশির ভাগ তাকেই দেওয়া হয়েছে। তবে রাগ করে যেখানে লাভ নেই সেখানে জ্যোতির্ময় রাগ চাপতে পারে। তার শুধু লাভের হিসাব। বিনা লাভে রাগ দুঃখ খরচ করাও তার স্বভাব নয়।

'বাঃ! লাউ শাকটা তো খাসা হয়েছে!'

বাণী বলে, 'ওটা পুঁই-চচ্চড়ি। জানেন পুঁইশাক ছিল বলে বাঙালী বেঁচে আছে। ভাতের বদলে কচু আর মাছ-মাংসের বদলে পুঁই। কচু আর পুঁই না থাকলে—।

'কুচো চিংড়ি বাদ দিও না।'—অবনী বলে।

জ্যোতির্ময় খিলখিল করে হেসে ওঠে। কি করবে কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। চাদর গায়ে জড়িয়ে পিসীমা ধীরে ধীরে ঘরে এসে দরজার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে বসে। ধীরে ধীরে বলে, 'সলিল আসে নি, না?'

বাণী বলে, 'না পিসীমা, এখনো ফেরে নি।'

পিসীমা তেমনি মৃদুস্বরে বলে, 'বেরোবার আগে অনেকক্ষণ কপাল টিপে দিয়ে গেল। তখনি বুঝেছি মিটিং-এ গোলমাল হতে পারে, নইলে মার জন্য ছেলের অত দরদ হয়! না-ও ফিরতে পারে ভেবে গেছে।'

'এখনো ফেরার সময় যায় নি।'

পিসীমা নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। এদিকে জ্যোতির্ময়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ দেখায়।

'সলিল কে? কিসের মিটিং?'

জবাব শুনে তার মুখ আরও পাংশু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভাত গিলতে পারে না। বার বার চোখ তুলে সে বিধবা পিসীমার শীর্ণ কিন্তু শান্ত মুখখানার দিকে তাকায়।

তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে সলিল বাড়ি আসে। বলে, 'বাঃ সবাই পেটপুজোয় লেগে গেছে।'

জ্যোতির্ময়ের মতো মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে মোটেই বিব্রত করেছে মনে হয় না। আধ-ময়লা পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে হাত ধুয়ে একটা আসন টেনে বসে পড়ে বলে, 'চট করে থালা আনো বৌদি, আগে খাব তারপর অন্য কথা।'

ভাতের থালা সামনে পাওয়ামাত্র সে খেতে আরম্ভ করে, কোনোদিকে তাকায় না। জ্যোতির্ময় যেন আশ্চর্য হয়ে এই পুঁজি-করা প্রাণবন্ত প্রচণ্ড ক্ষুধার অভিব্যক্তি চেয়ে দ্যাখে। অবনীর খাওয়ার রকমে সে জোরালো খিদে দেখেছিল, তবে এতটা নয়। তার বোধহয় বিশ্বাস হয় না যে, ভদ্রঘরেও এত খিদে পায় এবং সে খিদে চেপে রাখতে হয় রেশনের নির্দিষ্ট অন্নের জন্য।

অবনী বলে, 'মিটিং কেমন হ'ল?'

'গ্র্যাণ্ড। পরশু জয়েণ্ট প্রসেশন!'

কিছুক্ষণ সলিলের সঙ্গেই সকলে কথা কয়, জ্যোতির্ময়কে তারা যেন ভুলে গেছে। শরীরটা দুর্বল বোধ করে সরোজ শুয়ে পড়েছিল, এখানে উপস্থিত থাকলে তার হৃৎস্পন্দন বোধহয় বন্ধ হয়ে যেত। জ্যোতির্ময়ের মুখে গভীর চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সে উসখুস করে। নাক ঝাড়ে, গলা খাঁকারি দেয়, নড়েচড়ে নানাভাবে বসে,হাতের তালু দিয়ে নিজের থুতনি ঘষে। 'টায়ার্ড লাগছে? তুমি বরং তবে শুয়ে পড়।' অবনী বলে।

'টায়ারড্ নয়। ভাবছি, তোমাদের বড়ই অসুবিধা করলাম। ঘরের এত টানাটানি জানলে আমি—'

'আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, ভেবো না। অসুবিধে তোমারই।'

বাণী জলের কুঁজো আর গ্লাস এনেছিল, সে বলে, 'আমাদের অতিথি আসে না?'

তবু জ্যোতির্ময় উসখুস করে। এক গ্লাস জল খেয়ে নামিয়ে রাখা জ্বলন্ত সিগা-রেটটার কথা ভুলে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরায়।

আচম্‌কা বলে, 'একটা ভুল হয়ে গেছে, ইস্। আমার তো ভাই যেতে হবে।'

'বেরোবে? তা বেশ তো। ফিরতে বেশি রাত হবে না কি?'

'জিনিসপত্র নিয়েই যাব। আমার কি আর বিশ্রাম আছে? তোমাদের চিঠি লেখবার

পর এটা ঠিক হয়, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমাকে হোটেলেই যেতে হবে, সকালে ক'জন বড় বড় লোক আসবে, জরুরী কনফারেন্স।'

অবনী বলে, 'ও!'

জ্যোতির্ময় হাসবার চেষ্টা করে, বলে, 'ভেবেছিলাম হোটেলেই উঠব, সেখান থেকে এসে তোদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তোর বাবাকে দেখে সব ভুলে গেলাম। এতদিন পরে তোদের দেখা, কী ভালোই যে লাগছে। হোটেলের কথাটা স্রেফ ভুলে গেছি।'

বাণী খেয়ে উঠে শোনে, সলিল ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। জ্যোতির্ময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সি এলে একটা প্রকান্ড সমস্যা দেখা দেয়। সরোজের বোধ হয় ঘুম এসেছে, তাকে না জানিয়েই কি জ্যোতির্ময় চলে যাবে?

'আমরা বুঝিয়ে বলব। এমনি ভালো ঘুম হয় না, ঘুম যখন এসেছে ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি চলে গেলে বাণীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বাঁচা গেল বাবা। নিজেই আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিল।'

অবনী বলে, 'তাই তো দেয়।'

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাণী একবার সরোজের খবর নিতে যায়। শ্রান্ত অবনী আগে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাণীর হাতের নাড়ায় জেগে উঠে তার মুখ দেখেই সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিঃশব্দে গিয়ে দুজনে সরোজের চৌকিতে বিছানো সামান্য সাধারণ বিছানার পাশে দাঁড়ায়, সামান্য ইঙ্গিতটুকু পাবে না জেনেও অবনী জীবনের সন্ধান করে। বাণীর দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বুড়ো সরোজ চিরতরে ঘুমিয়ে গেছে।

ফেরিওলা

বর্ষাকালটা ফেরিওয়ালাদের অভিশাপ।

পুলিশ জ্বালায় বারোমাস। দুমাস বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনোমতে পেট চালানোও বরাদ্দ নেই।

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়িটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজী হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশী বেশী দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনা থেকে, সেইজন্য কি?

এক কাঁধের শাড়ি চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশী নয়। ভারী হওয়ার মতো বেশী মাল সে কোথায় পাবে? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবৎ কিছু শাড়ি আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হয়। 'শাড়ি চাদর গামছা চাই' বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাশি আসে।

'শাড়ি আছে?'

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ-সাত বছরের হাফপ্যান্ট পরা একটি মেয়ে কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলী গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

'শাড়ি আছে মা। নেবেন?'

'কৈ দেখি।'

একদিকে মিশকালো অপর দিকে টুকটুকে লাল পাড়ওলা মিহি শাড়িটা জীবন

মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ির মধ্যে এখানাই সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে দামী কাপড়। আজ প্রায় দশ-বারোদিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রি হয় নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না। এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

'কম দামের নেই ?'

তিন-চারখানা রঙীন তাঁতের শাড়ি মেয়েটির হাতের ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর শুরু হ'ল লাল পাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়িখানা নিয়ে। জিনিসটার গুণকীর্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপরপক্ষে চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে। রফা হয় ছ টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সংকোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না। একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দুটি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

'বাকিটা দু'দিন পরে নিও।'

'ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।'

বাকিতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুরবেলা ঘরের মেয়েদের সংগে বেচা-কেনা মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকিতে নেওয়া দরকার হয়।

মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ি অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিস পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলার সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ অবস্থায় টাকা বাকি রাখা যায় না। কাল পরশু এসে হয়তো শুনবে, কই, এ-বাড়িতে কেউ তো কাপড় রাখে নি তোমার কাছে। কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড় ?

ভেতর থেকে মেয়েলী গলায় আবার মিনতি মেশানো উপরোধ আসে, 'দু'দিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।'

'বাকি দিতে পারব না মা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দুটি পাট খুলে এসে দাঁড়ায় শ্যাম-

বর্ণা একটি বৌ। লাল পাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়িটিই পরেছে।
করুণ কণ্ঠে বলে, 'মা বলে ডেকেছ, বাকি না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারি নি, তোমার কাপড়টা পরে তবে এলাম।'
এ জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। শহরতলির শহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। শহর আর গ্রাম শহরতলিতে একাকার হয়ে যায় নি এখনো, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইঁটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায় নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।
কত রকমারি জিনিসের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই শহরতলির। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে, ছিটকাপড় সায়া ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সব চেয়ে বেশি উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানলা দিয়ে, তারাই আকর্ষণ করে সবচেয়ে লুব্ধ দৃষ্টি।
সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন শহরতলির সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মতো শ্রান্ত পায়ে : দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'শাড়ির কেমন দাম ভাই ?'
'তের-চোদ্দ জোড়া হবে।'
'তের-চোদ্দ!'
'এগার টাকার নিচে নেই!'
সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রকম হ'ল ?'
'সুবিধে নয়।'
প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতন্য-বাবুর বাড়ি খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি কাপড় সে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য ওদিকের ঘরের অঘোরের মতো একটি ধুতি, পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মতো। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।
গামছা আর শাড়িচাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকিতে সটান শুয়ে পড়লে, বীণা ভূমিকা শুরু করে দেয়, শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কি করব বল উপায় ছিল না, এলুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।'
একটু থেমে বলে, আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে ক'দিন। তোমার রকমসকম দেখে আমি বাবু বলতে সাহস পাই নি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিন্ডি ? মাটির

হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, ক'দিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, একটু চালাকি করে বাকিতে রেখেছি। ওইটুকু হাঁড়ি তার দাম সাতসিকে! দরদস্তুর করে পাঁচসিকেয় রাজী করালাম। তা পাঁচসিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে? বললাম, ফুটোফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকিতে দেবে না। কি করি? উনুনটা ধরে নি তখনো ভালো করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম, কি করি বল, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।'

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। তাতে কি একটু নতুনত্ব লাগবে? বোটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠান্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না? অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষী রঙ লাগিয়ে দেয়। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষ রাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাতটা একটু কাত হয়ে গেছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরি হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধসে পড়ুক আর যাই হোক, ভাগ্যে ছাতটা একটু কাত করা। এপাশে জল চুইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না পড়ে ছাত বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে—তাই চৌকিটা রক্ষা পায়।

রক্ষা পায় ছেঁড়া তোষক বালিশ জামাকাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ি চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে, মাল নিয়ে সরাসরি গিয়ে বৌটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকি দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সবদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কিসের!

কে জানে সারাদিনে আজ এ বৃষ্টি ধরবে কিনা?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, 'এর মধ্যে কি করে কাজে যাই? কামাই করলে গিন্নী আবার ক্ষেপে যায়!'

বীণার গায়ের রঙ শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণদশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, 'গিন্নী ক্ষেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কি?'

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়িগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, 'তুমি তো বলে খালাস, গিন্নী এদিকে এবার পুজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে।

পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পুজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।'

'না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।'

'ভিখিরি কিসের? সব ঝি পায়। সারা বছর কাজ করলেই দু'খানা কাপড় দিতে হবে।'

জীবন মৃদু হেসে বলে, 'এ তো আগের নিয়ম গো, এবার ক'জনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝিগিরি করতে হয়?'

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জানো, মাগী টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ি খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝিরা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি করছে।'

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ মেলে না। অন্য ঝিদের মতো এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ি, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বৌকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরেব ছেলে ভোলা এসে বলে, 'বাবা একটা বড় গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।'

'ধারে দিতে পারব না।'

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, 'জানো হে জীবন, বন্ধুর দোকানে চিরকাল বাকিতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হ'ল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ? তাও একমাসের ওপর ব্যবহার করেছি?'

'চুরি গেছে?'

'তবে কি? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল. গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা! ভাবলাম, দুত্তোরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল!'

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা হাসে।

'আপনার লুঙ্গিটা কি হ'ল?'

'সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাত। লুঙ্গিটা কি জানো ভায়া ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে। ভালো একটা শাড়ি তোলা ছিল, বড় পাতলা, সেইটে পরতে হ'ল—তা, বলে কিনা লজ্জা করে। তোমার

লুঙ্গিটা দাও, সায়ার মতো পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হ'ল, তোর লজ্জা কিসের? ওসব পাট চুকিয়ে দিলেই হয়। তা লজ্জাবতীরা মরলেও কি তা বুঝবে?'

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ি কটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'বাকি দিলে একটা নিতাম। তা, বাকি তো তুমি দেবে না ভায়া।'

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'আপিস থেকে ফিরে পরবেন কি?'

'গিন্নী যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।'

অঘোর চলে গেলে বাণী শুধোয়, 'ঘরে বসে কত রোজগার হ'ল?'

'রোজগার কোথা হ'ল? এক বাড়িতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হ'ল।'

'অ কপাল। আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হ'ল। বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়। আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।'

জলের ফোঁটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁই শাক কুটতে বসে নিজের গাটা একেবারে বাঁচাতে পারে নি, টপটপ করে বাঁ কাঁধে জল পড়ছে।

এবেলা শুধু পুঁই শাকের চচ্চড়ি। বাড়িতে ডাল নেই এক দানা। হাত একেবারে শূন্য নয় জীবনের। ক'দিনের মাল বেচার টাকা বাক্সে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তরকারি এমনভাবে একটু বেশী কেনার উপায় নেই যাতে আকাশ ভেঙে বর্ষা নামলে একটা বেলা চলে যায়।

ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে—খরচ করা যায় না। এ অবস্থায় এ-যে কি অসহ্য সংযম মানুষের জীবন ছাড়া কে বুঝবে।

দুপুরে বৃষ্টি থামে। মেঘ সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে নীল আকাশ। রোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেরোবার জন্য তৈরি হয়। বীণা বলে, 'ভাতের হাঁড়ির দামটা রেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।'

হাঁড়ির দামটা তার হাতে দেবার সময় জীবন ভাবে, সেও যদি বাকি টাকার জন্য গাল দিতে পারত ওই বৌটিকে!

কাঁধে পসরা চাপিয়ে সে বেরিয়ে যাবে, অঘোরকে জামা পরে ঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'আপিস যাননি দাদা?'

'যা বিষ্টি, কি করে যাই বল?'

অঘোরের তবে ভালো আপিস, বৃষ্টির দোহাই মানে!

'কোন্ দিকে যাবেন?'

'আপিসেই যাচ্ছি।'

ফেরিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় রোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, ক'দিন বাদ দিয়ে তবে আবার সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টির কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা চালিয়ে দেয় দূরের সব চেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়ার দিকে। ওখান থেকে বাজার খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সেজন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েরা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকার মেয়েরা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি করা মধ্যবিত্তের অনেকগুলি অন্তঃপুর।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ি থেকে জীবনকে ডেকে চার পাঁচটি মেয়ে বৌ কাপড় দেখছে, বাইরে আরেক জনের ডাক শোনা যায় : ছিট্ কাপড়—সায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েরা। কাঁধে ছিটের থান আর পিঠে সায়া ব্লাউজ ফ্রকের পুঁটলি নিয়ে আপিসের কেরানী অঘোরকে ফেরিওলাদের দুপুরবেলা আসরে নামতে দেখে জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে।

অঘোর হেসে বলে, 'অবাক হয়ে গেছ ভায়া ? বলব'খন সব বলব'খন।'

দু'জনেরি বিক্রি হয়। জীবনের লাল কালো পাড়ের শাড়িটা কিনে নেয় মাঝবয়সী একটি বৌ, ভালোই লাভ থাকে জীবনের। অঘোর বেচে দু'টি ব্লাউজ। তার রকমসকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিরি করতে নামে নি। সেও পাকা ফেরিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোর বলে, 'ক-মাস চাকরি গেছে। চাকরি জোটে না, কি করি, ভাবলাম তোমার রাস্তাই ধরি। বসে খেলে চলবে কেন ?'

'তা গোপন করছেন কেন ? ফিরি করেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা ?'

'লজ্জা না কচুপোড়া ? যার পেট চলে না তার আবার লজ্জা। কি জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায় ? এই ভয়ে ফাঁস করি নি কিছু। যাবার সময়-বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিও না ভায়া।'

'জেনে কি তা করতে পারি দাদা ?'

'ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার করি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে ছিট কাপড় সায়া ব্লাউজ হাঁকব !'

দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই। দু'দিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও একটু ঘুরে পথ ধরে খানিকটা বেশী হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বৌটির বাড়িতে একবার সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওর স্বামী যদি কাজ থেকে ফেরে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলা ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পা-জামা পরা একটি যুবক।

পাশের দিকে বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, 'এ ঘরের বাবু আছেন ?'

সে উদাসভাবে বলে, 'আছে বোধহয়। ডেকে দ্যাখো।'

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোট মেয়েটি।

'তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকি ?'

'বাবা তো বেরোয় নি। বাবার জ্বর।'

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, 'কেরে রাখি ?'

'সেই কাপড়ওলাটা।'

গায়ে একটা জীর্ণ সতরঞ্চ জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিরিওলাকে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলেই প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

লেভেল ক্রসিং

দুর্ঘটনায় গাড়িটা জখম হয়। অল্পের জন্য বেঁচে যায় ভূপেন, তার মেয়ে ললনা এবং ড্রাইভার কেশব। খানিকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে না।

ললনা-থর-থর করে কাঁপে।

রুমালে চশমা মুছে, মুখ মুছে ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, এটা কিরকম ব্যাপার হ'ল কেশব? তুমি তো কাঁচা ড্রাইভার নও?

কেশব বলে, সেইজন্যই বোধহয় প্রাণে বেঁচে গেলাম আজ!

কেশবের নিজের তবে কোনো দোষ নেই। তার অবহেলা বা বিচ্যুতির ফলে দুর্ঘটনা ঘটে নি। নইলে গাড়িটা এভাবে জখম করিয়েও সে এমন ঝাঁজের সংগে কথা কইতে পারে?

ললনা ঢোঁক গিলে বলে, কি জন্য হ'ল এরকম?

—স্টিয়ারিং বিগড়ে গেল হঠাৎ।

—তাই নাকি? ও!

—আস্তে গাড়ি চালাই বলে রাগ করেন। জোরে চালালে আজ তিনজনে না মরলেও জখম হতাম। আমার মন বলছিল হঠাৎ গাড়ি বিগড়ে যাবে। একটা পুরানো রদ্দি মাল……

ললনা ভূপেনকে বলে, খুব তো বিশ্বাস করেছিলে সলিলবাবুকে? বন্ধুর ছেলে কি কখনো ঠকাতে পারে!

ভূপেন আপসোস করে বলে, নাঃ, মানুষকে সত্যি বিশ্বাস নেই। ভদ্রঘরের শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে……

আপসোস করে লাভ নেই। ভূপেন জরুরী কাজে বেরিয়েছে, যথাসময়ে যথা-স্থানে তাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। ললনা বেরিয়েছে সিনেমা দেখার জন্য, রাস্তায় তাকে সিনেমা হাউসটার সামনে নামিয়ে দেবার কথা। সিনেমা দেখাটা অবশ্য জরুরী কোনো কাজ নয়।

ললনা বলে, তুমি ট্যাক্সি করে চলে যাও বাবা। আমি বাড়ি ফিরে যাব। গাড়ির ব্যবস্থা আমরা করছি।

ভূপেন চলে গেলে ললনা বলে, আপনি তাহলে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন?

—নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

গাড়ির ব্যবস্থা করার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে ললনা অনায়াসেই বাড়ি চলে

যেতে পারত কিন্তু জখম গাড়িতে বসে কেশবের সঙ্গে কথা বলে।

তার নিজের সম্পর্কে, তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা বিবরণ জানবার কৌতূহল গোড়ার দিকে বড়ই বিব্রত করত কেশবকে। মনে মনে বিরক্ত হতো, রেগেও যেত।

ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছে ললনার দোষ নেই। তার মধ্যে এ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে সে নিজেই। বড়লোকের একেলে স্মার্ট মেয়ে হোক, লেখাপড়া আর গান দুয়েই দখল থাক, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর আসর জমিয়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাক, তার একটা হৃদয় আছে সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন।

বাড়ির মাইনে-করা ড্রাইভার হলেও জোয়ান মানুষটার অদ্ভুত ঘর-টানের মানে জানবার কৌতূহল সে-হৃদয়ে জাগতে পারে বৈকি।

সারাদিন ডিউটি দিয়ে কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য শহরতলিতে তার পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িতে ফিরে যায়।

শহরের শৌখীন এলাকায় ভূপেনের আধুনিক ফ্যাসানের নূতন রঙ করা বড় বাড়ি। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোট হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতিবছর বাড়িটির আগাগোড়া চুন ফেরানো রঙ লাগানো হয়, কেশবের জন্য বরাদ্দ ঘরটিও বাদ যায় না।

স্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূরে বোসপাড়া,সেখানে ইট বার-করা নোনায় ধরা সেকেলে দালানের ছোট ছোট ঘর, আলকাতরা মাখানো ছোট ছোট জানলা দিয়ে ভালো আলো-বাতাস খেলে না, ঘরের ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে বোঝাই।

ওরকম একটা ঘরে রাত কাটাতে কষ্ট করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ির সেই একঘেয়ে শাক-চচ্চাড় কুচো-চিংড়ির বদলে বড়লোকের বাড়ির আধুনিক রুচিকর পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন ঘর ও সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ির টানটাই কেশবের ঢের বেশী জোরালো।

রাত বেশী না হলে স্টেশন পর্যন্ত ট্রাম-বাস পাওয়া যায়। কিন্তু স্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ওসব বালাই নেই।

বোসপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোট-বড় নতুন পাকা বাড়ি আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারী দোকান ও লন্ড্রী, হেয়ার-কাটিং সেলুন এসবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচা-পাকা বাড়ির, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুরের সঙ্গে মেশানো শহুরে বস্তি আর কাঁচা নর্দমার।

বাগান-বাড়ি আছে দু'চারটা। কিছু লোকের ছোটখাটো বাসভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও সখের সুগন্ধি ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে।

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।
তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই!
বিশেষ কারণে রাত বেশি হলে ট্রাম-বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয়। ললনাদের বাড়ি থেকে স্টেশন প্রায় আধ-মাইল রাস্তা।
ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিয়াত্তর বছরের বুড়ী মাকে রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।
কেশব বিয়ে করে নি।
অর্থাৎ আলোয় ঝলমল খোলামেলা পরিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়িতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘর থাকতে, ভালো খাওয়া পাওনা থাকতে, নিজের বাড়িতে আপনজনের মধ্যে শুধু কয়েক ঘন্টা ঘুমোনোর জন্য ফিরে যাওয়া।
তার কি কোনো মানে হয়?
সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা-বোন মাসী পিসী ভাই-ভাজদের যে সংসারে নিজে সে প্রায় পরের মতো হয়ে গেলেও যারা আজও তার আপনজন।
জখম গাড়িটাকে টেনে গ্যারেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে ললনা বলে, চলুন না দুজনে সিনেমায় যাই? গাড়িটা যখন নেই, আমি গাড়ির মালিকের মেয়ে আর আপনি ড্রাইভার এ তফাতটাও এখন ভুলে যাওয়া যেতে পারে।
বোঝা যায়, এটা তার ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে বসা প্রস্তাব নয়। এতক্ষণ তাকে জেরা করে আলাপ চালিয়ে যাবার সময় কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল।
কেশব আমতা আমতা করে বলে, ছুটি যখন পেয়ে গেলাম, বাড়ি ফিরব ভাবছিলাম।
ললনা আহত হয় না, রাগও করে না, আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, আমি শীগ্‌গির একদিন যাব আপনাদের বাড়িতে, দেখে আসব কি আছে সেখানে, বাড়ি যেতে আপনি এত পাগল কেন! সিনেমা দেখে বাড়ি গেলে চলে না?
—সিনেমা দেখতে আমার বিশ্রী লাগে।
—বিশ্রী সিনেমা দেখতে যান বলে। বন্ধুরা কত টানাটানি করে, আমি ওসব সস্তা সিনেমায় কখনো যাই দেখেছেন?
কেশব ম্লান মুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, একটা সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন? আমার কি রকম অস্থির অস্থির করছে, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।
ললনার মুখ বিবর্ণ দেখায়।
—আপনার কি কোনো অসুখ আছে? আপনার চেহারা দেখে তো···
—কোনো অসুখ নেই। ডাক্তার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছে, কোনো খুঁত খুঁজে পায় নি। কষ্ট যেটা হয় সেটাও অদ্ভুত। মাথা ঘোরা নয়, এমনি যন্ত্রণা নয়, ভেতর

থেকে কি যেন চাপা দেয়। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? কোথাও ছুটে পালাই।

ললনা ম্লান মুখে বলে, তাহলে বাড়িই যান।

কেশব চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু ভাবে।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা চলুন তো সিনেমাতেই যাই আপনার সঙ্গে, দেখি কষ্টটা কমে কিনা। প্রশ্রয় না দিয়ে এটাকে জয় করার চেষ্টা করা যাক!

—খুব বেশি কষ্ট হলে…

—দেখি কি হয়।

দু'জনে সিনেমায় যায়।

হাফ-টাইম পর্যন্ত কোনো রকমে অপেক্ষা করে কেশব বলে, আমি আর পারছি না।

ললনা বলে, থাক্। আমিও আর দেখব না, ভালো লাগছে না। কাল আপনার আসবার দরকার হবে না।

তারপর বলে, আমি ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরব, সে পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আসুন।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ভুপেনের আলোয় ঝলমল বাড়িটার সামনে নেমে কেশব আরেকবার জিজ্ঞাসা করে, কাল তাহলে না এলে চলবে?

ললনা বলে, কাল এসে কি করবেন? এবার নিজেরা দেখে শুনে একটা নতুন গাড়ি কিনতে হবে। পরশুর আগে বাবার সময় হবে না।

ললনা এমনিভাবে কথা কয় যেন কেশবের মতো তারও যেন ভিতরে কিছু চাপ দিচ্ছে।

কেশব ট্রামে স্টেশন পর্যন্ত যায়। স্টেশনের পাশে লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই শহরতলির একেবারে অন্যরকম চেহারা।

রেলপথটা আলোয় ঝলমল বড় বড় অট্টালিকার শহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ি আধ অন্ধকার শহরতলিকে পৃথক করে রেখেছে। এপারে সীমা কর্পোরেশনের, ওপারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাচপ্যাচ করছে। এখানে ওখানে গর্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কি ভিড় মানুষের!

শুধু ময়লা জামাকাপড় পরা বা অর্ধ উলঙ্গ গরিব মানুষের ভিড় নয়। ফিটফাট্ বেশধারী বাবু মানুষ, স্যুট পরা সাহেব মানুষ এবং ভালো শাড়িপরা ভদ্রমহিলাও এ পথে হাঁটছে, দুপাশের দোকানে কেনাকাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজগিজ করছে সব বয়সের ভদ্রাভদ্র মেয়ে পুরুষ।

পরের শো'র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধোয়, আজ সকাল সকাল ?
কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।
অফিস করা শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আরামের চাকরি! পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।
কেশব মুখ বাঁকায়।
: করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে, জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম!

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকান পাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়িগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবড়োখেবড়ো খোয়ায় তৈরি এই প্রধান রাস্তা থেকে দু'পাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইটের গলিগুলি। বাগচী পাড়ার ফাঁকা জায়গায় বাজারটা খাঁখাঁ করছে দেখা যায়। এখানে সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবাপুকুর এলাকার মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কি এসপ্লেনেডের মতো আলোয় ঝলমল করে? —এটাও বৈদ্যুতিক বাতি, এদিকে তাকিয়ে ঘরের ডিবার লণ্ঠন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ভেজাল তেল দিয়ে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার সলতে পাকিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে। এটাতো নিছক কাচের খেলনার আলো।

কেশব একটু দাঁড়ায়। এখন মনে হয়, কত দূরে যেন ফেলে এসেছে লেভেল ক্রসিং-এর ওপারে ললনাদের শহর, মন থেকে যেন প্রায় মুছে গেছে চোখ-ঝলসানো আলো, শহরের জমকালো রূপ আর গাড়ি ও মানুষের কলরব।

সেও এই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে—সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকাবাজিতে। নইলে ললনার অত আগ্রহ সত্ত্বেও সিনেমা গোটা শেষ পর্যন্ত না দেখে কিসের আকর্ষণে সে ছুটে এলো এই আধা অন্ধকার ডোবার সোঁদা দুর্গন্ধে ভারি বাতাসের গেঁয়ো এলাকায়?

শরতের মনোহারী ও মুদিখানা মেশানো দোকানের বাল্‌বটা জোরালো আলোই দেয়। কেশব দোকানে দু'পয়সার নস্যি কিনতে যায়।
নস্যি দিয়ে শরৎ তার হাতে একটা ঠোঙা দেয়, বলে, গুড়টা বাড়িতে পেঁছে দেবে? ছোঁড়াছুঁড়িগুলি কি মিষ্টিটাই খেতে পারে!
প্রৌঢ় শরতের মুখে একটা শান্ত নিরুত্তেজ ভাব,জীবনে তার যেন কোনো রস-কষ

নেই স্থানীয় স্কুলে বাংলা পড়ায় আর এই দোকানটা চালায়, নীরস একঘেয়ে হয়ে গেছে তার জীবনের লড়াই।

শরতের দোকানের পাশ দিয়ে কেশব দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ায় ছাড়া ছাড়া থোক থোক ঘন বসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়তো আট দশটি বাড়ি, তার পরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ পুকুর বাগান ঝোপ জঙ্গল। বড় বড় বাড়িগুলি আর নতুন যে বাড়ি উঠেছে সেগুলিই কেবল পুরানো বাড়ির কোনো একটা কোণ না ঘেঁষে কম বেশী তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শহরে এখন রাত বেশী হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও অনেকটা নিঝুম হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোক খুব কম। মাঝে মাঝে কোনো দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড্ডা, কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করা, দু'একটা বাড়িতে আবার কিন্তু রেডিও বাজছে।

প্রকাণ্ড বটগাছটার লাগাও সাদা চুণকাম করা চোকো একতলা বাড়িটা আবছা আঁধারে বড়ই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্বরার গন্ধ। তবু তারাভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথর জমকালো বটগাছটা যেমন জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনি সাধারণ ইটের বাড়িটির ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মতো রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

দালানটার ভিতরে ছোট একটু উঠান আছে। এদিকে বেড়ায় ঘেরা বাগান। মাচা আছে তিনটি, লাউ কুমড়ো আর উচ্ছে গাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুল ফোটে।

রান্না হয় দালানের একটু তফাতে কাঁচা চালাঘরে।

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

মায়া উনানে তরকারি চাপিয়ে শরতের ছেলে গণেশের গায়ের ঘামাচি মারছিল, কেশবকে দেখে তার মুখে একটু অদ্ভুতরকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি ফোটে।

কেশব বলে, শরৎদা গুড় পাঠিয়েছে।

গুড়ের ঠোঙাটা রেখে মায়া গণেশের চিবুকে চুমু খেয়ে বলে, এবার পড়তে যাও তো মানিক। আর পাহারা দিতে হবে না।

দালান কাছেই, মানুষ কথা বললে শোনা যায় কিন্তু সন্ধ্যার পর চালাঘরে একা রাঁধতে মায়ার ভয় করে। একজনকে তার সঙ্গে থাকতে হয়।

চালার এপাশে কাছাকাছি আর বাড়ি নেই, গাছপালা জঙ্গল আর পুকুর। তার ওদিকে কেশবের বাড়ি।

কেশব তামাশা করে বলে, সন্ধ্যারাতে এত ভয়?

মায়া বলে, ভয় করবে না? ওই আঁধার জঙ্গল, গণেশ ছিল তবু গা-টা ছমছম

করছিল।

বছরখানেক আগেও ডিবরি জ্বলত এ ঘরে, আজকাল শালের খুঁটির গায়ে বসানো ল্যাম্প আলো দেয়।

মায়া বলে, মুখ শুকনো দেখছি ? খুব খাটিয়েছে বুঝি আজ ?

—না সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

—তবে ?

—একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙীন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কি রকম পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেছে মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই আর ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে দেখে অনুমান করা যায় সে কি রকম ভড়কে গেছে।

মায়া রূপসী কিনা বলা কঠিন। তবে তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানায় তার লাবণ্য ঢল ঢল করছে। সস্তা তাঁতের শাড়িটাই যেন তাকে ভালো মানিয়েছে।

কেশব হেসে বলে, কি হলো ?

মায়া ঢোঁক গেলে।

চাপা সুরে বলে, ওই আবার কালী আসছে। দুদণ্ড ভালো করে কথা কইবার উপায় নেই।

শরতের মেয়ে কালীর বয়স বছর এগার, এই বয়সেই সে ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ডুরে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে বেণী দুলিয়ে এসে কেশবের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে সে মায়ার কাছে আব্দার জানায়, খিদে পায় না, ঘুম পায় না মাসীমা ? কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝঙ্কার দিয়ে বলে, রান্না বাকী আছে না কি আমার ? এবার তরকারি নামাব। ডেকে আনো গে' সবাইকে, ঠাঁই করে নিয়ে বোস। লণ্ঠন আনিস।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে কাছে এসে বলে, বুকটা ঢিপঢিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। কি হয়েছিল সব যতক্ষণ না শুনেচি বুকের কাঁপুনি যাবে না। এক কাজ কর, জামা কাপড় ছেড়ে এসে দালানে সবাইকে বলবে ঘটনা কি হয়েছিল, আমিও শুনব। কালী ছুঁড়ি দেখে গেল, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবার ঝাড়বে।

কেশব বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে এসেছিল এবার সে দালানের ভিতর দিয়ে ফিরে যায়।

দালানের ভিতরে বারান্দায় শরতের বড় ছেলে রঞ্জন পড়ছিল, কেশবকে দেখে সে বলে, কেশবদা কোন্ দিক দিয়ে এলে ?

কেশব বলে, শরৎদা ঠোঙায় গুড় দিয়েছিল, রান্নাঘরে মায়াকে দিয়ে এলাম।

ঘর থেকে অবলা জিজ্ঞাসা করে, কেশব নাকি ? বসবে না ?

অবলার হয়েছে পক্ষাঘাত। আজ বছর তিনেক দিবারাত্রি তার বিছানায় শুয়ে কাটছে। সেটাই বোনকে আনিয়ে কাছে রাখার কারণ, তার আধ ডজন ছেলেমেয়ের সংসারটা মায়াকে দেখাশোনা করতে হয়।

কেশব বলে, আজ, একটা অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে মরছিলাম প্রায়। জামাকাপড় ছেড়ে এসে বলছি ব্যাপার।

কেশবের বাড়িতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজ ভায়ের বৌ, তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসী ও তার ছেলে।

ছোট ছোট কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল করলেও ঘরের জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজভাই প্রণব এবং পিসীর ছেলে ভোলার বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসী পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবের ভয়ে কিছু করতে পারে না। কে জানে কি রকম বিবেচনা কেশবের। ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন—চাকরি পেয়ে হোক, ফিরিওলাগিরি কুলিগিরি করেই হোক। পাকাঘরে দুধে-ভাত কিংবা ভাঙা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটাবে, যেমন অদৃষ্টে আছে।

কিন্তু বয়স গেলে যে বিয়ে করার সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়স বিয়ের, আসল রস আর আনন্দ পাবার।

জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফসকে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোনো দাম তার কাছে নেই।

শহর থেকে এটা ওটা আনার ফরমাশ ছিল দু'তিন জনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিস নি তো?

কেশব বলে, না। আমি বলে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে মরছিলাম—

: মাগো! বলিস কিরে? ভগবান দীনবন্ধু!

ফরমাশী জিনিস না আনার জন্য যারা অনুযোগ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তারা একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভালো। আধ ডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনী।

অনেকটা দেরি করে গিয়ে সে দেখতে পায় শরৎ ইতিমধ্যে দোকান বন্ধ করে বাড়ি এসেছে।

সে বলে, অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে নাকি শুনলাম? তুমি যে বাড়িসুদ্ধ আমাদের

ভাবিয়ে রেখে গেলে।

মাদুর পেতে তাকে বসতে দেওয়া হয়।

ঘর থেকে অবলা বলে, একটু জোরে জোরে বল কেশব। তোরা কেউ টুঁ শব্দটি করবি না।

কেশব দুর্ঘটনার কথা বলে যায়, শরতের চার বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মায়া কাছে বসে শোনে।

লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ মুখ দিয়ে অস্ফুট ভয়ের আওয়াজ বার হয়।

তার কাহিনী বলা শেষ হলে অবলা বলে, তবু ভাগ্যি!

মায়া মন্তব্য করে, হাত-পা জখম হতে পারে, প্রাণ যেতে পারে, এমন কাজ না করলেই হয়!

—কাজ না করলে খাব কি ?

—আর কি কাজ নেই জগতে ?

—যে কাজ জানি সেটাই করছি। অ্যাকসিডেন্ট হয় বলে লোকে মোটর হাঁকাবে না ?

এত দরদ এত সহানুভূতি নিজের বাড়িতে এবং এই পরের বাড়িতেও! তবু যেন আর প্রাণটা ভরতে চায় না কেশবের। কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব কিছু।

বাড়ি যাওয়ার সময় যেন ওজন আরও বেড়ে গেছে মনে হয় বিষাদ ও অবসাদের। আরও নিঝুম হয়ে গেছে বোসপাড়া, ঘরে ঘরে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ। কিসের টানে সে ছুটে এসেছিল ব্যাকুল হয়ে ? এত শান্ত ও রিক্ত চারিদিকের জীবন এখানে। এই বিষাদ আর অবসাদ নিয়ে সহজে ঘুম আসবে না, ভোঁতা রাত্রি জেগে শুনবে ঝিঁঝির ডাক।

খেয়ে উঠে কেশব নিজের ঘরে যায়। তার ঘরেরটি ছাড়া বাড়ির অন্য আলো এবং শরতের বাড়ির আলো প্রায় এক সময়েই নিভে যায়।

আলো হয়তো জ্বালা আছে কোনো কোনো বাড়ির ঘরে কিন্তু সে আলো জ্বলছে অন্য প্রয়োজনে, তার মতো ঘুম আসে না বলে অগত্যা কিছু পড়ার জন্য আলো জ্বালিয়েছে ক'জন ?

জঙ্গলের দিকের জানলার বাইরে থেকে মায়ার চাপা গলার কথা শুনে কেশব চমকে যায়!

—শুনছ ? একটা কথা শোন ?

—মায়া ? তুমি ?

—আলোটা নিভিয়ে দাও।

কেশব আলো নিভিয়ে জানলার কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই জঙ্গল দিয়ে একা এলে ?

—কি করব ? তুমি তো রাত থাকতে উঠে কাজে চলে যাবে।

—কাল আমার ছুটি। তোমার ভয় করল না ?
—করল বৈকি। বড় ভয় দিয়ে ছোট্ট ভয় ঠেকিয়ে চলে এলাম।
কেশব একটু ভেবে বলে, ঘরে আসবে ? না আমি বাইরে যাব ?
মায়া বলে, তুমি যা বল।
—থাক, আমিই আসছি। কে কোন্ ঘর থেকে দেখে ফেলবে ঠিক নেই। আমায় যেতে দেখলে ভাববে ঘাটে যাচ্ছি।
খিড়কি খুলে কেশব বেরিয়ে যায়। কিছু তফাতে সরে গিয়ে তেঁতুল গাছটার তলায় গাঢ় অন্ধকারে তারা দাঁড়ায়।
—কি ব্যাপার মায়া ?
—আমি থাকতে পারলাম না। আমার দম আটকে আসছিল। আমায় কথা দাও এ কাজ তুমি ছেড়ে দেবে।
টের পাওয়া যায় মায়া কাঁদছে।
কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? গাড়ি মেরামত হতে গেছে, কাল দিনটা আমার তো ছুটি।
কান্না থামিয়ে মায়া বলে, ও!
তারপর উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিরক্ত হলে মনে হচ্ছে ?
—পাগল ! তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবছা ভোরে কেশব পুকুরে গিয়ে নেয়ে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে গা মুছছে, মায়া একটা গেলাস হাতে করে এসে বলে, চট করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল।
গেলাসে এক পোর বেশী দুধ।
—এ আবার কি ব্যাপার ?
—যে গাইটা বিইয়েছিল, আজ থেকে তার দুধ খাওয়া হবে। রোজ খানিকটা টাটকা দুধ খেতে হবে তোমায়।
কেশব বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু দুধ কম পড়লে বাড়িতে কি বলবে ?
মায়া হেসে বলে, কত খেয়াল রাখছে বাড়ির লোক। গাইটাও তো দুইতে হবে আমাকেই ! খেয়ে নাও, কে কোথা থেকে দেখবে।
অগত্যা দুধের গেলাসে কেশবকে চুমুক দিতে হয়। বাচ্চা বাছুর, দুধ খুব পাতলা। কিন্তু ঠিক সে জন্য যেন নয়। মায়ার গায়ে পড়ে দরদ করার জন্যই যেন তার লুকিয়ে আনা দুধটা বিশেষরকম বিস্বাদ লাগে কেশবের কাছে।
—এত ভোরে নাইছ কেন ?
—শহরে যাব।
—আজ না তোমার ছুটি ?
—অন্য কাজে যাব।

এটা বানানো কথা। কেশবের কাজ কিছুই নেই।

ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে শহরে যাবার জন্য তাই কেশবকে যেতে হবে। সে অনুভব করে ভিতরে কি যেন প্রচন্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মতো ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরের দিকে। কর্মব্যস্ত শহরের কলরব কানে না এলে, দামী ফুলের বাগান ও লনের ধারে গ্যারেজের পাশে তার পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় বসে বাড়ির ভিতর থেকে ললনার গানের সুর ভেসে আসা না শুনলে তার যেন দম আটকে যাবে।

কিন্তু কেশব জানে, সারাদিন পর আবার সে পাগল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল শহর থেকে এই অন্ধকার বোসপাড়ায় ফিরে আসার জন্য। লেভেল ক্রসিং-এর দুটি দিক পালা করে তাকে কাছে টানবে আর দূরে ঠেলে দেবে।

চুরি চামারি

লোকেশ মাইনে পেল চার তারিখে। রাত্রে তার ঘরে চুরি হয়ে গেল।

সেদিনও আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে লোকেশের রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। কোথাও আড্ডা দিতে সিনেমা দেখতে বা নিজের জরুরী কাজ সারতে গিয়ে নয়, সোজা আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই দেরি।

ছোট বেসরকারী আপিস—যদিও আধা-সরকারীভাবে সরকারের সংগে যোগ আছে। লোক খাটে কম—যত লোকের খাটা দরকার তার চেয়েও কম।

এমনিতেই দু'একঘন্টা বেশী খাটিয়ে নেয় ওভারটাইম না দিয়েই, মাসকাবারে ক'দিন আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত আপিসে থাকতে হয়। খুব সোজা কৌশল, বেতন দেবার সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েও সময়মত বেতন না দিয়ে আটকে রেখে খাটিয়ে নেওয়া।

এবং এমনি তাদের প্রচন্ড প্রয়োজন মাসকাবারী বেতনটার যে আশায় আশায় রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত কাজ করে যায়।

মাইনে অঘোর দেবে, না দিয়ে উপায় নেই। আজ দিলেও তো দিতে পারে?

অঘোর বলে, বসে থাকবেন না, বসে থাকবেন না, মাইনে পান খেটে খান—এভাবটা ভুলতে চেষ্টা করুন। ওরকম ভাববে কারখানার কুলিরা। মনে রাখবেন, বড় মন্দার বাজার। আপিস টিকে থাকলে তবেই আপনারা টিকে রইলেন আপিসের উন্নতি হলে তবেই আপনাদের উন্নতি।

তারা গুজগাজ ফোঁস-ফাঁস করে। চাপা গলায় কেউ গর্জে ওঠে, দুত্তোরি তোর—ক্ষোভ বুকে নিয়ে তবু কাজ করে যায়। কৌশলটা খাটছে না দেখলে অঘোর হয়তো চটে গিয়ে আরও বেতন গোনা একদিন পিছিয়ে দেবে শোধ নিতে।

কদাচিৎ পয়লা দোশরা তারিখেও বেতন মিটিয়ে দেয়: যে তারিখেই মাইনে পাক তারা সই করে পয়লা তারিখে পেয়েছে বলে।

উদ্বেগ চেপে রেখে ছবি প্রশ্ন করে, পেয়েছো আজ?

—পেয়েছি।

নোট কটা ছবির হাতে দিয়ে সে জামাকাপড় ছাড়তে থাকে।

মুখ হাত ধোয়া হতে না হতে ঘরের বাইরে বাড়িওলা সুরেনের গলা শোনা যায়

—আছেন নাকি লোকেশবাবু?

লোকেশ ঘরের ভেতর থেকেই বলে, আছি মশায়, আছি। এত অস্থির হন কেন?

সারাদিন খেটেখুটে এলাম, সকালে দিলে হতো না ?
—দেয়ারটা দিলেই চুকে যায়।
ছবি বলে, দিয়ে দাও চুকে যাক।
সুরেনকে ঘরখানার ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে খেতে বসে ক্ষুব্ধ লোকেশ বলে, কই আমরা তো পাওনা টাকা এভাবে আদায় করতে পারি না ? প্রত্যেক মাসে মাইনে দিতে টালবাহনা করবে, বেশী বেশী খাটিয়ে নেবে।
—খাটেন কেন ? জোর করে বলতে পারেন না পয়লা তারিখে মাইনে চাই, বেশী-ক্ষণ খাটালে পয়সা চাই ?
রুটি চিবোতে চিবোতে লোকেশ একটু ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, আপনি কি বুঝবেন বলুন ? কম লোক, ইউনিয়ন ফিউনিয়ন নেই, যে তেড়িবেড়ি করবে তাকে দেবে খেদিয়ে। আমরা কি বলাবলি করি না ভেবেছেন যে এসব অন্যায় আর সইব না ? কিন্তু ওই বলাবলিই সার হয়। একজনকে এগিয়ে হাল ধরতে হবে তো ? যে এগোবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করবে। ব্যাটা এক নম্বর চামার।
ছবি গোমড়া মুখে বলে, সত্যি। যা-দিনকাল, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি হঠাৎ চলে গেলে—
সে যেন শিউরে ওঠে।

রাত্রে দুজনেই তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়। কাল দোকানের ধার দুধের দাম এসব মিটিয়ে দেওয়া যাবে। রেশন আসবে, অনেকদিন পরে আধপো মাছ এনে স্বাদে গন্ধে ভাত খাবে। ছবির জন্য শাড়ি একখানা চোখ কান বুজে কিনে ফেলা হবে কিনা সেটাও ঠিক করে ফেলা যাবে।
ঘুমের মধ্যে রাত্রে চুরি হয়ে যায়।
তারা টেরও পায় না।
ভোরে অন্য লোকের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে দ্যাখে এই ব্যাপার !
পাড়াতেই দু'তিন ঘরে চুরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে, তাদের ঘরে চুরি হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু জানালার বাঁকানো শিক, খোলা দরজা আর তাদের যথা সর্বস্বের শূন্যস্থান দেখেও যেন তাদের বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যসত্যই তাদের ঘরে চুরি হয়ে গেছে।
কেবল দু'টি মানুষ বলেই সামান্য মাইনেতে তাদের একখানা ভাড়াটে ঘরে মুখ গুঁজে কোনোরকমে চলে যায়, তাদের ঘরে চুরি ? পাড়াতেই তো কত পয়সাওলা লোক আছে, এ বাড়ির দোতলাতেই বাস করে বাড়িওলা সুরেন—ওদের বাদ দিয়ে তাদের ঘরে হানা দেবার জন্য এত হাঙ্গামা করার তো কোনো মানেই হয় না !
তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।
লোক জড়ো হয়েছে, জিজ্ঞাসা মন্তব্য আর এখন তাদের কি করা কর্তব্য সম্পর্কে

উপদেশ দেওয়া চলছে, নিঃশব্দে তলার কাঠ কেটে চোরেরা কি করে এত মোটা শিক বাঁকিয়ে দিল তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ও জল্পনা-কল্পনা চলছে—কিন্তু লোকেশ আর ছবির কাছে কিছুতেই যেন ঠিকমতো গুরুতর হয়ে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা।

সুরেন বলে, দেখলেন তো মশায়? ভাগ্যে ভাড়াটা আদায় করে নিয়ে গেছলাম, নইলে ওই টাকাটাও গচ্চা যেতো আপনার।

শুনে লোকেশের যেন হাসি পায়।

যার একরকম সর্বস্ব চুরে গেছে, ভাড়ার ওই কটা টাকা বেঁচে গেছে বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা!

এই কথাটা উল্লেখ করে ছবিও পরে বলেছিল, আমার কান-পাশা যে বাঁধা দিয়েছিলে সেটাও তাহলে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে!

ঘরে ছিল একটি ট্রাংক, একটি চামড়ার সুটকেশ একটি হাতবাক্স, তাকে সাজানো কিছু বাড়তি বাসন আর আলনায় সাজানো জামাকাপড়। এ সব কিছুই চোরেরা রেখে যায় নি!

নিত্য ব্যবহারের অর্থাৎ গায়ের গহনা আর রান্না খাওয়ার বাসনগুলি আছে। আটগাছা চুড়ির মধ্যে চারগাছা আছে হাতে, গলায় হারটা আছে আর কানে দুল। অন্য ভাড়াটের সঙ্গে সিঁড়ির নিচেকার ছোট্ট ঘরটিতে তাদের রান্না হয়, ওঘরে থাকায় মাজা বাসন কটা রয়ে গেছে।

আর সমস্ত কিছুই চোরে নিয়েছে। সোনা রুপার গয়না ও উপহার দ্রব্য, বিয়েতে এবং অন্যভাবে পাওয়া সমস্ত দামী জামাকাপড়—সাধারণ ভালো জামাকাপড় কটা পর্যন্ত!

আলনাটা পর্যন্ত খালি করে নিয়ে গেছে!

এটাই যেন সকালে তাদের পীড়ন করে সব চেয়ে বেশী!

পরনের লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি ছাড়া কিছুই নেই লোকেশের যে পরে আপিস যাবে!

লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা পরে বেরিয়ে রাস্তায় যে জামাকাপড় কিনে নেবে তারও উপায় নেই, সারা ঘর হাতড়ে বেড়ালে দুটো তামার পয়সা মিলবে কিনা সন্দেহ!

পয়সাকড়ি সব ওই হাত-বাক্সটায় থাকত।

তারপর আছে পেটের ব্যাপার। রেশন আনলে, বাজার করলে তবে খাওয়া জুটবে।

ছবির মুখে সত্যই এক ঝলক হাসি ফোটে। চোরেরা যেন তাদের জন্য একটা ভারি মজার অবস্থা সৃষ্টি করে গেছে।

—খাওয়া তো পরের কথা; এক ফোঁটা চিনি নেই যে তোমায় এককাপ চা করে

দেব।
এতক্ষণ বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল লোকেশের মুখ, ছবির কথা বলার ভঙ্গিতে তার মুখেও হাসি ফোটে।
—কটা টাকা ধারের চেষ্টা দেখি। তারপর যা হয় হবে।
ছবির মুখের ভাব শক্ত হয়ে যায়।
—কার কাছে ধার চাইবে? সেদিন যারা দশটা টাকা দিল না, কানপাশা দুটো বাঁধা দিতে হ'ল, আবার তাদের কাছে হাত পাততে যাবে?
লোকেশ বলে, তা নয়। তখন মাসের শেষ, কারো হাতে সামান্য টাকাও ছিল না। নইলে কি রমেশবাবু, তিলকবাবু ক'দিনের জন্যে দশটা টাকা দিত না? এমন বিপদ ঘটল, আজ যার কাছে চাইব সে-ই দেবে।
ছবি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।
—ক'দিনের জন্য তো ধার নেবে, ক'দিন বাদে শোধ দেবে কোত্থেকে? সারামাস চালাবে কি দিয়ে?
লোকেশ গোমড়া মুখে বলে, সে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। উপায় কি?
—থাক্ তোমার আর আবোল-তাবোল ব্যবস্থা করে কাজ নেই। আমি ব্যবস্থা করছি—
বেশ খানিকটা মরিয়া বেপরোয়া মনে হয় ছবিকে। চোরেরা যেন ঘর খালি করে নিয়ে যাবার সংগে তার ভয় ভাবনাগুলিও চুরি করে নিয়ে গেছে।
—আজ আপিস না গেলে হয় না?
—মাইনে পেয়েই কামাই করাটা…
সমস্ত সমস্যা যেন মীমাংসা করে ফেলেছে এমনি ভাবে ছবি বলে, তাহলে এক কাজ কর।
বেলা হয়ে গেছে, রেশন এনে সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরোতে পারবে না। দোকানে চা খেয়ে ওই বুড়ীর কাছ থেকে আধসের চাল আর দোকানের ডিম টিম যা পার এনে দাও—
এবার লোকেশ চটে যায়।
—চা খেতে, চাল ডিম আনতে পয়সা লাগবে না?
—পয়সা আমি দিচ্ছি!
বিয়ের কম দামী খাটের বিছানার তলায় ডান হাতটা প্রায় সমস্তখানি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ছবি বার করে আনে আস্ত একটা পাঁচ টাকার নোট।
বলে, ছ'সাত মাস আগে পাঁচ টাকা হিসেবে মেলে নি মনে আছে? হারিয়ে যায় নি, আমি চুরি করেছিলাম।
তারপর একটু উদ্বেগের সংগে জিজ্ঞাসা করে, চলবে তো? দুমড়ে মুচড়ে গেছে।
লোকেশ বলে, চলবে। একশোবার চলবে। তোমার জন্য চা আনব না?

—আমি মনোদির সাথে খাব'খন। এমন বিপদে পড়েও টাকা চাল ডাল ধার চাইছ না—এতখানি দয়ার বদলে এক কাপ চা না খাওয়ালে চলবে কেন।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে।

ছবি তাগিদ দিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বেলা বাড়ছে না?

—সব তো বুঝলাম। আমি আপিস যাব কি করে?

সে ব্যবস্থা করছি। শুধু চা খাব না, মনোদি'র কাছে রবীনবাবুর একখানা ধুতি ধার করবো। পরশু তরশু লন্ড্রীতে আর্জেন্ট ধুইয়ে ফেরত দিলেই চলবে।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে।—সে তো বুঝলাম। কিন্তু তারপর কি করবো?

—ওর জবাব সেই এক কথা। কি আবার করবে, আপিস যাবার সময় নিয়ে যাবে।

লোকেশদের আপিসে সেদিন কাজে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। কাজ আরম্ভই হয় ঘণ্টাখানেক দেরিতে।

সবাই এসে পেঁছে গেলে লোকেশ সকলকে বলে, টুল ফুল নিয়ে সবাই জড়ো হয়ে বসুন দিকি একসাথে। ভীষণ জরুরী কথা আছে।

তার মুখ দেখে আর কথা শুনে সবাই একটু হকচকিয়ে যায় বটে কিন্তু তাকে ঘিরে বসে সকলেই।

কোনোরকম ভূমিকা না করে লোকেশ জোরের সঙ্গে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আমরা কি কুকুর বেড়াল, যত ইচ্ছা খাটিয়ে নেবে, সকাল ন'টায় শুরু করিয়ে রাত ন'টায় ছুটি দেবে? সময়মত মাইনে দেবে না?

একজন বলতে যায়, তোমার বাড়িতে নাকি চুরি হয়েছে শুনলাম?

লোকেশ বলে, ঘর খালি করে সব নিয়ে গেছে।

সে গল্প পরে বলছি। এখন কাজের কথা শুনুন। আমরা চুপচাপ মেনে নিই বলে আরও পেয়ে বসেছে। আজ আমরা সাফ জানিয়ে দেব যে আমরা আপিস আইনের বাঁধা টাইমের বেশী খাটব না, খাটলে ওভার-টাইম দিতে হবে। ঠিক তারিখে মাইনে দিতে হবে আমাদের।

সকলে নির্বাক হয়ে থাকে।

লোকেশ শান্তভাবেই বলে, ভয় পাবেন না। যা বলার আমিই বলবো অঘোরবাবুকে, আমিই সকলের হয়ে ঝগড়া করবো। আপনারা শুধু আমার পিছনে থাকবেন। যদি ক্ষতি করে আমার করবে, আপনাদের কিছু করবে না।

তার বাড়ির চুরির ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল প্রৌঢ় বয়সী যতীন। সে সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে তোমার একলার ক্ষতি করবে মানে? আমরা তা মানব কেন?

একঘণ্টা আলোচনার পর যে যার জায়গায় গিয়ে বসে। কিন্তু কাজে কারও মন বসে না। অঘোর আরও দেরিতে আসবে, কিন্তু খবর তার কানে পেঁছুবে। নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে লোকেশকে।

তারপর কি নাটক আরম্ভ হবে কে জানে ছা-পোষা চাকরি সর্বস্ব তাদের আপিস জীবনে ?

অঘোর যথাসময়ে আসে। নিজের ঘরে বসে। কাজ করার বদলে সকলে একঘণ্টা জটলা করেছে খাস ও একমাত্র বেয়ারা বেচুর খবরও নিশ্চয় সে শোনে। কিন্তু সারাদিন কেটে যায়, লোকে কে সে ডাকে না।

আপিসের মুষ্টিমেয় মানুষকটার বিদ্রোহের খবর যে সে টের পেয়েছে সেটা টের পাওয়া যায় একটিবারও তার আপিস ঘরে না আসায়। রোজ সে তিন চার বার টহল দিয়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে সকলে এটাও টের পায় যে অঘোর প্রতীক্ষা করছে। তারা নিজে থেকে কি করে না দেখে সে কিছুই করবে না!

পাঁচটা বাজতেই সকলে কাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। লোকেশ বেচুকে ডেকে বলে, বল গে' যাও, আমরা যাচ্ছি!

মিনিট পাঁচেক পরে অঘোর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ?

অবুঝ ছেলেরা দুষ্টামি করে বায়না ধরেছে। সে পিতার মতো শুনতে চায় তাদের নালিশ! শুনে স্নেহময় কিন্তু তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পিতার মতোই বিচার করবে।

লোকেশও শান্ত গম্ভীরভাবে তাদের নালিশ জানায়, তারা অতঃপর কি করবে স্থির করেছে তাও জানায়।

অঘোর উদাস উদারভাবে বলে, বেশ তো। তোমরা চাকরি করার সরকারী আইন মতো চাকরি করতে চাইলে আমি কি না বলতে পারি ? আমি কি আইন ভেঙে গায়ের জোরে তোমাদের বেশী খাটিয়েছি ? ওসব আইন-টাইনের কথা খেয়ালও ছিল না আমার। আমরা মিলেমিশে কাজ করছি, মানিয়ে চলছি, ব্যস।

লোকেশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে বলে, তোমরা যে ঘরোয়া ব্যবস্থাটা পছন্দ করছ না আমাকে জানালেই হতো। হঠাৎ এরকম গন্ডগোল করার কোনো মানে হয়?

নিজের আপিসের উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসেছে এমনিভাবে নাক মুখ সিঁটকোতে সিঁটকোতে অঘোর সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

একটা মস্ত যুদ্ধে যেন জয়লাভ করেছে, প্রকান্ড অনিয়ম থেকে রেহাই পেয়েছে, এমনিভাবেই সকলে কলরব করে, সমবয়সী দু'একজন পিঠ চাপড়ে দেয় লোকেশের।

প্রৌঢ় যতীন বলে, আজকেই শেষ হয়ে গেল ভাবছ নাকি তোমরা ? আমরা গুটি-শুটি মেরে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকেশ বেচারা এগিয়ে গিয়ে ঝগড়া করল—ব্যস্, অমনি সব ঠিক হয়ে গেল। বেকায়দায় পড়ে মেনে নিয়েছে তাই। শোধ না তুলে ছাড়বে ভেবেছ ?

সবাই চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফেরে।

গতরাত্রে চুরি হয়ে গেছে গয়নাগাটি মালপত্র। আজ ভোর রাত্রেও যে চোর আসবে কে তা জানত।

ছবির আর সব গেছে। অল্পদামী বিয়ের খাটে লোকেশের পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোনোর অধিকারটা বজায় ছিল।
শেষ রাত্রে প্রকাশ্যভাবে ভ্যান চালিয়ে চোর এসে তার বাহুবন্ধন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় লোকেশকে। আটক আইনের জোরে।

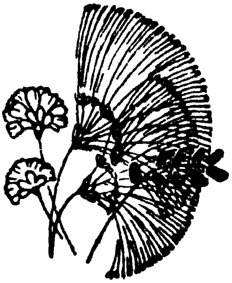

মরব না সস্তায়

বলে কিনা, চুলোয় যাক তোমার ঘর-সংসার ! আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না।

দু'জনেই বলে, যখন তখন—যে যাকে যখন বলার একটা সুযোগ বা অজুহাত পায়। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুলোয় পাঠাবার জন্যই যেন এতকাল ধরে গায়ের রক্ত জল করে তারা দু'জনে সংসারটা গড়ে তুলেছে, টিকিয়ে রেখেছে।

রেশন হয়তো না আনলেই নয়।

হৃষিকেশ বলে, সংসার টানার জন্য খাটব গাধার মতো আবার রেশন আনতে বাজার করতেও ছুটতে হবে আমাকেই ? ছেলেরা যেতে পারে না ? কোথাকার নবাব এসেছে ?

মোহিনী বলে, আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা। দু'দিন বাদে ওদের পরীক্ষা নেই ? রাত জেগে জেগে কি চেহারা হয়েছে দেখতে পাও না ? রেশন আনার কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠবে।

হৃষিকেশ বলে মেয়ে দুটোকে পাঠাও। বাপের ঘাড়ে গিলবে আর মুটোবে, রেশনটা নিয়ে আসুক।

মোহিনী ঝংকার দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ওই ধুমসো দুটো মেয়ে ভিড়ের মধ্যে যাবে রেশনের জন্য ধন্না দিতে ! কান্ডজ্ঞানও হারিয়েছ নাকি তুমি ?

—চুলোয় যাক তোমার ঘর-সংসার, আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না ! বলে গজব গজর করতে করতে হৃষিকেশ টাকা আর থলি হাতে নিয়ে রেশন আনতে যায়।

স্কুল কলেজ আপিসের তাড়ায় বিব্রত মোহিনী রান্নাঘর থেকে বড় মেয়েকে ডেকে বলে, শুভা, চট করে মশলাটা বেটে দে আমায়। এক হাতে কত করব ?

শুভা মিনতি জানিয়ে বলে, বাবার কাছে পড়াটা একটু বুঝে নিচ্ছি মা। বাবা তো এখুনি আবার বাজারে চলে যাবে। কলেজে দেবে না, মাস্টার রাখবে না, নিজে নিজে পড়ে কেউ প্রাইভেটে পাশ করতে পারে ? কি রেটে ফেল দেখছ তো ?

মোহিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো শিলটা পেতে ধুতে ধুতে ঝংকার দিয়ে বলে, একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখবে না। চুলোয় যাক তোমার ঘর-সংসার, এত খেটে খেটে আমি মরতে পারব না।

শুভা উঠে এসে বলে, দাও, বেটে দিচ্ছি। কাজ নেই আমার পরীক্ষায় পাশ করে।
মোহিনী ধমক দিয়ে বলে, তুই পড়বি যাতো হারামজাদি। কলেজে দেয় না, মাস্টার রাখি না, বই কিনতে কত টাকা লেগেছে হিসাব রাখিস?
পুলক পড়া ফেলে লাফিয়ে উঠে আসে। মায়ের কাছে হাত দুটি জোড় করে থিয়েটারী ঢং-এ বলে, ফেল কি আমরা ইচ্ছা করে হই মা? আমাদের ফেল করাচ্ছে জানো না? বাংলাদেশের ছেলেরা কি হঠাৎ বোকা হাঁদা হয়ে গেছে? পরীক্ষা দিয়ে সত্তর পঁচাত্তর পার্সেণ্ট ফেল করে?
এত বড় ছেলের এই অস্বাভাবিক ছেলেমানুষি ঢংটুকুই কি সয় না মোহিনীর? ক্ষোভ বিদ্বেষ রাগ আর নালিশ দিয়ে একটা উগ্র প্রতিবাদের মতোই যে নিজেকে খাড়া রাখে সে ছেলের একটু ছ্যাবলামির আঘাতেই যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে যায়, গা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চোখ বোজে।
ভাই বোন দু'জনেই ভড়কে যায়।
শুভা ঝেঁঝে ওঠে পুলকের উপর—তোমায় ডেকেছিলাম মুরুব্বিয়ানা করতে? যাও না নিজের ফেঁলের পড়া কর না গিয়ে।
এই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে সকলের আনাগোনা। শিল ধোয়া জলে পায়ে পায়ে আনা ধুলোময়লার কাদার মধ্যে বসে পড়ে মাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে শুভা বলে, অমন কোরো না মা। আমরা কি আগের মতো বোকা হাবা স্বার্থপর আছি, তোমার কষ্ট বুঝব না? কি করি বলো—
চোখ মেলে মেয়ের কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু বিহ্বলের মতন মোহিনী বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কি হয়েছিল রে? কি বলছিস তোরা?
পরক্ষণে সে যেন ক্ষেপে যায়। গলা ফাটিয়ে বলে, তুই যে হারামজাদি কাচা কাপড়টা পরে জলকাদার মধ্যে বসে পড়লি? কে আবার কাচবে তোর কাপড়? সাবান সোডা কে যোগাবে?
বলতে বলতে সে আবার চোখ বুজে সেই জলকাদার মধ্যেই গা এলিয়ে দেয়।
ডাক্তার আনতেই হয়। সেও আবার পেশাদার ডাক্তার।
অভয় দিয়ে বলে, ক'মাস পারফেক্ট রেস্ট দিতে হবে। আমি একটা ভিটামিন টনিক লিখে দিচ্ছি, সেটা খাবেন। রোজ অন্তত আধ সের দুধ চাই। তার বেশী হজম হবে না, তাই বিলাতী কোন পার্সিয়ালি ডাইজেস্টড মিল্ক ফুড—
পুলক বলে, বাবা দুটো টাকা দিয়ে ওঁকে যেতে বল।
মোহিনীর ধার করা আইসব্যাগটা চেপে ধরে রেখে শুভা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রায়বাবুদের বাড়ির সামনে মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরের সিটে বসে সিগারেট টানছে ড্রাইভার করালী। সিগারেট টানতে টানতে দু'একবার উৎসুক চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাচ্ছে।
ঘরের মধ্যে তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না, আলো বড় কম ঢোকে ঘরে, বাতাসের

মতোই।

জানালায় গিয়ে যদি সে দাঁড়ায়, করালীর উৎসুক চোখ ক্ষুধাতুর হয়ে উঠবে।

শুধু চোখ। এমনিতে মুখে তার সর্বদাই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব। রায়-বাবুদের বাড়ির মেয়েদের কাছে শুভা শুনেছে করালীর কেউ নেই, যা রোজগার করে সব নিজের জন্য খরচ হয়।

—আমাদের মতো গন্ধ তেল সাবান মাখে, জানিস? প্রথম ভাবতাম চুরি করে বুঝি। তারপর দেখা গেল, না, বাবু নিজের পয়সাতেই কেনে। ঘর ভাড়া লাগে না, খাওয়া খরচ লাগে না……

সিগারেট ফেলে দিয়ে করালী চিৎ করে শুয়ে পড়ে। বেলা দশটা বাজে, দশ পনের মিনিটের মধ্যে রায়বাবু এসে গাড়িতে উঠবে—কিন্তু শুভা জানে, তারই মধ্যে করালী একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সে লক্ষ্য করেছে ফাঁক পেলে যখন ইচ্ছা করালী ঘুমিয়ে নিতে পারে।

ঠিক তাই।

করালী শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট পরে রায়বাবু বেরিয়ে আসে. করালীর ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলতে হয়।

নিজের সিটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আরেকবার সে উৎসুক চোখে জানালার দিকে তাকায়।

শুভা ভাবে, যদি সম্ভব হতো সংগত হতো তার সংগে করালীর কথা বলা, তাকে তার মনের কামনা জানানো। যদি সম্ভব হতো সংগত হতো করালীকে তার জানানো যে তার মনের ইচ্ছায় তারও সায় আছে। অনায়াসে করালী কোনো আত্মীয়কে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাতে পারত তার বাবার কাছে. তারপর শুভ হোক অশুভ হোক কোনো এক লগ্নে বাবার ঘাড় থেকে তার দায় নামত আর তাদের দু'জনেরি সাধ সমস্যা মিটে যেত।

একার আয় একা ভোগ করার বদলে তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কত খুশি আর কৃতার্থ হতো করালী!

রায়বাবুদের পেট মোটা বিড়ালটা অনেকক্ষণ থেকে ঘরের আনাচে কানাচে শুঁকে বেড়াচ্ছিল। এ বাড়িতে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় কদাচিৎ, দুধ রাখা হয় নামমাত্র, কে জানে বড়লোকের বাড়ির পোশা আদুরে বিড়াল এ বাড়িতে এসেছে কেন। মাছ দুধ এঁটোকাঁটার লোভে পরের বাড়ি যাবার কোনোই দরকার তো ওর নেই!

বিড়ালটাকে লাফ দিয়ে তাকে উঠে সেখান থেকে পুরনো ভাঙা আলমারিটার উপর উঠে যেতে দেখে শুভা বুঝতে পারে, বাচ্চা পাড়ার জন্য সে নিরাপদ স্থান খুঁজছে।

গতবার ওর বাচ্চাগুলিকে রায়বাবুরা মেরে ফেলেছিল। কিন্তু একটা বিড়াল কি

করে টের পেল এত ছ্যাঁকা পোড়া খেয়েও তাদের প্রাণটা কোমল রয়ে গেছে, তার বাচ্চাগুলিকে মারবার মতো নিষ্ঠুর তারা হতে পারবে না ?

বাইরে কড়া নাড়তে শুভা জিজ্ঞাসা করে, কে ?

জবাব আসে, আমি রায়বাবুদের রাঁধুনি। ওদের বিড়ালটাকে খুঁজছি।

শুভা অবাক হয়ে যায়।

রায়বাবুদের নতুন রাঁধুনীর এমন চেনা গলা।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তোমাদের বাড়ি নাকি এটা ?

শুভার গলায় কথা জড়িয়ে যায়, কোনমতে সে বলে, ভেতরে আসুন দিদিমণি, বিড়ালটা এসেছে।

কতদিন আর হবে, সুরমার কাছে স্কুলে বাংলা পড়ত। সব দিদিমণির চেয়ে তারই বোধহয় মেজাজ ছিল কড়া আর ধমক ছিল বেশী। সিঁথিতে সরু করে সিঁদুর দিয়ে চওড়া পাড় শাড়ি পরে স্কুলে আসতো।

আজ তার পরনে থান, সে রাঁধুনীগিরি করে রায়বাবুদের বাড়ি।

ভিতরে গিয়ে মাথায় আইসব্যাগ বসানো মোহিনীকে দেখে সুরমা বলে, তোমার মা বুঝি ? কি অসুখ ?

শুভা বলে, না খেয়ে খাটুনি চিন্তাভাবনা— মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিদিমণি আপনি রান্নার কাজ নিলেন কেন ?

এ প্রশ্ন যে উঠবে এবং তার জবাবও যে দিতে হবে সে তো জানা কথাই। তবে পাড়ার লোকের রাঁধুনী হিসাবে বাড়ির দরজায় তাকে হাজির হতে দেখে যেরকম থতমত খেয়ে গিয়েছিল তাতে এত শীগগির এমন স্পষ্টভাবে সে প্রশ্নটা করে বসবে, সুরমা সেটা ভাবতেও পারে নি।

সে-ই বরং ভাবছিল কিভাবে কথাটা তুলে এককালের ছাত্রীকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

সুরমা ধীরে ধীরে বলে, আর বলো কেন, স্কুল থেকে বিদায় করে দিলে। আরেক জায়গায় কাজ জোটাবো তবে তো ? কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে খাই কি। বসে থাকলে কি আমাদের চলে ? ওদের রাঁধুনীটা পাড়ায় থাকে, কাজ ছেড়ে দেবে শুনে ভাবলাম আমিই ঢুকে পড়ি। আমার পেটটা তো চলবে, মাস গেলে কটা টাকা তো পাব। দুবেলা রাঁধি, দুপুরবেলা কাজের খোঁজে বেরোই !

শুভা বার বার পরনের ধুতিটার দিকে তাকাচ্ছে খেয়াল করে সুরমা একটু হাসে।

বলে, না, বিধবা হইনি, উনি বেঁচেই আছেন। বসে খাচ্ছেন বলে রাগ করে বিধবার বেশও ধরি নি। রাঁধুনীটা বললে কি, এরা সধবা লোক রাখে না, সধবার নাকি অনেক ঝনঝাট বিধবারা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। তাই বিধবা সাজলাম।

শুভা জিজ্ঞাসা করে, মন খুঁতখুঁত করল না ?

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে একটু মুখ বাঁকিয়ে যেন মনের খুঁতখুঁতানি উড়িয়ে দিয়েই বলে, গোড়ায় একটু করেছিল ; তারপর ভাবলাম, কি হয় ওতে ? একটু সিঁদুর না দিলে আর শাড়ির বদলে ধুতি পরলেই যদি স্বামীর অকল্যাণ হতো—

কথা শেষ করে না, আলমারীর উপর থেকে বিড়ালটাকে নামিয়ে নিয়ে বলে, না যাই এবার। উনান কামাই যাচ্ছে! একটা বিড়ালের জন্য কি মায়া। অনেকক্ষণ দেখা নেই কোথায় গেল—এবাড়ি ওবাড়ি একটু খুঁজে এসো। রাঁধুনীকে ওরা একেবারে মানুষ ভাবে না। আগে ভাবতাম বড়লোক সেক্রেটারির কাছে টিচাররাই বোধহয় মানুষ নয়, এখন দেখছি গরীব হলেই মানুষ থাকে না। খানিকক্ষণ বেড়ালের দেখা নেই—অমনি হুকুম, খুঁজে নিয়ে এসো।

কি ঝাঁঝ সুরমার কথায়! শুভা টের পায় সুরমার গরম মেজাজটা পরিণত হয়েছে ঝাঁঝে। তার মার মেজাজের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল ছিল বাড়ির ছেলেপুলে আর স্কুলের মেয়েদের ঝন্‌ঝাটে তার কষে যাওয়া মেজাজের।

এপিঠ ওপিঠ

সকালের ডাকে চিঠিখানা আসে।

অবনী তখন কয়েকটা টাকার সন্ধানে বেরিয়েছে। অন্যভাবে সন্ধান পাওয়া অবশ্য মস্ত একটা ধাঁদির কথা, পকেটে তাই তমালের আরেকটা সোনার জিনিসও নিয়ে গেছে।

এমনি না পেলে ওটা বাঁধা রেখে বা বিক্রি করেই টাকা আনবে। টাকা আজ চাই-ই, নইলে ছেলেমেয়ে দু'টিকে নিয়ে তাদের উপোস একবারে বাঁধা।

টাকা না আসা পর্যন্ত যে উপোস থামবে না। কাল রাত্রি পর্যন্ত অন্যভাবে চেষ্টা করে আজ সকালে অগত্যা সোনার জিনিসটা নিয়েই বেরোতে হয়েছে অবনীর।

বেরিয়েছে বলেই কার্ডখানা তমালের হাতে পড়ে। কে কি লিখেছে দেখে এবং চিঠিখানা পড়ে খানিক অবাক হয়ে থাকার পর সেটা তমাল নিজের ভাগ্য বলে ভাবে।

এতদিন পরে নিজে থেকে রমণী ভাইকে চিঠি লিখেছে। সংক্ষিপ্ত হলেও চিঠি। বহুদিন তাদের কোনো খবর পায় না, তাই কুশল জানতে চেয়েছে।

তবু এ তো রমণীর যেচে লেখা চিঠি। এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীর মনস্থির করে ফেলতে আর এক মুহূর্তও দেরি হবে না।

তাদের সকলকে টেনে নিয়ে অবনী তার বড় ভায়ের বাড়িতে তুলবে। চাকরি পাওয়ার আগের দিনগুলির অপমান আর নির্যাতন, বড় জা বেলার ঝাঁটা মারা ব্যবহারে রোজ তার কাঁদাকাটা, চাকরটা পাবার পর তাদের ফোঁস করে ওঠা আর দু'ভাই দু'জায়ের অকথ্য কুৎসিত ঝগড়ার পর তাদের চলে আসা—সব অবনী ভুলে যাবে।

এ চিঠি পাবার দরকার হয় নি, এভাবে রমণীর জানবার দরকার হয় নি যে পুরানো বিবাদ সে ভুলে গেছে কিন্তু ছোট ভাইকে ভুলে যায় নি—এমনিতেই ওসব তুচ্ছ হয়ে গেছে অবনীর কাছে।

শুধু তার জন্যে পারে নি, নইলে একমাস আগেই সে তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মাথা নিচু করে ভিখারীর মতো দাদার আশ্রয়ে গিয়ে উঠত।

কাল রাত্রেও এই নিয়ে তাদের ঝগড়া হয়ে গেছে। আজ থেকে যে সুনিশ্চিত উপোস শুরু হওয়ার কথা ঠেকাবার ব্যবস্থা করতে না পেরে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে একটু ছেঁচকি দিয়ে শুকনো দু'খান রুটি খাবার পর।

অবনী বলেছিল, তোমার কেবল ফাঁকা বাহাদুরি। মায়ের পেটের ভাই, গুরুজন তার কাছে দু'একমাস আশ্রয় নিলে কি এমন আসে যায়? তোমার মান ধুয়ে জল খেলে বাচ্চাদের পেট ভরবে?

বাচ্চাদের পেট! তার যেন পেট ভরাবার প্রয়োজন হয় না, তমালেরও নয়!

অবনী আরও বলেছিল, তোমাদের বোঝা টেনে টেনে আরও কিছু করতে পারছি না। দু'মাস একটু রেহাই পেলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম।

সব ঠিক কথা। কাঁহাতক আর এভাবে টানতে পারে মানুষ? আজ আট মাসের উপর চাকরি নেই, রোজগার নেই।

কিন্তু এ অবস্থাতেও তমাল কি করে ভুলবে দীর্ঘদিন ধরে অবনীর মায়ের পেটের ভাই আর তার বৌয়ের ব্যবহার, অবনী একটা চাকরি পাওয়ামাত্র ওদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার?

আজ বিনাদোষে হলেও সেই চাকরি খুইয়ে কি করে আবার ফিরে যাবে ওই চাকুরে ভাইয়ের বাড়ি? বেলা যে কি ভাবে মুখ বাঁকিয়ে তার দিকে তাকাবে শুধু এইটুকু ভাবতে গেলেই যে গায়ে তার বিছার কামড় লাগে!

তার চেয়ে গাছতলা ভালো। না খেয়ে মরা ভালো।

সে তাই অবনীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে এটা তার মানের কথা নয়। ভায়ে ভায়ে সম্পর্কটা যদি তাদের সাধারণ হয় স্বাভাবিক ভাবে তারা আর দশটি ভায়ের মতো ভিন্ন হয়ে যেত, সে হতো একেবারে আলাদা ব্যাপার।

কিভাবে তাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল সেটা তো ভাবতে হবে। ভাই বলেই কি আর জোড়া লাগে? গিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং রাস্তার লোককে রমণী আশ্রয় দেবে, তাদের লাথি মেরে তাড়াবে।

রমণী না তাড়াক, বেলা নিশ্চয় ঝাঁটা মেরে দুয়ার থেকে তাদের বিদায় করে দেবে।

এ যুক্তি না মেনে পারে নি অবনী। তবু তার কথা মেনে নিয়েও ঝগড়া করেছিল। কারণ যুক্তি তো সে চায় না। সে উপায় চায়, বাঁচতে চায়।

লাথি মারুক, ঝাঁটা মারুক, সব সয়ে সে মায়ের পেটের ভায়ের বাড়ি দু'চারটা মাস মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে রাজী। কোনোদিকে আর সে কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীকে আর ঠেকানো যাবে না।

তার গয়না বেচতে যেতে হয়েছে এটা দুর্ভাগ্য কিন্তু ভাগ্যে সে পিয়নের চিঠি বিলি করার সময়েই বাইরে গিয়েছে। ভাগ্যে চিঠিখানা হাতে পেয়েছে সে।

অবনীকে এ চিঠি সে দেখাবে না। যে আত্মহত্যা করতে ব্যাকুল তাকে সে উস্কানি দেবে না।

অন্তরের ঝাঁঝে কান দুটি ঝাঁ ঝাঁ করে তমালের।

বোঝা।

তার গয়না বেচে বেচে সংসার চালাচ্ছে, তবু সে-ই হয়েছে অবনীর বোঝা!

দুটো পয়সা রোজগার করার কোনো উপায় যদি তার থাকত।

এই জ্বালা আর আপসোস তার চিন্তাকে ধীরে ধীরে অন্যভাবে জুড়িয়ে আনে।

তার রোজগারের উপায়?

জোয়ান-মদ্দ শিক্ষিত রোজগেরে মানুষটা কোণঠাসা নিরুপায় হয়ে রোজগারের ফিকিরে ঘুরছে আট ন' মাস—বোকা-হাবা ঘরের-কোণার বৌ এসে—তার রোজগারের উপায়।

কচি কচি দুটো ছেলেমেয়ের মা সে, তার রোজগারের উপায়!

শীর্ণ অপুষ্ট খোকন আর খুকুমণির লাবণ্যহীন করুণ মুখ দু'খানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না তমাল।

ওদের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই।

হিন্দুস্থানী এক গোয়ালা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল দুধের বালতি হাতে করে, তার কাছ থেকে ধারে এক পোয়া দুধ কিনে সে আজ ওদের খাইয়েছে। গম্ভীর মুখে দুধ দিয়ে বলেছে, বাবুকা পাশ দাম পাবে।

ঠিক হ্যায়।

ঠিক যে কিছু নেই ও গোয়ালা তো তা জানে না। ভেবেছে, বৌ পোষে, কাজেই বাবু নিশ্চয় মস্ত বাবু না হলেও অনায়াসে এক পো' দুধের দাম শোধ করার মতো বাবু নিশ্চয়।

এটুকুর বেশী তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

আজ যেন প্রথম সে বোধ করে নিজের অসহায়তা আর অক্ষমতা। আজই প্রথম যেন তার হঠাৎ খেয়াল হয় যে ছাঁটাই হলেও অবনীই একা তাদের আট ন'মাস খাইয়ে এসেছে, উপোস করতে দেয় নি। তার গয়না বেচেছে এবার নিয়ে কয়েক বার—কিন্তু স্বামীরা স্ত্রীর গয়না তো মদ আর রেসের খরচেও উড়িয়ে দেয়।

সে এতটুকু সাহায্য করে নি অবনীকে?

অবনী পড়েছে বিপাকে অথচ সে চেয়েছে অবনীকে তার নিজের খুশিমতো চালাতে। আশ্রয়ের জন্য আবার বেলার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো তার কাছে মরার বাড়া অপমান বলে হয়তো তাদের বাঁচাবার জন্য অবনীর ঠিক করা একমাত্র উপায়টাই সে বাতিল করে দিতে চায়। নিজেও মরতে চায়—অবনী আর ছেলে-মেয়ে দুটোকেও মারতে চায়।

ভাবতে ভাবতে কত তাড়াতাড়িই যে মনের ভাব একেবারেই বদলে যায় তমালের। খানিক আগেও সে ভাবছিল ভাগ্যে অবনী বেরিয়েছিল, ভাগ্যে পিয়ন তার হাতে চিঠিটা দিয়েছে—এই ভাগ্যটাকেই বাতিল করার জন্য তমাল যেন উন্মুখ উৎসুক হয়ে থাকে।

অবনী গয়না বেচে বাজার করে বাড়ি ফেরামাত্র তার হাতে রমণীর পোস্টকার্ডটা তুলে দেয়।
তার গয়না বেচা পয়সায় অবনী পোয়াটাক মাছ কিনে এনেছে, সেদিকে পর্যন্ত তার নজর যায় না।
পনের দিন পরে তারা রোজ মাছ খাবে!
অবনী চিঠিটা পড়ে। পড়ে' ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। সারাদিন এবিষয়ে সে কোনো কথাই বলে না।
তার গয়নাটা এবার বেচেই দিয়েছে অবনী। সেই টাকায় সে আজ এনেছে ভালো মাছ আর তরকারি, সারা হপ্তার রেশন।
অন্য কথা অনেক বলেছে। আসল কথা পকেটে রেখে দিয়েছে।
বেশ। তাই ভালো। চতুর্থ দফায় তার গয়না বিক্রি করে সামলে নিয়ে তাকেই যদি বাতিল করতে চায় অবনী—করুক!
রাতে শুতে যাবার সময় তাকে ডেকে বুকে নিয়ে আদর করে অবনী।
করুক!
তারপর অবনী বলে, শোন, দাদার চিঠির মানে বুঝেছ?
আমি কি বুঝতে পারি এসব?
নিজের দাদা। গুরুজন। আমি যাই নি, কিন্তু কারো কাছে নিশ্চয় শুনেছে আমার দুরবস্থার কথা। তাই এই চিঠিখানা না লিখে থাকতে পারে নি। ভাই মরে যাবে—বড়ভাই গুরুজন কখনো তা সইতে পারে?
তাহলে কালকেই আমরা ওবাড়ি যাচ্ছি?
না। ক'টা দিন কোনোরকমে চালিয়ে মাসকাবারে যাব। মাইনের মোটা টাকাটা হাতে থাকবে, দাদা খুশিই হবেন আমরা গেলে।

অবনীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবার পর আর কিছুই বদলায় না। হঠাৎ কেমন অর্থহীন হয়ে যায় ঝিমানো নিস্তেজ জীবনটা।
দিনের পর দিন চাকরি খুঁজতে বার হওয়া, এভাবে ওভাবে কিছু খুচরো রোজগারের চেষ্টা করা আর একেবারে অচল হলে তমালের গয়নায় হাত দেওয়া, যেটুকু না হলে বাঁচাই যায় না সেটুকু ছাড়া সব কিছু প্রয়োজন বাতিল করে দেওয়া—একি জীবন?
তবু কি যেন একটা ছিল ওইভাবে প্রাণপণ করে কোনোরকমে টিকে থাকা আর আশা করে দিন কাটানোর মধ্যে, তিতো হলেও একটা স্বাদ ছিল জীবনের—হঠাৎ যেন সেই কটু বিশ্রী স্বাদটুকু পর্যন্ত চলে গিয়ে ভোঁতা অর্থহীন হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।
আজ মাসের তেইশ না চব্বিশ তারিখ কে জানে। মাসকাবারের বেশী দেরি নেই।

মাসকাবারে এই অসম্ভব লড়াই শেষ করে তারা গিয়ে উঠবে রমণীর আশ্রয়ে। বাঁচার লড়াই সেখানেও শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু বেঁচে থাকার মানে যেন ফুরিয়ে গেছে আজ থেকেই।

এখানে থেকে নিজেদের বোঝা নিজেরা বয়ে মরে গেলে তার মধ্যে এতটুকু গৌরব না থাক বাঁচার জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাবার মানেটুকু থাকত জীবনের।

অবনী বলে, কেন এও তো লড়াই। দরকার হয়েছে নিচু হয়ে অপমান সইতে যাচ্ছি।

অন্যভাবে নিচু হও না, অপমান সও না? চলো বস্তির একটা সস্তা ঘরে চলে যাই। তুমি কুলি খাটবে, আমি ঝি-গিরি করব।

পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে অবনী একটু হাসে। বলে, আসলে তোমার কি হয়েছে জানো? বৌদির কাছে কি করে নত হবে ভেবে তোমার দম আটকাচ্ছে। তুমি ঝি-গিরি করতে পারবে, সব কিছু সইতে পারবে—শুধু জায়ের কাছে মান খোয়াতে পারবে না।

ছেঁচকি রাঁধার জন্য কুমড়োর টুকরোটা কুচি কুচি করে কাটতে কাটতে তমাল বলে, কে জানে। হয়তো তাই হবে। আমার মাথার ঠিক নেই, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তো রাজী হলাম। শেষকালে নিজের সস্তা একটু মানের জন্য তোমাদের মারব!

অবনী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, অত ভেবো না। আমরা কি চিরকালের জন্য গলগ্রহ হতে যাচ্ছি? দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদাও এটা বোঝে নইলে নিজে থেকে চিঠি লিখত?

তমাল একটু ভেবে বলে, তুমি কি চিঠি লিখে জানাবে, না নিজে একদিন দেখা করতে যাবে?

আমি কিছুই করব না। দোসরা তারিখে আমরা সবাই মিলে একেবারে গিয়ে উঠব।

খবর না দিয়ে?

অবনী সায় দেয়। বলে, মুখ বুজে থাকো, বুঝলে? কাউকে কিছু জানিয়ে দরকার নেই। বাড়িওলা টের পেলে কিন্তু হাঙ্গামা করবে—সব মাটি হয়ে যাবে।

তার মানেই তারা চোরের মতো পালিয়ে যাবে। এখান থেকে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে চোরের মতোই আপনজনের বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

এতদিনে জীবনে খাঁটি বিতৃষ্ণা জন্মে যায় তমালের।

দোসরা সকালে সে জিজ্ঞাসা করে, কখন যাবে?

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে।

খাওয়া দাওয়া সেরে যাবে! কতই যেন সমারোহ তাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়ার!

পাশের ঘরের মাহিম মাইনে পেয়েছে পয়লা তারিখে। সকালে বাজারে গিয়ে মাসের শেষের দিকের তুলনায় সে যেন সমস্ত বাজারটাই কিনে এনেছে মনে হয়। আধ-সের-কাটা মাছ এনেছে, দু'বেলাই আজ ওরা মাছ খাবে।

সাতজনে খাবে। তবু তমালের মনে হয়, যেতেই যখন হবে, সকাল বেলা চলে গেলেই ভালো হতো। কি রাঁধবে ভেবে চোখে জল আসত না! ছেঁচড়ামি করে ভাশুরের ঘাড়ে গিয়ে ওঠার বিড়ম্বনায় চোখে যদি জল আসে, খেয়ে গেলেও আসবে না খেয়ে গেলেও আসবে।

তাই, বেলা ন'টা নাগাদ বাড়ির সামনে ভাড়া গাড়িটা দাঁড়াতে দেখে এবং সেই গাড়ি থেকে রমণী ও বেলাদের নামতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাকে ভাবতে হয়, ভাগ্যে সকালবেলাই তারা বেরিয়ে পড়ে নি।

মাথা ঘুরে গেছে তমালের। চিঠির জবাব না পেয়ে রমণী সপরিবারে তাদের মান ভাঙাতে এসেছে! অবনীর অনুমান যদি সত্য হয়, রমণী যদি জেনে থাকে তাদের চরম দুরবস্থার কথা, হয়তো তাহলে তাদের নিয়ে যেতেই এসেছে।

কিন্তু কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওদের সকলের?

কিরকম সসঙ্কোচে স্খলিত পদে বাড়িতে ঢুকছে?

রমণীর হাতে ছিল একটা সুটকেস, ছেলেমেয়েদের হাতে তিনটি ভর্তি থলি। সেগুলিকে বারান্দায় নামিয়ে রেখে তারা ঘরে ঢোকে।

অবনী রমণীকে বলে—দাদা বসুন।

তমাল বেলাকে বলে, বসুন দিদি!

তারা চৌকিতে বসে। দেহে যেন প্রাণ নেই এমনি ভাবে বসে। ছেলেমেয়েরা মাদুরে বসে আড়ষ্টভাবে।

আড়ষ্টতা তমালদেরও এসেছে। ভাই-এর দুরবস্থার খবর জেনে নিজেরাই তাদের নিতে এসেছে—এই আশার ঝলক প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। তাদের অবস্থা জানলে এভাবে সবাই মিলে কি আর তাদের নিতে আসত!

রমণী বলে, আমরা—

এটুকু বলেই থেমে যায়।

অবনী বলে, তাই ভাবছিলাম। এমন হঠাৎ—?

রমণী হঠাৎ মুখ তুলে বলে, তোমার কাছে কিছুদিন থাকতে এসেছি। একবছর চাকরি নেই, অসুখে ভুগছি, দিন আর চলে না, তাই—

নতমুখী বেলার দিকে চেয়ে তমাল হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

পাশ ফেল

খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে একটি ছেলে আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খেয়েছিল, এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে। ছেলেটি আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে সে বিষ খায়।

নীরেন আর বিমল একসঙ্গে পরীক্ষার ফল জানতে যায়। এক কলেজ থেকে পরীক্ষা না দিলেও দু'জনে তারা এক পাড়াতে থাকে। ম্যাট্রিক তারা দিয়েছিল এক স্কুল থেকেই, এক কলেজে দু'জনে সীট পায় নি।

পাশের কৃতিত্বে অনেক তারতম্য ছিল দু'জনের। নীরেন খুব ভালোভাবে পাশ করেছিল। বিমলের ফলটা সেরকম হয় নি।

এবার কি হয়েছে কে জানে! যে রেটে ছাত্রদের ফেল করিয়েছে ভাগ্যবিধাতারা! পাশের পার্সেন্টেজের খবর শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল নীরেনেরও।

কে জানে এই জন্যেই এবার প্রাণেশ একটু দমে গিয়েছে কিনা, যেরকম আগ্রহ নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলের সঙ্গে ম্যাট্রিকের রেজাল্ট জানতে ছুটেছিল, এবার আর তার সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি।

একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছে নীরেন। বাপ যে কি ভাবে তাকে দু'বছর কলেজে পড়িয়েছে, পরীক্ষার খরচ যুগিয়েছে, সেটা তার আজানা নয়। মা'র গয়না বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে পড়িয়ে পাশ করাবার জন্য।

অথচ এবার যেন পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্য তেমন ব্যাকুলতা তার নেই। আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার অবশ্য অভাব নেই, ছেলের পাশ ফেলের খবর জানা সম্পর্কে তার পক্ষে উদাসীন হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু কেমন যেন স্তিমিত, নিস্তেজ ভাব।

শুধু প্রাণেশের নয়। বাড়ির সকলেরই ব্যাকুলতা যেন এবার অনেক কম। একটু চিন্তিত গম্ভীর ভাব সকলের।

বিমল বলে, পাশের পার্সেন্টেজ জেনে ভড়কে গেছে। এত ছেলে কচু-কাটা হয়েছে, তুই যদি না বাদ গিয়ে থাকিস। আমাদের বাড়িতে তো ধরেই রেখেছে আমি এবার নির্ঘাৎ কুপোকাত।

তুই আবার যা অসুখে ভুগলি।

বিমলের ফেল করার সম্ভাবনার কথা ভেবে নীরেন এবার বেশ একটু ভড়কে যায়। এতক্ষণ এদিকটা তার খেয়াল হয় নি। বিমলের সঙ্গে আসা তার উচিত হয় নি।

যে রকম অল্প ছেলে এবার পাশ করেছে, তাতে বিমলের এবার সত্যই পাশ করার আশা কম। যদি দেখা যায় সে পাশ করেছে আর ও পারে নি, একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে কি বিশ্রী লাগবে দু'জনেরই !

নিজের পাশের খবর জেনেও খুশি হবার উপায় থাকবে না !

দেখা যায় অনুমান তার মিথ্যা হয় নি। যে পাশ করেছে, বিমল করেছে ফেল।

মুখখানা ম্লান করে রাখতে হয় বিমলকে। আরও অনেকে যারা রেজাল্ট জানতে এসেছিল, ছাত্রছাত্রী এবং তাদের আত্মীয়-বন্ধু, তাদেরও কারো মুখে যেন উল্লাসের ছাপ পড়ে নি। নীরেনের মতো যে ক'জন সুখবর জেনেছে তাদের সকলের সঙ্গেই যে বিমলের মতো ফেল করা বন্ধু আছে তা নয় কিন্তু এতো বেশী মুখে ক্ষোভ ও বেদনা ফুটেছে যে দু'চারটি মুখের আনন্দের জ্যোতি হারিয়ে গেছে তার আড়ালে। পাশ যারা করেছে তারাও এত ফেল করা ছেলেমেয়ের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছে বৈকি !

বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।

বাস্। স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।

আরেকবার—?

ক্ষেপেছিস ? এমন জানলে কলেজেই ভর্তি হতাম না। পড়ার নামে দু'বছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না। নিশ্চয় মরত না।

নীরেন ভয় পেয়ে যায়। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হ'ল : বন্ধুর বিরাট ও বিকট ব্যর্থতার আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম ধাক্কাটা এখন তাকেই সামলাতে হবে।

সে কাতরভাবে বলে, এতটা বাড়াস নে ভাই, এত ছেলে তো ফেল করছে। একবার ফেল করলে কি হয় ?

পড়াশোনো জন্মের মতো খতম হয়। দু'টো বছর সকলের আর নিজের প্রাণপাত কষ্ট মাঠে মারা যায়। পাশ করলে পড়তাম। কোনোদিকে তাকাতাম না। রাত্রে বাবা ঘুমোন কিনা, মা'র হার্ট ক্ষয় হচ্ছে কিনা, ভাইবোনেরা খেতে পরতে পাচ্ছে কিনা, কিচ্ছু চেয়ে দেখতাম না। কিন্তু এত করেও যখন ফেল করেছি, এ তামাশার মধ্যে আমি আর নেই।

বিমলদের বাড়িটা আগে পড়ে। বাড়ির কাছাকাছি এসে বিমল বলে, মাঁর বাঁচি করে বাবা আরেকটা চান্স আমায় দেবেন। নিজেই হয়তো বলবেন, এত টাকা গেল সময় গেল এনার্জি গেল, আরেকটা বছর চেষ্টা করেই দ্যাখো, নইলে তো সবটাই লোকসান। কিন্তু আমি আর পড়ছি না। এ জুয়াখেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।

নীরেন চুপ করে থাকে। অস্বস্তি বোধ করতে করতে এতক্ষণে তার মনে হতে

থাকে যে পাশ করে সে যেন সত্যই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।

বাড়ির সামনে এসে বিমল বলে, একমিনিটের জন্য আয়। খবর জানিয়ে যা।

না ভাই। আজ নয়।

কিন্তু বিমল একরকম জোর করেই নীরেনকে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। সাগুর স্যসপ্যান উনুন থেকে নামিয়ে রান্নাঘর থেকে বিমলের মা, আধেক সাবান মাখা ছেঁড়া ভিজা শাড়িটা তাড়াতাড়ি শতজীর্ণ ভিজা সেমিজটার উপরে জড়িয়ে ফাঁকা কলতলা থেকে বিমলের সতের মাস বয়সে বড় অবিবাহিতা দিদি এবং এদিকে ওদিক থেকে বিমলের ভাইবোন আর বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের দু-চারজন মেয়ে পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।

বিমল বলে, আমি ফেল করেছি মা। নীরেন পাশ করেছে।

ভূপেন তিনদিন জ্বরে শয্যাগত ছিল। সে ছেলের গলার আওয়াজটাই শুনেতে পেয়েছিল, কথা বুঝতে পারে নি।

চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরেছে নাকি ? ফেল করেছে তো ?

বিমলের সতের মাস বয়সের বড় দিদি, বিমলের কলেজে পড়ার খরচ যোগাবার অজুহাতে যার বিয়ে স্থগিত রেখে আসা হয়েছে এ পর্যন্ত, সে নীরেনকে বলে, তুমি পাশ করেছো ? আমাদের খুশির সীমা রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—

ঘরের ভিতর থেকে ভূপেন জ্বরাক্রান্ত রুগ্ন ক্ষীণ শরীরের সবটুকু জোর খাটিয়ে আবার চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরে এসেছে না ? ফেল করেছে তো ?

বিমলের মা তাকে খবর জানাতে ভিতরে যায়। ফেল-করা অভিমানী ছেলের সঙ্গে যেন বুঝে শুনে কথা বলে, এবিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে যায়।

বিমলের দিদি নীরেনকে বলে, বিমলটা ফেল করেছে তাতে আর কি হয়েছে বলো ? অমন ঘরে ঘরেই তো ফেল করেছে। ফেলটাই যখন বেশীর ভাগ ছেলে করেছে তখন ফেল করাতে লজ্জার কি আছে। তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। সবাই তোমার পাশের খবর জানতে উতলা হয়ে আছে। মাসীমাকে বলো যেন মিষ্টি আনিয়ে রাখেন।

বিমল বলে, আমায় সান্ত্বনা দিতে পাশ ফেল সব সমান করে দিলি যে দিদি।

না, সমান কখনো হয় ? বলছি আজকাল ফেল করাটাও দোষ নয়, লজ্জারও নয়।

বিমলের মা বলে, না পারলে উপায় কি।

এ বাড়ির অন্য ঘরের ভাড়াটে কমলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিমলের দিদির খুব ভাব আছে, সে সমর্থনের সুরে বলে, তা নয়তো কি ? আমার ভাই আর ভাগ্নে দু'জনে ফেল করেছে।

সকলে সহজ করে দিতে চায় বিমলের ব্যর্থতার ক্ষোভ, মুছে নিতে চায় তার প্রাণের জ্বালা। তার মধ্যেই ফুটে বেরোয় সকলের ভয় আর উদ্বেগ। বিমল চিরদিন বড় অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা। ফেল করার প্রতিক্রিয়ায় সে এখন কি করে বসে এটাই দাঁড়িয়েছে সকলের সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা।

আরেকবার আরও জোরের সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে হয় নীরেনের। একজনেরও এ পরীক্ষায় পাশ করা উচিত হয় নি। সামান্য কিছু ছেলে পাশ করেছে বলেই না বিমলের মতো গাদা গাদা ছেলের ফেল করাটা দাঁড়িয়েছে ফেল করায়!

টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ভূপেন দরজা ধরে দাঁড়ায়। নীরেনকে সে চোখেও দেখতে পায় না—সে পরের ছেলে, যদিও প্রাণেশ তার অনেক দিনের বন্ধু এবং নীরেন সেই বন্ধুরই ছেলে।

সকলে মুখের দিকে তাকায়, কেউ কিছু বলার আগেই শান্ত গম্ভীর গলায় বিমলের বাবা বলে, বিমল ফেল করেছিস তো? বেশ করেছিস!

বৈঠকখানা বলে কিছু নেই। বাইরের সরু রোয়াকে দাঁড়িয়ে প্রাণেশ একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। তারই আপিসের সুজনবাবু।

তাকে দেখে নীরেন একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রাণেশ যে আপিস যায় নি তার মানে বোঝা কঠিন নয়, ছেলের পরীক্ষার খবরটা সদ্য সদ্য জানার জন্য একটা দিন আপিস কামাই করছে। কিন্তু সুজনও আপিস কামাই করে তার বাবার সঙ্গে গল্প জুড়েছে কেন?

সুজন প্রশ্ন করে, কি খবর হে?

একা বাড়ির কাছে এসে এতক্ষণে নীরেন মুখে একটু হাসিখুশি ভাব আনতে পেরেছিল, পাশ করার আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিল। সুজনের প্রশ্নে তার মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পাশ করেছি।

কিরকম পাশ করেছে শুনে নিয়ে সুজন বলে, বাঃ! বাহাদুর ছেলে! এই ফেলের বাজারে এত ভালোভাবে পাশ করা তো সোজা ব্যাপার নয়!

প্রশংসার লজ্জায় নীরেন মাথা নামায়। এতক্ষণে সে প্রথম অনুভব করতে পেরেছে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ—দু'টি বছর গরীবের ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।

বিমল ফেল করে শুধু তাকে দমিয়ে রাখে নি এতক্ষণ, কেমন হতাশায় প্রাণ ভরে দিয়েছিল।

আশা আর স্বপ্নে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ।

কিন্তু প্রাণেশ কিছু বলে না কেন? প্রাণের হাসি ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না কেন?

বিমল পাশ করতে পারে নি বাবা।

প্রাণেশ আপসোস করে না, সংক্ষেপে বলে, পারেনি ? পাশ করেই বা কি করত।

বাপের মন্তব্য শুনে নীরেন থ' বনে যায়। যে ছেলে সদ্য সদ্য ভালোভাবে পরীক্ষা পাশের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে তাকে এমন কথা শোনানো! বিমলের ফেল করা আর ছেলের পাশ করা ব্যাপারটারই যেন বিশেষ কোনো মূল্য নেই প্রাণেশের কাছে।

অথচ তাকে পাশ করানোর জন্য সে গায়ের রক্ত জল করেছে!

সুজনের কাছে পেলেও বাপের কাছে ঠিকমত অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ভিতরে যায়। সেখানে অবশ্য তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতোই—ছোট ভাইবোনদের কাছে।

সকলে তারা হৈ হৈ চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তের বছরের বোন রেখা উঠানে গিয়ে চেঁচিয়ে উপরতলায় খবর পাঠিয়ে দেয়, বকুলদি! ও বকুলদি! দাদা পাশ করেছে!

এক মিনিটের মধ্যে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল নেমে আসে। এবার সে ম্যাট্রিক দিয়েছে।

হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।

মা এতক্ষণ কথা বলে নি। তার মুখের হাসি আর চোখের গর্বভরা চাউনিতেই নীরেনের প্রাণ ভরে গিয়েছিল। তবু সে অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি তো কিছু বললে না মা?

কি আবার বলব? আমি জানতাম তুই পাশ করবি। আমার গয়না ধার নিয়েছিস, পাশ করে শোধ দিবি না!

সকলের সামনে তার গয়না বিক্রির কথা বলায় নীরেন ক্ষুব্ধ হয়। সত্য সত্যই একদিন সে কি শোধ দেবে না মায়ের গয়না, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারলে মায়ের সুখের ব্যবস্থা করবে না সকলের আগে? আজকের বিশেষ দিনটিতেও গয়না দিতে হওয়ার কথাটা মা পর্যন্ত ভুলতে পারে না।

যেটুকু আনন্দ আর উত্তেজনা জেগেছিল বাড়িতে তার পাশ করার খবরে, এত কষ্টে তাকে পাশ করানোর জন্যে. কত তাড়াতাড়িই সেটা ঝিমিয়ে নিস্তেজ হয়ে এসে একেবারে ফুরিয়ে যায়। নীরেন ভেবেছিল, প্রাণেশ ভেতরে এলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক চোট জল্পনা-কল্পনা চলবে। কিন্তু প্রাণেশ ঘরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে, ছেলের সম্পর্কে তার কথা বলবার কোনো উৎসাহই আর দেখা যায় না।

তার মা বলে, সুজনবাবু কি বলল? মাইনে বাড়িয়ে দেবে?

প্রাণেশ বলে, আজ তো শুধু টোকেন স্ট্রাইক হলো। এরপর কি হয় দেখা যাক।

তাই বটে! পাশফেলের চিন্তায় মশগুল হয়ে থেকে নীরেন ভুলেই গিয়েছিল যে তার রেজাল্ট জানার আগ্রহে প্রাণেশ আপিস কামাই করে নি, আজ তাদের আপিসে স্ট্রাইক।

কিন্তু তাই বলে তার বিষয় কথা বলা কি বারণ? আজও শুধু দেনা আর সংসারের অভাব-অনটনের কথাই হবে দু'জনের মধ্যে? রেখা আজ সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটাও আস্ত জামা নেই। মুদী দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয়তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে, মাসকাবারে একটা পাঞ্জাবি না করলে আর আপিস করা সম্ভব হবে না প্রাণেশের—আজও চলবে চিরদিনের এই একই কথার পুনরাবৃত্তি?

নীরেন নিজেই বলে, জানো, বাড়িতে একটু হেল্‌প পেলে আমি হয়তো প্লেস বাগাতে পারতাম। নিজে নিজে পড়ে হয় না।

প্রাণেশ আর নীরেনের মা কথা বন্ধ করে এক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দু'জনেই নিশ্বাস ফেলে একসঙ্গে।

অভিমান পাক দিয়ে ওঠে নীরেনের মধ্যে। এদের যখন আগ্রহ নেই, থাক। যার আগ্রহ আছে তার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক আজ পাশ করার মধ্যে তার কোন্ ভবিষ্যৎ সূচিত হলো।

উপরে গিয়ে সে বকুলের সঙ্গে কথা বলে। বকুল সাগ্রহে তার কথা শোনে। বি এতে সে আরও ভালো রেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে উঁচুদিকের পরীক্ষায় কোনো ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপালে চলে না।

বকুল বলে, সত্যি।

বিকালে নীরেন পাড়ার চেনা লোকের বাড়িতে যায়। যে বাড়ি থেকে কেউ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে সে বাড়ি বাদ দিয়ে পরের দিনটা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘুরে কাটিয়ে দেয়। বাড়িতে যে উদাসীনতা তাকে ব্যথিত করেছিল, সেটা কেটে যায় বাইরের মানুষের সাদর অভিনন্দনে।

ট্রাম-বাসের খরচের জন্য একটা টাকা চাওয়ায় প্রাণেশ যে কড়া কথাটা বলেছিল তার দুঃখও তলিয়ে যায় দশজনের প্রশংসা শুনে এবং দশজনকে নিজের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুনিয়ে।

দিন তিনেক পরে প্রাণেশ তাকে বলে, তুমি বড়ো হয়েছো, সংসারের কথাটাও এবার তোমার একটু ভাবতেও হয়। কি দিনকাল পড়েছে বুঝতেই পার।

এটা কিসের ভূমিকা বুঝতে না পেরে নীরেন চুপ করে থাকে।

প্রাণেশ বলে, বিমল চাকরির চেষ্টা করছে। তোমরাও এবার রোজগারের চেষ্টা

দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।

আর পড়াবে না আমায় ?—আর্তনাদের মতো শোনায় নীরেনের কথাটা।

কোত্থেকে পড়াব ? আই.এ. পড়াতেই দেনা করেছি, তোমার মায়ের গয়না বেচেছি। বি.এ. পড়াবার ক্ষমতা কি আছে আমার ?

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় নীরেনের। জগৎ হয়ে যায় অন্ধকার, ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে যায় অর্থহীন।

ঘরের কোণে তার পড়ার টেবিলটির সামনে চুপচাপ বসে সে কাটিয়ে দেয়।

বিকেলে বকুল এসে সব শুনে বলে, সর্বনাশ। তবে কি হবে ?

তার প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন রাত্রে নীরেন বিষ খায়।

নীরেনের আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবরটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে। পরীক্ষার ফল বার হবার তিনদিন পরে যে সে বিষ খায় তারও উল্লেখ আছে খবরে। কিন্তু নীরেন যে ফেল করে নি, পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাশ করেছিল—এটা খবরে লেখা ছিল না।

স্বাধীনতা

চাকরিটা সইয়ে নিতেই মাস তিনেক কেটে যায়। কোনো দিকে তাকাবার অবসর পায় না।

চাকরি করা মানেই তো শুধু চাকরি করা নয়।

রাশি রাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন যেন তার চাকরিটার জন্যই ওৎ পেতে ছিল, চাকরি পাওয়া মাত্র একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। কতদিকে কত যে তাদের অভাব এতদিন নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হওয়ায় যেন ঠিক মতো আঁচ করা যায় নি, চাকরি নিয়ে এবার কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা মেটাবে, কারটা আগে কারটা পরে মেটাবে, হিসাব করতে বসে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়!

অভাবের প্রচন্ড খরায় যেন খাঁখাঁ করছিল চারিদিক, বেতনের পশলা বর্ষণ শুষে যাওয়ার রকম দেখেই কেবল তার প্রচন্ডতা আঁচ করা যায়।

অভাব যে মানুষের অভাব-বোধ ভোঁতা করে দেয় সেটা আশীর্বাদ না অভিশাপ কে জানে!

কান্তার মতো হিসেবী মেয়ে পর্যন্ত বেশ খানিকটা ভড়কে গিয়ে ভাবে, ও বাবা! তিনশ' টাকার চাকরি পেয়ে সে তবে একেবারে স্বর্গ রচনা করার স্বপ্ন দেখেছে! সেই সঙ্গে একথাও ভাবে, ইস্‌ কি অবস্থাতেই এতদিন তবে আমাদের কেটেছিল?

এটাও সে টের পায় যে তাকে খুব শক্ত হতে হবে। তার তিনশ' টাকার চাকরি থেকে সবাই যেরকম আশা করেছে মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা হলেও সে আশা মেটানো যাবে কি না সন্দেহ!

হরিপ্রসন্ন পর্যন্ত যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মাসের বেতন পেতেই হরেনকাকার কাছে তিনশ' টাকা দেনার একশ' টাকা শোধ করে দিয়ে এসেছে।

প্রায় দু'বছর পড়ে আছে দেনাটা, শোধ করতে হবে বৈকি। কিন্তু একটু তো সবুর করতে হয়, চারিদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আস্তে আস্তে দেনাটা শোধ করার ব্যবস্থা করতে হয়?

আত্মীয়ের কাছে দেনার জের টানতে লজ্জা করে বলে একদিকে সব ঢেলে দিলে চলবে কেন? মার গয়নাগুলি যে এদিকে বাঁধা রয়েছে আর মাসে মাসে সুদ গুনতে হচ্ছে!

হরেনকাকা সুদ নেয় না, দু'দিন সবুর করলেও তার কিছু আসবে যাবে না— গয়না বাঁধার টাকাটাই বরং আগে শোধ করা উচিত ছিল। সুদ গোনা থেকে রেহাই

পাওয়া যেত, গয়না কটা ছাড়িয়ে আনা যেত।

নাঃ তাকেই শক্ত হতে হবে। সবাই ভাববে চাকরি পেয়ে মেজাজ গরম হয়েছে কান্তার। কিন্তু ভাবলে আর উপায় কি।

অনিলের কথা সে ভুলতে পারে নি।

অনিলকে নয় অনিলের কথাটাকে।

অমন কত অনিলকে সে চেনে। কয়েকজনকে বহুকাল ধরে বেশ ভালোভাবেই চেনে। একটু খাপছাড়া ঘটনার মধ্যে অনিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই সে ধপাস করে তার প্রেমে পড়ে যাবে, কিছুতেই তাকে ভুলতে পারবে না, তাকে ভেবে ভেবে বিনিদ্র রাতগুলি দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠবে—বানানো রসিকতা হিসাবে ছাড়া এর কোনো মানেই হয় না।

খাঁচায় বন্দী আবেগ আর ভাবলুতা খাইয়ে পোষ মানানো মেয়েরা অবশ্য বোঝে না এ রসিকতা—খাপছাড়া কোনো ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া কোনো একটি অনিলের কাছাকাছি এসে দু'মিনিট দুটো কথা বলাই তাদের কাছে অসম্ভব অবাস্তব স্বপ্ন হয়ে থাকে। এদের কাছে সম্ভব আর বাস্তব করতে তাই নিরানব্বইটি উপন্যাসে নায়ক নায়িকা কাছে আসে আর প্রেমে পড়ে খাপছাড়া ঘটনা বা অ্যাক্-সিডেন্টের সাহায্যে!

সাধে কি কান্তা দু'একটি ছাড়া উপন্যাস পড়তে পারে না, তাই হাই ওঠে। খাপ-ছাড়া ঘটনা জগতে ঘটেছে, অ্যাকসিডেন্ট সর্বদাই। ক'লাখ জীবনে কি ভাবে কেন ঘটে আর পরিণাম কি দাঁড়ায়।

চাকরিটা ফসকে যাওয়ায় তার বাড়ির মানুষের হাঁড়ি মুখ আর মায়ের কান্নাকাটি —অনিলের এই কথাগুলি সে ভুলতে পারে না, বার বার মনে পড়ে যায়।

অনিল ঝোঁকের মাথায় তার বাড়ি এসে হাজির হয়েছিল। তারও মাঝে মাঝে ঝোঁক চাপতো অনিলের বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে যে বাড়ির মানুষেরা কি বলছে আর করছে, অনিলের অবস্থা সত্যই কিরকম দাঁড়িয়েছে।

চাকরি অনিলের পাওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই পাওয়া উচিত। চাকরি সে পেয়েছে কি না কে জানে।

সত্য কথা বলতে কি, অনিল চলে যাবার পর তার কোয়ালিফিকেশনের বিবরণ মাধবের কাছে শুনে কান্তা বেশ খানিকটা মরমে মরে আছে। তার কোনই দোষ নেই, সংসারের সাধারণ নিয়মনীতি বাইরে বলা যায় এমন কোনো সম্পর্কই মাধবের সঙ্গে তার গড়ে ওঠে নি, গরীবের ঘরের মেয়ে হয়েও অসীম কষ্ট সয়ে আর প্রাণপাত চেষ্টা করে একটা চাকরি বাগানো ছাড়া আর কোনো অপরাধই সে কারো কাছে করে নি।

তবু যেন সর্বদাই মনে হয় সে একটা অনিয়মের জীবন্ত নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটা দুর্নীতির সমর্থন আর প্রশ্রয় হিসাবে। মাধবের

শুধু স্নেহের দাবী—সে সুখী হোক। আজ পর্যন্ত তার বেশী কিছুই সে চায় নি তার কাছে।
কতবার কত সুযোগ গেছে, ঘরে এবং বাইরে মাধব তার দিকে মুহূর্তের জন্য অন্যভাবে একটিবার তাকায় নি পর্যন্ত।

কান্তা জানে যে অনেকে অনেক রকম ভাবছে। অনিল হয়তো বেশী করেই ভাবছে।
কিন্তু এরকম ভাবনা ওদেরই কুৎসিত মানসিক হীনতা-দীনতার পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মাধবের চাল-চলন, কথা ও ব্যবহার।
তাকে চাকরিটা করে দিতে মাধবকেও সংঘাত সইতে হয়েছে বৈকি। চাকরি করে দেবার ক্ষমতা কি মানুষ আকাশ থেকে পায়, অনায়াসে পায়!
কয়দিন ভারি খুশি মনে হচ্ছিল মাধবকে. রোজ এসে চা খেয়ে গল্প করে যেত। হঠাৎ বন্ধ হ'ল তার আসা।
কান্তা আপিস করে নিজেই খবর নিতে গেল অসুখ হয়েছে নাকি!
সত্যই তো অসুখ হয়েছে মাধবের। অসুস্থ মানুষের মতোই থমথম করছে তার মুখ।
মনে আঘাত লেগেছে মাধবের—কঠিন আঘাত লেগেছে।
মাধব সখেদে বলে, ছি ছি, কি বিশ্রী এই জগৎ, কী ছোটলোক মানুষগুলি! গরিব মধ্যবিত্তের মেয়ে তুমি কষ্টে মানুষ হতে লড়ছ দেখে মায়া হ'ল, তোমায় একটা চাকরি করে দিলাম, তার মানে বাঁদররা বলছে কিনা- -ছি ছি!
কান্তা কি বলবে ভেবে পায় না। দুঃখ ক্ষোভ মায়া অভিমানে হৃদয়টা তার আলোড়িত হয় বলেই সে চুপ করে থাকে।
মেয়ে বলেই তাকে এভাবে তুচ্ছ করা সম্ভব হয়েছে, মাধবের এভাবে আহত হওয়াটাও তারই অপমান। তার সংগে জড়িয়েই নিন্দা রয়েছে মাধবের অথচ তাকে বাদ দিয়ে সবটা আঘাত লেগেছে তার অভিভাবক মাধবের!
মাধব নিজেই আবার বলে, তুমি আর আমার কাছে বেশী ঘন ঘন এসো না কান্তা। ছ'মাস-একবছর তোমার আমার দেখাসাক্ষাৎ কম হলেই লোকের ভুল ধারণাটা কেটে যাবে।
কান্তার মুখ লাল হয়ে যায়।
: হার মানলাম?
: হার মানিনি। লোকে ভুল বুঝল আমাকে। কেষ্টরাধার দেশ তো। একটা মেয়েকে চাকরি দিলেই বজ্জাত হতে হয়। এমন হবে বুঝতে পারি নি কান্তা।
তাকে চাকরি দিয়ে মাধব আজ আপসোস করছে!
: আমি রিজাইন দেব?

মাধবের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। ধমকের সুরে বলে, চাকরি করে দিয়েছি, চাকরি করে যাও লোকে কি বলে না বলে সেটা সামলাব আমি। তুমি রিজাইন দিতে যাবে কেন ?

মংগলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক গুরুজনের ধমকের সুর। কান্তা একটা ঢোক গেলে।

অভিভাবকত্বের একটা নতুন রূপ ক্রমে ক্রমে প্রকট হচ্ছিল মাধবের কথায়, ব্যবহারে —চাকরিটা দেবার ঠিক পর থেকে।

ধমকের সুরটা আজ প্রথম শুনল।

এ পর্যন্ত কথার নতুন ভাঙ্গি আর সুরটা হয়েছে খুব ব্যধ্য নিরীহ মেয়েকে গুরুজনের এটা ওটা করতে বলা—একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বলা যে কথা সে নিশ্চয় শুনবে, অবাধ্য হবার সাহসই পাবে না। রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল কান্তা। কতখানি তাকে বাধ্য হতে হবে মাধবের, কতদিক দিয়ে মাধব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কান্তার কাছে যতই তেজ দেখাক মাধব, তার মনের একটা স্থায়ী আতঙ্ক আবার নাড়া খেয়েছে এ ব্যাপারে। এ আতঙ্ক তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমে ক্রমে, মানুষ তাকে কি চোখে দেখে সে বিষয়ে নিজের ধারণা আর বিশ্বাসে এইরকম ঘা লাগার ফলে।

মেয়েদের উপকার করে প্রতিদিন মানুষ আদায় করে নেয়, কিন্তু সেটা অনিয়ম। এই অনিয়মটাই কি তবে এতবড় সত্য হয়ে উঠেছে যে তার মতো মানুষের সম্পর্কেও লোকে এরকম ভাবতে পারে ?

ক্ষমতা খাটিয়ে অনাত্মীয়া সুন্দরী একটি মেয়েকে চাকরি করে দিয়েছে—এটুকু জানাই যথেষ্ট। এইটুকুই একেবারে অকাট্য প্রমাণ। যে চাকরি দিয়েছে সে মানুষটা কেমন বিচার করারও প্রয়োজন নেই।

কি সাংঘাতিক কথা।

এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত সে কি প্রমাণ দিয়ে আসে নি সংযম আর চরিত্রবলের ? কান্তাকে চাকরি করে দেবার বিশেষ ক্ষমতা হয়তো তার আয়ত্তে এসেছে দেশটা স্বাধীন হবার পর, কিন্তু খেলা করার সাধ থাকলে মূল্য দিয়ে মেয়ে কেনার ক্ষমতা যৌবনেও তো তার কম ছিল না। কত বন্ধু কত নটী কতভাবে তার সংযম ভাঙাবার চেষ্টা করেছে। ভদ্র ঘরের বিপন্না অসহায়া কত মেয়ে বৌ তার কাছে এসেছে সাহায্য চাইতে, আজও আসে—একটু খারাপ ইঙ্গিত পর্যন্ত করা চলে এমন কোনো আচরণ কি কেউ তার দেখেছে কোনোদিন ?

রামচন্দ্রের মতোই লোকে তাকে একনিষ্ঠ একপত্নীক চরিত্রবান মানুষ বলে জানে।

নৈতিক কঠোরতার এই খ্যাতি পর্যন্ত তার মিথ্যা দুর্নাম ঠেকাতে পারল না।

সোজা হিসাব এরকম ভুল হয়ে গেলে তো বিপদের কথা।

আদর্শবাদী সংযমী ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে চিরকাল এই ভয়টাই সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে থাকে—জগৎ সংসার বুঝি এক অনিয়মের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, মানুষের কাছে বুঝি মূল্যহীন হতে চলল আদর্শ উচ্চচিন্তা ন্যায়-পরায়ণতা নিয়মনীতি ইত্যাদি।

নিজের সুবিধাবাদী ধারণা ও বিশ্বাস ছাড়া তো অবলম্বন নেই আত্মকেন্দ্রিক মহৎ মানুষেরও, তাই নিজের হিসাব ও বিচারে যা হওয়া উচিত দাঁড়ায় তার বদলে বাস্তবে অন্যরকমে হলে এসব মানুষের আতঙ্ক জন্মে যায়।

আগে থেকে আরও অনেক ব্যাপারে জমা হয়েছে ভয়, এবার নাড়া খেয়েছে সব-টাই। বেড়াতে বেড়াতে কান্তাদের বাড়ি চা খেতে যাওয়ার সাহস তার হয় নি ক'দিনের মধ্যে।

কিন্তু কান্তার কাছে তো প্রকাশ করা চলে না ভয়, তাই একেবারে ধমক হয়ে বেরিয়ে আসে তার তেজ দেখানোটা।

তার কর্তালিপনা কোথায় চড়বে ভেবে কান্তা অস্বস্তি বোধ করছে টের পেলে এই আতঙ্কই আবার নাড়া খেত মাধবের।

ভালো চেয়ে সুপরামর্শ দেওয়াকে কান্তা ভাববে চাকরি করে দেওয়ার প্রতিদানে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—একি ভয়ানক অনুচিত কথা!

সে কি দীর্ঘকাল ধরে পরিচয় দেয় নি তার মহৎ উদার হৃদয়ের? অন্যের কথা দূরে থাক, আর্দালি পিয়ন চাকর-বাকরকে পর্যন্ত সে অন্যায়ভাবে শাসন করে না। পছন্দ না হলেও নিজের মেয়ের কত চালচলন কত মতামত সে নীরবে বরদাস্ত করে যায়। সে কিনা হুকুম চালাবে কান্তার ওপর!

মাধবকে কেউ বলে দেবার নেই, বলে দিলেও সে মানবে কিনা সন্দেহ যে নিজের মেয়ে তার অনেক ইচ্ছা অনেক মত মানে না বলে, মেয়েকে হুকুম মানাবার তার ক্ষমতা নেই বলে সত্য সত্যই সে সুযোগ পেয়ে নিজের অনেক মত আর ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে কান্তার ঘাড়ে।

আগে যে সব কথা নিয়ে কান্তা নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ত, এখন ওসব কথা উঠলে সে যে আর তর্ক করে না এবং মাধব তাতে খুশি হয়—এটাই তো তার অকাট্য প্রমাণ।

প্রতিদান সে নিতে শুরু করেছে বৈকি—অন্যভাবে না নিয়ে নিচ্ছে আনুগত্যের প্রতিদান।

কান্তা ধীরে ধীরে বলে, আপনি ক'দিন যান নি। আমিও কি আসা যাওয়া বন্ধ করব?

মাধব বলে, নিশ্চয় না। মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে মেলামেশা বন্ধ করব কেন? মাঝে মধ্যে আমি যাব, তুমিও তেমনি আসবে যাবে। মেলামেশাটা শুধু কমিয়ে দেব আমরা, আর কিছু নয়। লোকে তো আর বুঝবে না মেয়ের মতোই তোমায় আমি

স্নেহ করি।
একটু থেমে বলে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, দিন দিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে মানুষের মন।
আগের চেয়ে ঢের বেশী ছোটলোক হয়ে গেছে মানুষ, মায়ের এই কথাটা মানতে পারে না কান্তা। কিন্তু সে প্রতিবাদও করে না।

বাড়ির অন্য মানুষগুলির ভাবও আজ যেন কেমন কেমন।
সেটা আশ্চর্য কিছুই নয়। তাকে নিয়ে মাধবের নামে কুৎসা রটেছে সেটা তো আর সহজ ব্যাপার নয় এদের কাছে।
কি করছ মৃদুলা?
কিছু না কান্তাদি।
বাড়িতে এলেই যে হাসিমুখে সানন্দ অভ্যর্থনা জানায়, আজ সে গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে কান্তার নতুন জুতোর দিকে।
পরশু নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছি, একবার যেও।
যাব।
মৃদুলার মা গৌরী এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় একবার চোখ তুলে তাকায়, তবু যেন দেখতে পায় নি এইভাবে তার সঙ্গে একটিও কথা না বলেই চলে যায়।
মাধবের বড় জামাই শচীন তাকে দেখে যেন মুচকি হাসিটা চাপা দেবার জন্যই মুখে হাতের তালু ঘষে দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে নির্বিকার উদাসীন ভাবে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকার ভান করে।
নিচে নামবার সময় সিঁড়ির মাঝামাঝি মুখোমুখি হয়ে যায় কান্তা আর অমলা। অগত্যা দুজনকেই দাঁড়াতে হয়।
কান্তা জিজ্ঞাসা করে, শরীর কেমন আছে?
ওই একরকম। ওষুধ গিলছি।
তার মুখের ভাবেও স্পষ্ট ঘোষণা যে ক্ষমা নেই তোমার। অমলাকে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে আগে কোনোবার রক্ষা থাকে নি। একটানা ফিরিস্তি শুনতে হয়েছে শরীরে তার কি কি গ্লানি, কোন্ কোন্ ডাক্তার চিকিৎসা করছে, ওষুধ আর পথ্যের কি ব্যবস্থা হয়েছে ইত্যাদি সব কিছুর।
এই মুখরতাই একটা লক্ষণ তার রোগের। কান্তার উপর গভীর বিতৃষ্ণা রোগের লক্ষণটাকে পর্যন্ত যেন আজ চাপা দিয়ে দিয়েছে।
কে যে কার পাশ কাটিয়ে নিচে নামে উপরে ওঠে ঠিক বোঝাই যায় না।
কিন্তু নিচের তলায় নেমে গেলে কান্তার সঙ্গে যেচে খানিকক্ষণ কথা বলে মাধবের বিধবা বোন শান্তিময়ী। ধীরে শান্তভাবে কথা বলে। সব সময়েই অত্যন্ত নিরুদ্বেগ মনে হতো তাকে।

বয়স মাধবের চেয়ে দু-তিন বছর মোটে কম হবে। মাজা রং, ঋজু নিটোল হাল্কা দেহ। একরাশি কালো চুলের মধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটা সাদা চুল উঁকি দিচ্ছে। পরনে ধবধপে সাদা ধুতি আর জামা।

তাকে দেখে আর তার কথা শুনে মনে হয় শান্তিময়ী নামটি তার সার্থক। গোমড়া মুখে নয়, নিশ্চিন্ত ভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, খবরের কাগজেও নাকি কেচ্ছা বেরিয়েছে ?

প্রশ্ন শুনে কান্তা ভড়কে গিয়ে বলে, না না, খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছে বলে তো শুনিনি।

তবু ভালো। কে যেন বললে খবরের কাগজেও নাকি কায়দা করে আইন বাঁচিয়ে নাম পর্যন্ত ছাপিয়ে দিয়েছে। শুনে থেকে কেবল তোমার কথা ভাবছিলাম —কি দশা হতো তোমার তাহলে ?

এই জ্বালাতেই জ্বলছিল মনটা। মাধব শুধু বলেছে নিজের কথা—তার মতো মানুষের নামেও এমন বিশ্রী মিথ্যা বদনাম রটে, এও জগতে সম্ভব হলো। নোংরা কুৎসিত হয়ে গেছে মানুষের মন—নইলে মাধবকেও মানুষ খারাপ ভাবতে পারে।

মাধবের নামে কুৎসা রটেছে বলে আহত বিক্ষুব্ধ হয়েছে বাড়ির অন্যান্য সকলের মন। সে এই কুৎসার কারণ বলে সকলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চেয়েচে তার দিকে, তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে অস্বীকার করেছে।

দুর্নাম যেন একা মাধবের।

এ মিথ্যা দুর্নামে যেন তার কোনো ক্ষতি নেই, তার কোনো আপসোসের কারণ নেই।

জাতে সে মেয়ে, যতই পাশ করুক আর মোটা মাইনের চাকরি বাগাক, সমাজে স্ত্রীজাতীয়া জীব হিসাবে তার পরিচয় মোটেই ফুরিয়ে যায় নি। ফুরিয়ে যাবার কথাও নয়।

সে তো সত্যি স্ত্রীলোক।

পুরুষের চেয়ে দুর্নাম যে তার পক্ষে কত বেশী ভয়ানক ব্যাপার, এ বাড়ির কেউ যেন সেটা খেয়াল করাও দরকার মনে করে নি।

তাকে চাকরি দিয়ে মাধব বিপাকে পড়েছে—এজন্য তার দিকটা গণ্যই নয়।

সে যেন পতিতার সামিল হয়ে গেছে এদের কাছে, তার সামাজিক সুনাম দুর্নাম মানমর্যাদার কোনো প্রশ্নই যেন ওঠে না।

একমাত্র শান্তিময়ী তার দিকে টেনে কথা বলেছে। সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েই কান্তার হৃদয়ের জ্বালা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে।

আমারি সব দোষ তো ? আমি জানি—আমি জানি ? আপনার দাদাকে আমি রিজাইন দেবার কথা বলেছি খবর রাখেন ?

শান্তিময়ী শুধু বলে, ছি! বিপদে পড়লে তোমাদেরও যদি মাথা বিগড়ে যায় হিস্টিরিয়া হয়, সাধারণ মেয়েরা কার দিকে চাইবে?

কি কথায় কি কথা এল। মানুষের মনের নোংরামির অভিযানে সেও অংশ নিয়েছে এই নালিশের বদলে বলা যে নোংরামির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মেয়েরা তার মতো মেয়ের মুখ চেয়ে আছে, তাই দায়িত্ব অনেক। কান্তা তাই চুপ করে থাকে।

তার তো হিস্টিরিয়া রোগ নেই যে নিজের কথা ন্যায়সঙ্গত নালিশের কথা হলেও নিজের কথা বলার জন্য জগৎ সংসার তুচ্ছ করে দেবে, যেহেতু মাধব আর তার বাড়ির অন্য লোকেরা তার দিকটা খেয়াল করে নি।

নরম হলে চলবে না।

কি করতে বলছেন?

কান্তা ধীর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে।

শান্তিময়ী তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। টেনে নিয়ে যায় না, কারণ কান্তা তার মনোভাব টের পেয়ে হাত ধরামাত্র তার সঙ্গে চলতে শুরু করে।

ঘরে একটি লোহার চৌকিতে ধপধপে বিছানা। আর কোনো আসবার নেই। বিধবা বলেই মাধব বোনকে ঘর দিয়েছে ছোট, ঘরে একজনের শোবার মতো কাঠ বা লোহার চৌকি পাতলে আর কোনো আসবাব আনা সম্ভব হয় না।

কয়েকটা টুল আছে। আর আছে একটি বুকসেলফ্। টুলটাকে চৌকির নিচে ঠেলে দিয়ে শান্তিময়ী মেঝের মুক্ত অংশটুকুতে ছোট একটি চীনা মাদুর বিছায়।

বলে, এসো আমরা আয়েস করে বসি।

পা ছড়িয়ে বসে বলে।

দাদা বুঝি তোমায় খুব ভড়কে দিয়েছে?

ওনার বদনাম হলো—

শান্তিময়ী খিলখিলিয়ে হাসে। হাত বাড়িয়ে কোণ থেকে পানের বাটা টেনে নিয়ে পান সেজে একটু দোক্তা দিয়ে মুখে পোরে।

পিক্ ফেলে এসে বলে, তুমি বড়ো বোকা মেয়ে। দাদা কি তোমার জন্যে তোমায় চাকরি দিয়েছে? দাদার মধ্যে কত রকম ভাবের লড়াই টের পাও না? নিজের ভাবে নিজের দায়েই চাকরি দিয়েছে তোমায়। কিন্তু সে তো গেল ভিন্ন কথা। তোমার নিজের কথা ভাবছ না তুমি? নিজের ভালোমন্দের হিসেব দাদার এদিকে ঠিক আছে, তোমার হিসেবটা তুমি করছ না?

নিজেকে এই প্রশ্ন করার জন্যই প্রাণটা যেন ছটফট করছিল, কিন্তু প্রশ্নটা স্পষ্ট করে তুলতে পারে নি। কিসে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল স্বাধীন চিন্তা। মুগ্ধ

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কান্তা শান্তিময়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শান্তিময়ী আবার বলে, দাদার আবার বদনাম কিসের ? হোমড়া-চোমড়া ব্যাটাছেলে, এসব বদনামে তার কি এসে যায় ? লোকে বরং তারিফ করবে। কিন্তু তুমি বাচ্চা মেয়েছেলে, সুনাম বদনামে তোমার জীবনে ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। ঠান্ডা মাথায় নিজের দিকটা ভালো করে ভাবো—

মাথাই গুলিয়ে যাচ্ছে ভাবব কি।

মেয়ে মানুষের মাথা গুলিয়ে গেলে চলে ? একটা সোজা কথা তো বুঝতে পারছ ? বদনামের ফলে হয়তো ওই মাধববাবুটি ছাড়া সারা জীবনে তোমার আর গতি থাকবে না। ঘরে ঘরে বৌগুলির যে দশা তোমারও প্রায় তেমনি দাঁড়াবে।

হতাশা নয়, একটা ক্ষোভ নিয়ে কান্তা বাড়ি ফেরে। অনেক ব্যাপারে অনেকবার বুকটা তার জ্বালা করেছে, কিন্তু এ ক্ষোভ অন্য ধরনের, এ ক্ষোভ আর মিটবে না।

সে স্ত্রীজাতীয়া জীব, এত কষ্টে এত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে রোজগার করবার অধিকার এ সমাজে তার জন্মগত নয়—এই ক্ষোভ ঘুচবার নয়—পুরানো অভ্যস্ত নালিশটাই আবার নতুন করে তীব্রভাবে নাড়া খেলেও ধীরে ধীরে আবার থিতিয়েও যেতে পারত। শান্তিময়ী দরদের সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে সুনাম দুর্নামের ব্যাপারে সে নিরুপায় অসহায়া নারী এটা যেন ভুলে না যায়। মনের মোড়টাই ঘুরে গিয়েছে কান্তার।

না, আসল কথা মোটেই তা নয়। বদনামে মাধবের কিছু আসে যায় না, মুশকিল শুধু তার, এটা একেবারে ভিন্ন ব্যাপার।

আসল গলদটা হ'ল এই যে মাধব কেন তাকে চাকরি দেয়, চাকরি দেবার ক্ষমতা পায়। এ একটা কুৎসিত অনিয়ম। অনিলকে অথবা তাকে মাধব বেছে নিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়, মাধবের সঙ্গে তার খারাপ সম্পর্ক আছে কি নেই সেটাও আলাদা ব্যাপার, খেয়াল খুশিতে মাধব যে চাকরির জন্য যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারে এটাই হ'ল নিয়মনীতির আসল ব্যাভিচার।

এ ব্যাপারে সে যখন অংশ নিয়েছে, সেও ব্যাভিচারিণী বৈকি। নইলে সত্যাই কি কায়িক ব্যাভিচারের দুর্নামে তার খুব বেশি আসে যায়, এতখানি বিচলিত হবার প্রয়োজন ঘটে ? সে কি গেঁয়ো মেয়ে না শহরেও যে বিরাট সংখ্যক মানুষকে গেঁয়ো জীবন আঁকড়ে থাকে সেও গেছে তাদের স্তরে—এতটুকু বিচ্যুতিতে পাড়ায় যাদের নিয়ে কানাকানি চলে আর মেয়ে বলেই সে কানাকানিকে তারও ভয় করতে হবে।

শান্তিময়ী আটকে রয়ে গেছে তার যৌবনের দিনগুলিতে। তার ধারণাই নেই

কিভাবে বদলে গিয়েছে রোজগেরে মেয়েদের জীবন-সংগ্রামের পরিবেশ পর্যন্ত।

ক্ষোভ নিয়ে বাড়ি ফিরেই কান্তা টের পায়, সকলের মধ্যে গভীর অসন্তোষ। মাস-কাবার হয়েছে সে মাইনে পেয়েছে কিন্তু বাড়ির প্রায় প্রত্যেকের কতক দাবীদাওয়া যে এখনো সে মেটায় নি।